রশীদ আখতার নদভী (র)

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ

ইসলামী শাসনের বাস্তব চিত্র

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ

ইসলামী শাসনের বাস্তব চিত্র

মূল

রশীদ আখতার নদভী

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার

পরিবেশক

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।
মোবা: ০১৭১১-০৩০৭১৬

পাঠকদের প্রতি
সম্পাদকের নিবেদন

ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবনালেখ্য আমরা এই উদ্দেশ্যেই প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি– যাতে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীগণ উপলব্ধি করতে পারেন যে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করলে দেশের জনগণ সুখী ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে এবং দেশ সেবার মহান ব্রত গ্রহণ করলে ব্যক্তি জীবনে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করতে হয়। তদুপরি পক্ষপাতহীন ও স্বজন প্রীতিমুক্ত মনে দেশের সেবা করে গেলে দেশের আপামর জনসাধারণও তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

খেলাফতে রাশেদীনের পর মুসলিম জাহানে স্বজন-প্রীতি, ব্যক্তিস্বার্থ, অন্যায়-অবিচারের যে অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল ওমর ইবনে আবদুল আজীজ সেই সব অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে আবার মুসলিম জাহানে নতুন প্রাণ স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে। আমরা আজকের দিনেও যদি তাঁর অনুসরণ করি তবে আমরাও তাঁর ন্যায় দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি।

এই গ্রন্থখানি ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবনীর সবচেয়ে তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ক্লাশে ইতিহাসের ছাত্রদের জন্যও বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থকারের কথা

একদিন পরাক্রমশালী আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদের সামনে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কথা আলোচিত হল। এই প্রভাবশালীও পরম অনুতাপের সাথে বলেন, 'বনু উমাইয়ার এ লোকটি আমাদের সকলের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, সত্যিই তা ভোলার নয়।'

বাস্তবিকই হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের মাধ্যমেই সমগ্র বনু উমাইয়া শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদার এক সুউচ্চ আসন লাভ করেছিল। শুধু বনু উমাইয়া কেন? বলতে গেলে সমগ্র মিল্লাত বা জাতিই এই সশ্রদ্ধ মহান মনীষীর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও কল্যাণ দানে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ যখনই খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তখন তারা শ্রদ্ধার সাথে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কথা উল্লেখ না করে পারেন না। তারা তাঁর শাসনামলকে খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণ যুগের সাথে তুলনা করে থাকেন এবং তাঁকেও সেই পবিত্রাত্মাদের মতই সম্মান প্রদান করেন।

বর্ণনাকারী ইবনে সাদ বলেন, নবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) একদা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পিছনে নামাজ পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলেন–

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلٰوةً لِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর এই যুবক ছাড়া অন্য কারো পিছনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাযের মত নামাজ আমি আর পড়িনি।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) যখন তাঁর সম্বন্ধে এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন, তখনও তিনি খেলাফতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হননি। তখন তিনি উমাইয়া বংশীয় খলীফা ওয়ালীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ অথবা একুশ বছর।

যখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ স্বয়ং খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন যদি হযরত আনাস (রাযিঃ) জীবিত থাকতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি শপথ করে বলতেন– "আমি এই যুবক ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাসনের মত শাসন আর কোন শাসনকর্তাকেই করতে দেখিনি।

যদিও তাঁর এই আল্লাহভীরুতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং সত্য নিষ্ঠার ফলে তাঁর নিজ বংশীয় লোকেরা তাঁর পরামর্শে শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত খাদেমের ভাষা মতে, যদিও তিনি খেলাফতের পদ গ্রহণ করে নিজেকে নিজেই মহাবিপদে ফেলেছিলেন, যদিও তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজনের সমস্ত প্রকার ভোগ-বিলাসের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন, তথাপি তিনি পৃথিবীর বুকে সোনালী অক্ষরে বাস্তবতার এমন এক চিত্র অংকন করে গেছেন যে, যদি কোন শাসনকর্তা স্বীয় ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে চায় তবে এটা তার পক্ষে খুব কঠিন সমস্যা নয়।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একজন রাজতান্ত্রিক শাসনকর্তা ছিলেন। ইসলামের সত্য-সনাতন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, তাঁর পূর্বের এক রাজতান্ত্রিক শাসক তাঁকে খলীফা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই ঘোষণাই পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পর্যবসিত হয়েছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ স্বীয় কর্মপ্রবাহ দ্বারা তিনি নিজেকে খলীফাদের নিকটতম করেছিলেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণ জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য যা করেছিলেন, তিনিও তাই করলেন। খোলাফায়ে রাশেদীন জনগণের প্রয়োজন ও কল্যাণ সাধনের জন্য যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তিনিও তাঁদের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে গিয়েছেন।

ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণে কাউকে ক্ষমা করে না অথবা কারো প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করে না, এটা সুশাসন ও কু-শাসকদের কুশাসনের চুলচেরা সমালোচনা করে থাকে। এই সমালোচনামুখর ইতিহাসও ওমর ইবনে আবদুল আজীজের চরিত্রের চুলচেরা সমালোচনা করেই তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের কাতারে এনে শামিল করেছে এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, তার শাসনামলও খেলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজের শাসনামল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, মাত্র দুই বছর পাঁচ মাস। এই সামান্য সময় জাতীয় জীবনে একটি মুহূর্ত মাত্র। তথাপি এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক পবিত্র আত্মা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-অবিচার সকল কিছুর নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে এমন আইন-শৃঙ্খলা এবং শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে রাজ্যের দুর্বল হতে দুর্বলতর নাগরিকও স্ব-স্ব অধিকারের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

এ পুস্তক সংকলনের একমাত্র কারণ এর বাস্তবতা। আমরা পাঠকদের সামনে কেবল এই উদ্দেশ্যেই ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে পেশ করেছি, যাতে তাঁরা বিচার করতে পারেন যে, তিনি উমাইয়া বংশীয় প্রভাবশালী খলীফা আবদুল মালেকের ভ্রাতুষ্পুত্র, মারওয়ান ইবনুল হাকামের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও জনগণকে যে সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করেছিলেন তার নজীর ইতিহাসে বিরল। তিনি যখন খলীফা ছিলেন না, তখন তিনি উন্নত মানের খাদ্য গ্রহণ করতেন, উন্নত মানের পোষাক পরিধান করতেন; কিন্তু তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করলেন। তিনি জীবন ধারণের দিক দিয়ে অতি সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসলেন। অতি সাধারণ মানুষ যা খেতো, তিনিও তাই খেতেন, অতি দরিদ্র মানুষ যা পরিধান করত তিনিও তাই পরতেন।

ব্যক্তিগত দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায়, ওমর ইবনে আবদুল আজীজও তৎকালীন অভিজাত শ্রেণীর অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইতিহাস বিখ্যাত শাহী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল আজীজ ছিলেন মহা প্রতাপশালী উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেকের ভাই। তদুপরি তিনি একাধারে দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত মিশরের স্বাধীন শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থেকে এই পুত্রের সুখ-সুবিধার জন্য কত কিছুই না রেখে গিয়েছেন! কিন্তু তাঁর এই পুত্র খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তাঁর সমস্ত সম্পদ সরকারী কোষাগারে সোপর্দ করে দিলেন, এমনকি তাঁর স্ত্রীর যাবতীয় অলংকারাদী পর্যন্ত সরকারী কোষাগারে জমা করে দিলেন।

বর্তমান জগতের এই গণতান্ত্রিক যুগেও এটা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একজন রাজতান্ত্রিক শাসক হয়েও জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি নিজেই নিজেকে কিরূপে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতেন এবং তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কত বড় ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন।

আজকের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের নিকট ওমর ইবনে আবদুল আজীজের অনুসৃত শাসনপদ্ধতি যদিও প্রজাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির মৌলিক শর্ত হিসেবে স্বীকৃত নয়; কিন্তু ইসলাম দুনিয়ার বুকে সমাজ ব্যবস্থার যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল এটাই ছিল তাঁর মৌলিক ও প্রধান শর্ত যে, দেশের জনগণ যদি অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায়, তারা যদি উলঙ্গ বা অর্ধালোঙ্গ এবং অভাবক্লিষ্ট থাকে তবে তাদের শাসনকর্তাও তাদের মত অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাবে। জনগণকে দুঃখ-দুর্দশায় রেখে ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার অধিকার শাসনকর্তার নেই।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ যখন থেকে খেলাফতের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন যদি প্রজাসাধারণ ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ থাকত, তাদের ভাত-কাপড়ের কোন সংস্থান তারা করতে না পারত, তখন ওমর ইবনে আবদুল আজীজও জনগণের কাতারে নেমে আসতেন, তিনিও অনাহারে থাকতেন, তাদের মত পোষাক পরতেন।

তিনি যে ধার্মিকতা অবলম্বন করেছিলেন, খলীফা হওয়ার পর তিনি যে সাদাসিধা, অনাড়ম্বর জীবন যাপনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তখনকার যুগের চাহিদা অনুযায়ীই তিনি তা অবলম্বন করেছিলেন। সেই সময়ের এটাই ছিল সাধারণ চাহিদা। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ জীবনের সর্বপ্রকার সুখ ভোগ জলাঞ্জলি দিয়ে জনগণের সেই চাহিদাই পূরণ করেছিলেন। তিনি যে বিশ্বস্ততার সাথে জনগণের চাহিদা পূরণ করেছিলেন, ইতিহাস তাঁর দ্বিতীয় নজীর পেশ করতে পারেনি।

আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি, যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, জীবন ধারণের মান পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের জনগণ আর খলীফা ওমরের যুগের জনগণ এক নয়। সেই যুগে মোটর গাড়ী ছিল না, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী,

ছিল না আজকের ন্যায় জীবন ধারণের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন। তবুও এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়ার জনসাধারণ বিশেষতঃ আফ্রিকা-এশিয়ার জনগণের জীবন মান আজকের দিনেও সেই যুগ থেকে খুব একটা উন্নত হয়নি, তাদের না আছে মোটর গাড়ী, না আছে উড়োজাহাজে আরোহণ করার সামর্থ। আজকেও তাদের পোষাক টুটা-ফাটা, তাদের আহার্য সাদাসিধা।

আফ্রিকা-এশিয়ার বহু দেশ এখনও এমন আছে, যেখানকার অধিকাংশ মানুষ অনাহারে, উলঙ্গ দিন কাটাচ্ছে, যারা সাধারণ ডাল-ভাতেরও ব্যবস্থা করতে পারে না, ইজ্জত-আবরু ঢাকার মত সাধারণ থেকে অতি সাধারণ কাপড়েরও ব্যবস্থা করতে পারে না। সুতরাং, সেই সমস্ত দেশের শাসকগোষ্ঠীকেও জনসাধারণের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য ওমর ইবনে আবদুল আজীজের ন্যায় নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা অপরিহার্য। বিশেষতঃ যে সব দেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করেন, ইসলামী শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য চিৎকার করেন, তাদের জন্য এরূপ পরিবর্তন আরও অধিক প্রয়োজনীয়।

অবশ্য সময় বাঁচানোর জন্য, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য, পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শাসকগণ উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ী ইত্যাদি যানবাহনে আরোহণের অধিকারী; কিন্তু যত দিন পর্যন্ত জনগণের জীবন ধারণের মান উন্নত না হয়, যত দিন তারা পেট ভরে খেতে না পায়, ইজ্জত-আব্রু ঢাকার মত প্রয়োজনীয় কাপড়ের এবং মাথা গুজবার মত বাসস্থানের সংস্থান করতে না পারে ততদিন শাসকগোষ্ঠীকেও তাদের ব্যক্তিগত জীবনে জনগণের মত খাদ্য খেতে হবে, তাদের মত পোষাক পরতে হবে, তাদের মত বসবাস করতে হবে।

তা না হলে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগেও ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, উন্নত মানের বসবাস, খাওয়া-পরা ইত্যাদির মোটেই অভাব ছিল না। সেই যুগেও অগণিত মানুষ এমন ছিল যারা উন্নতমানের বাহনে আরোহন করত, শাহী প্রাসাদে বাস করত, রেশম বস্ত্র ও অন্যান্য মসৃণ কাপড় পরিধান করত, উন্নতমানের আহার্য গ্রহণ করে খুবই

আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত। তাঁর নিজের বংশেও এরূপ লোকের অভাব ছিল না, যারা রাজপ্রাসাদে বাস করে বিভিন্ন প্রকার সুখ ভোগ করে জীবন উপভোগ করত। স্বয়ং ওমর ইবনে আবদুল আজীজও খেলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে খুবই উন্নত মানের জীবন যাপন করতেন।

কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্তন করে দিলেন। কারণ পূর্বে তিনি ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি এবং ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ধন-সম্পদ দ্বারা পুরোপুরি জীবন উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্তির পর তিনি আর এক ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি একাই একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত লোকের দেখা-শুনার ভার তাঁর উপর সোপর্দ হয়েছিল। তাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করার সকল প্রকার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপর। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যে স্বাধীনতা ভোগ করতেন ইসলাম তাঁর সেই আজাদী ছিনিয়ে নিয়েছিল।

অনুরূপ আজকের দিনেও যে কেউ, তার ব্যক্তিগত ধন-দৌলত দ্বারা জীবন উপভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকারী। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাল ভাল কাপড় পরতে, উন্নতমানের বাসস্থানে বাস করতে এবং উপভোগ্য খাদ্য খেতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু জাতির নেতা হিসেবে, জনগণের শাসক হিসেবে তার এই অধিকার নেই। তার ব্যক্তি জীবনে যে সমস্ত বিষয়ে তিনি স্বাধীন ছিলেন তার সেসব স্বাধীনতা থাকবে না। তিনি এখন আর ভাল কাপড়, উন্নত বাসস্থান, উপভোগ্য খাদ্য ইত্যাদির সুযোগ পাবেন না। তার নিজের জীবনকে জনগণের জীবনের সাথে মিলিয়ে একাকার করে দিতে হবে, যেমনভাবে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিয়ে জনগণের কাতারে এসে শামিল হয়েছিলেন। তিনি যদি এটা করতে পারেন তবেই তিনি মুসলিম শাসক হিসেবে দাবী করতে পারেন। তা না হলে সে যুগেও আবদুল মালেক, ইয়াজিদ, মারওয়ান, সুলায়মান, হাশেম প্রমুখ নরপতিগণও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করেছেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ জীবনের গতি পরিবর্তন করে নিজের জন্য যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বিধান করেছিলেন, আমরা তার কারণ ও যৌক্তিকতা যথাস্থানে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্। যা হোক দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে এ উমাইয়া নরপতির জীবনের সকল দিক তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমরা তাঁর জীবনালেখ্য রচনায় মনোনিবেশ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে এটা আমাদের কর্তব্য নয়, এটা তাদের কর্তব্য, যারা তাঁর অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে দেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করবেন, আর না হয় তা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মনগড়া রুচিসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করে জীবন উপভোগ করবেন। এটাই আমাদের কথা।

বিনীত
রশীদ আখতার নদভী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর বংশ তালিকা

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর জীবনী আলোচনা করার পূর্বে তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁকে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা আবদুল আজীজ, মাতা উম্মে আসেম এবং দাদা মারওয়ানের জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর দাদা মারওয়ান ইবনে হাকাম

মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আবুল আছ ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামছ ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে কুসাই।

বংশের দিক দিয়ে মারওয়ান ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। তিনি ছিলেন আবদে শামছের পুত্র ও উমাইয়ার পৌত্র। বংশ তালিকা বিশারদদের মতে আবদে শামছের দু' পুত্র হাশিম ও উমাইয়া ছিলেন পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। ফলে তাদের মাঝে বৈমাতৃক সুলভ আচরণ বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে উমাইয়া হাশিমের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন। এ হিংসা-বিদ্বেষ তাদের উত্তর পুরুষদের মধ্যেও বংশানুক্রমে চলে আসছিল।

হাশিম ও উমাইয়ার বংশধরগণ তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার সময়েও পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সৃষ্ট সেই পুরাতন হিংসা- বিদ্বেষের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি।

একই পিতামহের বংশধর হওয়ার পরিণতি এটাই। তা না হলে হরব ও আবুল আস দু'জনই ধ্যান-ধারণায় একে অন্যের খুব ঘনিষ্টজন ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এ জাতীয় হিংসা-বিদ্বেষ কখনো ছিল না। হরব এবং আবুল আস জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই একে অন্যের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন। তাদের এ দু'য়ের ঐক্যের প্রভাব তাদের পূর্বপুরুষ আবু সুফিয়ান, হাকাম ও আফফানের উপরও পড়েছিল। আফফান এবং হাকাম একে অন্যের এতই ঘনিষ্ট ছিল যে, তাদের দু'জনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল এক। তারা তাদের বংশধরগণকেও এ ধ্যান-ধারণার অংশীদার করেছিল। যদিও আফফানের পুত্র ওসমান এবং হাকামের পুত্র মারওয়ান ধ্যান-ধারণায় একে

অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে ছিলেন, তবুও তারা একে অপরকে প্রীতির চোখে দেখতেন।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা) সেসব সাহাবাদের অন্যতম ছিলেন, যারা ইসলামের প্রথম দিকে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ও চাচা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁকে কঠোর শাস্তি দিত এবং তারা উভয়ে হযরত ওসমান (রা) কে ইচ্ছামত প্রহার করত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, যখন হাকাম মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন হযরত ওসমান (রা) তাঁর ব্যক্তিগত ভদ্রতা বা পৈতৃক সম্পর্কের কারণে শুধু তাঁকে নিজগৃহেই আশ্রয়ই দেননি, এমনকি তার চাচা এবং চাচাত ভাইকে তাঁর ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদার করেছিলেন।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে সাদ হযরত ওসমান (রা) ও মারওয়ানের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করে বলেন– হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের সময় মারওয়ানের বয়স ছিল আট বছর। তার পিতা হাকামের মৃত্যু পর্যন্ত তিনিও তার পিতার সাথে মদীনায় বাস করছিলেন। হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে তাঁর চাচা হাকামের মৃত্যু হলে মারওয়ান সবসময় তাঁর চাচাত ভাই ওসমান (রা)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান সচিব। হযরত ওসমান (রা) তাঁকে প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। **(তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪, লণ্ডনে মুদ্রিত)**

ইবনে সাদ আরও বলেন, হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে মারওয়ানের এ ঘনিষ্ঠতার কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁকে কটু কথা বলতেন, ভীরু ও দুর্বল বলতেন; কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা) কারও কথা শুনতেন না। তিনি সবসময় মারওয়ানকে ভালবাসতেন, তাকে পরম প্রীতির চোখে দেখতেন, এমনকি যখন লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে ঘরে অবরোধ করল, তখন তাদের একটি দল তাঁর নিকট এসে এ প্রস্তাব দিল যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন, আমরা তার সাথে বুঝা-পড়া করব।

কিন্তু হযরত ওসমান (রা) বিদ্রোহের ভাবমূর্তি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, বিদ্রোহীদের শক্তি সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তিনি

জানতেন, যদি বিদ্রোহীদের কথা রক্ষা না করেন তবে তাঁর প্রাণ বিপন্ন হবে। এতদসত্ত্বেও তিনি মারওয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে সমর্পণ করেননি।

(আবদুল ফরিদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০)

তিনি মারওয়ানের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করতে গিয়েই হযরত আলী, হযরত সাদ, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা)গণের মতো বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের প্রিয়ভাজন হতে পারেননি।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবদুর রাব্বিহি বলেন– হযরত ওসমান (রা)-এর উপর মারওয়ানের অসাধারণ প্রভাবই তাঁর শাহাদাতের অন্যতম কারণ ছিল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামগণ চাইতেন যাতে খলীফা হযরত ওসমান (রা) মারওয়ানের প্রভাবমুক্ত থাকেন এবং খেলাফতের কাজ পরিচালনায় তিনিও যেন পূর্ববর্তী খলীফাদ্বয়ের মত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা) গণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু মারওয়ানের প্রতি হযরত ওসমান (রা)-এর অসাধারণ প্রীতি-ভালবাসার ফলেই তিনি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা) গণকে তাঁর পার্শ্বে রাখতে পারেননি। (ইবনে আবদে রাব্বিহি, ৪র্থ খণ্ড, ৯০ পৃ.)

ইবনে আবদে রাব্বিহি আরও বর্ণনা করেন– এ হাকাম রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর চরম শত্রু ছিল অথচ হযরত ওসমান (রা) তাকে এনে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন।

(ইবনে আবদে রাব্বিহি ৩য় খণ্ড, ৯০ পৃ.)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর পিতা এবং হাকামের মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল, তার প্রভাব হযরত ওসমান (রা) ও মারওয়ানের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ওসমান (রা) সমস্ত দুনিয়াকেই নিজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন তবুও মারওয়ানের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি।

ইবনে সাদ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন– অধিকাংশ লোক হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করত যে, তিনি মারওয়ানকে তাঁর পার্শ্বে কেন রেখেছেন? এবং কেনইবা তিনি তার কথায় কাজ করেন? লোকেরা দেখত, যে সমস্ত নির্দেশ হযরত ওসমান (রা) দিয়েছেন বলে প্রচারিত হতো, কিন্তু অধিকাংশই হযরত ওসমান (রা) অবগত ছিলেন না।

মারওয়ান নিজেই সেগুলি প্রচার করতেন। সে নির্দেশ পত্রে মারওয়ানের ব্যক্তিগত মতামতও থাকত অথচ খলীফা হযরত ওসমান (রা) এটা জানতেনই না। (তাবকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, ২৪-২৫ পৃ.)

এটাই পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা)-এর পদচ্যুতির ব্যাপারে সরকারী সীলমোহর যুক্ত যে নির্দেশনামা প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটাও মারওয়ানের পক্ষ থেকেই প্রেরণ করা হয়েছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরসহ ফিরে এসে যখন হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা দাবী করলেন, তখন তিনি এ নির্দেশনামার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এবং শপথ করে বললেন যে, তিনি এ ফরমান লিখেননি এবং প্রেরণও করেননি। এ ফরমান মারওয়ান নিজেই প্রেরণ করেছিলেন। তাতে যে সীলমোহর ছিল তা মারওয়ানের নিকটই রক্ষিত ছিল। এতো কিছু জানার পরও হযরত ওসমান (রা) তাকে পদচ্যুত করেননি এবং তার কোন প্রকার শাস্তিরও ব্যবস্থা করেননি।

মারওয়ানের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর যে প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তা একমুখী ছিল না, বরং মারওয়ানও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

ইবনে সাদ বলেন, বিদ্রোহীরা যখন হযরত ওসমান (রা)-এর ঘর অবরোধ করল, তখন মারওয়ান খলীফা হযরত ওসমান (রা)-এর পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। এক দুর্দান্ত সিপাহী তার পৃষ্ঠদেশে এমন জোরে তরবারী দ্বারা আঘাত করল যে, তিনি সওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এমন সময় উবাইদ ইবনে রীফা নামক এক ব্যক্তি ছুরি হাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিতে উদ্যত হল। তখন ছাকাফী বংশীয় ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা তাকে তিরস্কার করে বলল, এ লোকটি পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে, অনর্থক ছুরিটি নষ্ট করছ কেন?

ইবনে সাদ আরও বলেন– মারওয়ানের পূর্বপুরুষগণ এ মহিলার অপরিসীম অনুগ্রহের কথা কোনদিন বিস্মৃত হয়নি। সে সময় যদি এ মহিলা সে সিপাহীর সামনে অন্তরায় সৃষ্টি না করত তবে সে ব্যক্তি ছুরি দ্বারা তার

দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে দিত। এ মহিলা শুধু তাকে হত্যা করতেই নিষেধ করেনি, উপরন্তু তাকে উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিল।

জঙ্গে-জামালের বা উটের যুদ্ধের পর মারওয়ানসহ হযরত ওসমান (রা)-এর অন্যান্য গুণমুগ্ধ ও সহানুভূতিশীল লোকেরা যখন পরাজিত হল এবং হযরত আলী (রা) জয়ী হলেন, তখন মারওয়ান হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়আত করে মদীনায় এসে বসবাস করতে লাগলেন।

হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত এবং হযরত হাসান (রা)-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যখন আমীরে মুয়াবিয়া (রা) খেলাফতের মসনদ দখল করে নিয়ে মারওয়ানকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন, তখন যে ভদ্র মহিলা তাকে তার প্রাণ রক্ষা করেছিল এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, তিনি তাকে ও তার বংশধরগণকে পুরস্কৃত করলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) কিছুদিন পর মারওয়ানকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করে সাঈদ ইবনে আসকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তারপর আবার তিনি সাঈদ ইবনে আসকে বরখাস্ত করে মারওয়ানকে সে পদে পুণর্বহাল করলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) মারওয়ানকে তার মৃত্যুর পূর্বে দু'বার এ পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযিদের রাজত্বকালে যখন মদীনার লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং যার পরিণতি ঘটেছিল ইয়াওমে হারারায়, তখন মারওয়ান ইয়াযিদের কর্মচারীগণকে বিশেষভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছিল। এতে ইয়াযিদ তার কাজে মুগ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাকে দামেস্কে ডেকে নিয়ে তার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাকে তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টার পদে নিয়োগ দান করলেন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার প্রধান উপদেষ্টার পদেই কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ইয়াযিদের মৃত্যুর পর যখন তার যুবক পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন তিনি মারওয়ানকে তার এ সম্মানিত পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।

যেহেতু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযিদ খেলাফতের মহান দায়িত্ব পরিচালনা করা পছন্দ করতেন না, কাজেই যুহহাক ইবনে কায়েসের হাতেই সমস্ত সামরিক- বেসামরিক ক্ষমতা অর্পন করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযিদ মাত্র তিন মাস তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

ইবনে সাদ আরও বলেন- যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল, তখন মারওয়ান ও তাঁর অন্যান্য উপদেষ্টাগণ তাঁর নিকট আরজ করল যে, আপনার পর খেলাফতের জন্য কারো নাম ঘোষণা করুন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) উত্তর দিলেন, যে বস্তু জীবনে আমাকে সুখী করতে পারেনি, মৃত্যুর পর তার বোঝা বহন করতে যাব কেন? আমি যখন মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে চলে যাব, তখন তিনি আমাকে অবশ্যই এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে, আমি কাকে আমার পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে এসেছি।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পরবর্তী খলীফার জন্য কাউকে মনোনীত করেননি, তবে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে তাদের খলীফা নির্বাচন করে তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত যুহহাক ইবনে কায়েসকে খেলাফতের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেন।

যুহহাক ইবনে কায়েস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা)-এর সমর্থক ছিলেন। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরও (রা) তখন মক্কায় তাঁর স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যুহহাকের মত সিরিয়ার কিছু নেতৃস্থানীয় লোকও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা)-এর সমর্থক ছিলেন। অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করে মারওয়ান ও তাঁর অন্যান্য উমাইয়া নেতারাও দামেস্ক ত্যাগ করে হেজাজে চলে গেল।

তারা তখনও রাস্তায়ই ছিল, ইউনিসিয়া জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। এমন সময় ইবনে যিয়াদ তার সঙ্গী-সাথীসহ সেখানে এসে পৌছল এবং মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি কোথায় যাওয়ার সংকল্প

করেছেন? মারওয়ান উত্তর করল, ইবনে যুবাইর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছি।

ইবনে সাদ আরও বলেন, এটা শুনে ইবনে যিয়াদ তাকে তিরস্কার করে বলল–

سُبْحَانَ اللّٰهِ اَرَضِيْتَ لِنَفْسِكَ بِهٰذَا تُبَايِعُ لِاَبِىْ خُبَيْبٍ وَاَنْتَ سَيِّدُ بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَوْلٰى بِهَا مِنْهُ

অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আপনি আবদে মান্নাফ বংশের একজন বিশিষ্ট নেতা হওয়া সত্ত্বেও ইবনে যুবাইরের হাতে বায়আত হতে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন? আল্লাহর কসম! আপনি তো তার থেকেও অধিক যোগ্য ব্যক্তি!

(তাবকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩)

এ সেই আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইয়াজিদের খুশির জন্য যে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কে নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। নবী পরিবারের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল, তাঁদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করেছিল। তার দৃষ্টিতে একমাত্র আবদে মান্নাফের বংশধরদেরই সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। নৈতিক চরিত্র, যোগ্যতা এবং উন্নত ধ্যানধারণার কোন মূল্যই তার কাছে ছিল না। যে তাচ্ছিল্যের সাথে সে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-এর কথা উল্লেখ করেছিল, এর দ্বারাই তার ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম গণের (রা) দুশমন, সৎকর্মশীল লোকদের প্রধান শত্রু যে মারওয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-এর মত একজন সাহাবীর পরিবর্তে খেলাফতের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকেই অধিক যোগ্য বলে বিবেচনা করল। অথচ ইমাম হুসাইন (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পর আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা, উন্নত চরিত্র এবং সার্বিক যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ছিলেন তৎকালীন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা। হযরত যুবাইর (রা)-এর পুত্র বিশ্ব মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ভাগিনা এবং ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা)-এর দৌহিত্র। যাহোক, মারওয়ান যিয়াদের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, তবে তোমার মতামত কি?

যিয়াদ বলল, আপনি দামেশকে ফিরে গিয়ে স্বীয় খেলাফতের জন্য লোকদের আহবান করুন, আমি আপনাকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করব।

আমর ইবনে সাঈদও তাকে এ কথাই বলল। আমর ইবনে সাঈদ ছিল ইয়ামেনে বসবাসকারী আরবদের নেতা। ইয়ামেনবাসীগণ তার অনুগত ছিল। সে মারওয়ানকে পরামর্শ দিল যে, ইয়াযিদের বিধবা স্ত্রী, যুবক খালেদের মাতাকে বিবাহ কর, ফলে পথের কাঁটা খালেদও দূরে চলে যাবে।

তাদের তিন জনের মধ্যে একটি গোপন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল এবং তারা একই সাথে দামেশকে ফিরে আসল। ইবনে যিয়াদ দামেশকের কারাদিস ফটকে অবতরণ করল এবং যুহহাক ইবনে কায়েসের সাথে সাক্ষাৎ করে তার হাত চুম্বন করে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও বংশ গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করল। অবশেষে স্বগৃহে ফিরে আসল। পরের দিন আবার ইবনে কায়েসের দরবারে হাজির হয়ে পূর্বের মতই তোষামোদ করে ফিরে আসল। তৃতীয় দিন পুনরায় এসে তার সাথে নির্জনে কথা বলল। যিয়াদ বিস্ময় প্রকাশ করে ইবনে কায়েসকে বলল, আপনিও একজন কুরাইশ বংশীয় নেতা, আপনি ইবনে যুবাইর (রা) অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ও জনপ্রিয়। আপনি কি করে ইবনে যুবাইর (রা) কে সমর্থন করেন?

ইবনে যিয়াদ অতীব কৌশলী, মৃদুবাক ও একজন বিশিষ্ট বাগ্মী ছিল। যুহহাক ইবনে কায়েস একজন সরল-সোজা সৈনিক ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই ইবনে যিয়াদ তাকে কাঁচের সিড়িতে দাঁড় করিয়ে দিল এবং ইবনে যুবাইর (রা)-এর পরিবর্তে তার নিজের খেলাফতের দাবী করতে তাকে উৎসাহিত করে তুলল। অতএব যুহহাক ইবনে কায়েস তার কথা অনুযায়ী মানুষের এক সমাবেশে তার হাতে খেলাফতের বায়আত করতে লোকদেরকে আহবান করলেন। কিছু লোক তার হাতে বায়আত করল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা ইবনে যুবাইর (রা)-এর সমর্থক ছিল তারা তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করল।

ইবনে যিয়াদের ধূর্ততার ফলে যুহহাক ইবনে কায়েসের মত একজন বিশিষ্ট সেনাপতির বিপুল শক্তি এমনিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। এ নরাধম জালেম তাকে আবারও পরামর্শ দিল যে, আপনি দামেশকের শহর ছেড়ে

বাইরে তাঁবু স্থাপন করে সাধারণ সৈনিক ও নগরবাসীকে আপনার প্রতি আহ্বান করুন। যুহহাক ইবনে কায়েস তার এ পরামর্শ মেনে দামেশক নগরী থেকে বের হয়ে ময়দানে এসে তাঁবু স্থাপন করল। অপরদিকে ইবনে যিয়াদ নগরেই অবস্থান করতে লাগল এবং শহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণকে মারওয়ানের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে লাগল।

এ সময় মারওয়ান ও উমাইয়া বংশের অন্যান্য লোকেরা তাদমীরে অবস্থান করছিল। ইয়াযিদের যুবক পুত্র খালেদ এবং তার মা আল-জাবিয়ায় অবস্থান করছিল। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মারওয়ানের নিকট একথা বলে দূত প্রেরণ করল যে, বনু উমাইয়াকে সংঘবদ্ধ করে তাদের বায়আত গ্রহণ করে নিন এবং আল-জাবিয়ায় গিয়ে খালেদের মাতাকে বিবাহ করুন।

মারওয়ান ইবনে যিয়াদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে লাগল। সে প্রথমতঃ বনু উমাইয়াদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করল। তারপর আল-জাবিয়ায় গমন করল। এখানে ইয়াযিদের পুত্র খালেদ তার পরম সুহৃদ খালু হাসসান ইবনে মালেকের তত্ত্বাবধানে ছিল। আল-জাবিয়ায় মারওয়ানের আগমনের পূর্বে হাসসান ইয়াযিদের পুত্র খালেদের পক্ষেই খেলাফতের বায়আত করতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যখন মারওয়ান আল-জাবিয়ায় এসে পৌঁছল, তখন হাসসানের মত পরিবর্তন হয়ে গেল। সে মারওয়ানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার হাতেই বায়আত করল। তার বায়আতের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমস্ত জনগণ মারওয়ানকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিল। এভাবেই হাকাম ইবনে আসের পুত্র মারওয়ানের জন্য খেলাফতের পথ সুগম হয়ে গেল। তিনি খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেই ইয়াযিদের বিধবা স্ত্রী খালিদের মাতাকে বিবাহ করে তার পথের সকল বাধা বিপত্তি দূর করে দিলেন।

ইবনে সাদ বলেন– এদিকে আল-জাবিয়ায় লোকেরা মারওয়ানের হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করল, অপরদিকে ইবনে যিয়াদ দামেশকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সে দিনই মারওয়ানের পক্ষে দামেশকবাসীদের বায়আত গ্রহণ করল এবং তাকে লিখে পাঠাল যে, যুহহাক ইবনে কায়েস মারজে রাহাতে অবস্থান করছে সুতরাং আপনি তার দিকেই অগ্রসর হোন।

হাসসান ইবনে মালেক এবং সাঈদ ইবনে আমর তাদের সৈন্য নিয়ে মারওয়ানের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ছয় হাজার। তিনি উক্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে মারজে রাহাতের দিকে অগ্রসর হলেন। ইবনে যিয়াদও সাত হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মারজে রাহাতে এসে উপস্থিত হল। এভাবে মারওয়ানের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল তের হাজার।

অপরদিকে যুহহাক ইবনে কায়েসের সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ছিল। তিনি আহবান করতেই বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে তারা দ্রুতগতিতে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

যদিও যুহহাক ইবনে কায়েসের সৈন্য সংখ্যা মারওয়ানের সৈন্যের প্রায় আড়াই গুণ বেশি ছিল, কিন্তু মারওয়ানের সঙ্গে উমাইয়া বংশের সমস্ত লোক জড়িত থাকায় যুহহাকের সৈন্য বাহিনীর উপর মারওয়ানের একটা বিরাট প্রভাব পড়ে গেল।

ইবনে সাদ বলেন– দীর্ঘ বিশ দিন যাবৎ উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র যুদ্ধের ফলে প্রচুর রক্তপাত হল। অবশেষে এটা একটি গোত্রীয় যুদ্ধে পর্যবসিত হয়ে গেল। এক দিকে ইয়ামেনী লোক অপরদিকে কায়েসী লোক।

যুদ্ধের বিশতম দিনে যুহহাক ইবনে কায়েস তার কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গী-সাথীসহ নিহত হলেন। ফলে অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল।

মারজে রাহাতের যে ময়দানে এ যুদ্ধ হয়েছিল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই সে দিন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন কায়েসী বীরগণ নিহত হয়েছিল। ইয়াযিদের অযোগ্যতা এবং তার পুত্রের ভীরুতার কারণে বনু উমাইয়াদের নিকট থেকে নেতৃত্ব ও শাসনের যে সম্মানিত পোষাক অপহৃত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, আমর ইবনে সাঈদ এবং হাসসান ইরনে মালেক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার ফলেই তা পুনরায় তাদের পক্ষেই এসে গেল।

প্রকৃতপক্ষে এটা মারওয়ান ও ইবনে যুবাইর বা যুহহাকের মধ্যে যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল আরবের দু'টি প্রসিদ্ধ যুদ্ধপ্রিয় গোষ্ঠী– কায়সী ও ইয়ামেনীদের পারস্পরিক যুদ্ধ। সৌভাগ্যক্রমে মারওয়ান ইয়ামেনী সৈন্যদের সহযোগিতা

পেয়েছিলেন। ইবনে যিয়াদ, আমর ইবনে সাঈদ ও হাসসান ইবনে মালেকের মত চতুর ও তীক্ষ্ম মেধাবী বন্ধুরা এর দ্বারা তাদের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করেছিল। তখন সৈন্যবাহিনী যদি ইয়ামেনী ও কায়েসী এ দু' শিবিরে বিভক্ত না হত, তাহলে মারওয়ানও সফল হতেন না এবং রাজ সিংহাসন লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এভাবে মারজে রাহাতে ইয়ামেনীদের হাতে কায়েসীদের পরাজয় বনু উমাইয়াদের পতনোন্মুখ রাজপ্রাসাদকে সোজা করে দাঁড় করে দিয়েছিল।

মারওয়ান বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দামেশকে আগমন করল, হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে আরোহন করল এবং ইবনে সাদের ভাষ্য মতে, আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর ন্যায় সরকারী কোষাগারের দ্বার খুলে দিয়ে সাধারণ, অসাধারণ সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয় করে নিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল– হযরত ওসমান (রা) আমীরে মুয়াবিয়া (রা) এবং ইয়াযিদের যুগে যে মারওয়ান ধিকৃত ছিল, মদীনার লোকেরা যাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করত, সে আজ খলিফার আসনে সমাসীন হল।

মারওয়ান জর্ডানে পৌঁছে স্বয়ং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন, মনে হয় আল্লাহ পাক পূর্ব থেকেই আমার জন্য খেলাফতের সিংহাসন নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ পাক তাঁর জন্য পূর্ব থেকেই খেলাফতের পদ নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, আমর ইবনে সাঈদ এবং হাসসান ইবনে মালেকের মত সুচতুর, বুদ্ধিমান, উদ্দ্যমশীল অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তার পার্শ্বে এসেই তার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করেছিল।

মারওয়ানকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, তন্মধ্যে তাঁর বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন যুবক পুত্র আবদুল মালেক এবং আবদুল আজীজের ভূমিকাও অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁর এ পুত্রদ্বয় যদি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী ও মেধাবী না হত তবে হয়ত তিনি এরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতেন না।

খেলাফত লাভের ছয় বা আট মাস পরেই যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তার দু' পুত্রকে একের পর এক করে তার স্থলাভিষিক্ত

ঘোষণা করলেন। আবদুল মালেক বয়সের দিক দিয়ে বড় ছিলেন বলে তাকে প্রথম এবং আবদুল আজীজকে তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করলেন। তার মৃত্যুর সময় আবদুল মালেক তার পার্শ্বেই অবস্থান করছিলেন এবং আবদুল আজীজ তখন মিসরে ছিলেন।

এ মারওয়ানই আবদুল আজীজের পিতা এবং ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর দাদা ছিলেন। (তাবকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

আবদুল আজীজ

ঐতিহাসিকগণ আবদুল আজীজের বড় ভাই এবং মারওয়ানের জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল মালেককে তার তীক্ষ্ণ মেধা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য দ্বিতীয় মুয়াবিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা তাকে সে সময় সকল লোকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বাস্তবিকই তিনি দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ছিলেন। তিনিও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মত দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্যের বুনিয়াদকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেছিলেন।

কিন্তু আবদুল আজীজ বয়স, বুদ্ধি ও রাজনীতিতে আবদুল মালেকের চেয়ে ভাল হলেও চরিত্রমাধুর্য, ভদ্রতা, সততা-সাধুতা ও স্বচ্চরিত্রতার অন্যান্য গুণে আবদুল মালেকের চেয়েও অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।

আবদুল মালেকের স্বভাব-চরিত্র, কাজ-কর্ম, কথাবার্তা ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি মারওয়ান ইবনে হাকামেরই সুযোগ্য পুত্র। যারা আবদুল আজীজকে দেখেছেন, যারা তাঁর পার্শ্বে অবস্থান করেছেন, তাদের নিকট আবদুল আজীজের বংশ পরিচয় প্রকাশ না করলে, তারা তাঁর সৎ স্বভাব ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তাঁকে ওমর ফারুক বা আবুবকর (রা) অথবা এ জাতীয় কোন মনীষীর সন্তান বলেই ধারণা করত।

আবদুল আজীজ তার ভাই আবদুল মালেকের চেয়ে শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার দিক দিয়ে সমান পর্যায়ের ছিলেন না। যখন তিনি তাঁর পিতার সাথে মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন তিনি অসীম বীরত্বের সাথে

যুদ্ধ করে সেখানকার শাসক ইবনে মাজাদামকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন।

ঐতিহাসিক সুয়ূতী বলেন, মিশরের কিছুসংখ্যক লোকের আমন্ত্রণক্রমে মারওয়ান যখন মিশর আক্রমণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তার পুত্র আবদুল আজীজকে অল্প কিছু সৈন্যসহ জেরুজালেমে পাঠালেন। সেখানে মিশরের শাসনকর্তা পূর্ব থেকেই বিরাট এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

আবদুল আজীজ তখনও পথিমধ্যে ছিলেন। ইবনে মাজদাম তাঁর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্যে যুদ্ধপটু সেনাপতি যুবাইর ইবনে কায়েসকে পাঠালো। বাচ্ছাক নামক স্থানে আবদুল আজীজ ও যুবাইরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এ যুদ্ধে আবদুল আজীজ অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে শত্রু বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে তাদের কয়েকজন বিখ্যাত সেনাপতিকে হত্যা করলেন। শত্রু বাহিনী যেভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হল, ইবনে মাজদাম ও তার সেনাপতি যুবাইর তা ভাবতেও পারেনি।

আবদুল আজীজের এ অসাধারণ বীরত্বের ফলেই ইবনে মাজদাম মারওয়ানের সাথে একটি প্রদর্শনীমূলক যুদ্ধ করেই সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।

মারওয়ানও তার পুত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ কারণেই তিনি দুই মাস মিশরে অবস্থান করার পর যখন সিরিয়ায় গমন করেন তখন আবদুল আজীজের হাতেই মিশরের শাসনভার অর্পণ করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বলেন– ৬৫ হিজরীতে মারওয়ান আবদুল আজীজকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তখন মিশরবাসী তাঁর ধ্যান-ধারণা ও চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা উপলব্ধি করেছিল যে, এরূপ চরিত্রবান, দয়ালু, বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল কোন বাদশাহ ইতোপূর্বে আর মিশরবাসীদের শাসন করেনি।

(ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮)

ইবনে সাদ বলেন– আবদুল আজীজ একজন উচ্চশ্রেণীর আলেম এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর একজন ছাত্র। তিনি তাঁর নিকট থেকে বেশ কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আবদুল আজীজের ওস্তাদগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এবং ওকবা ইবনে আমের (রা) ছিলেন অন্যতম।

(তাবকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫)

ইবনে কাছীর আবদুল আজীজের ওস্তাদগণের আলোচনা শেষে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর হাদীস বর্ণনা সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তিনি ছিলেন সব দিক দিয়ে সফল ব্যক্তিত্ব, তিনি বিনয়-নম্রতা, শালীনতা ও ভদ্রতার সাথে শুদ্ধ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

আবদুল আজীজ মদীনায় জন্মগ্রহণ করে সেখানেই কুরআনসহ অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু মিশরে আসার পর তিনি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

আবদুল আজীজের ভাষায় দক্ষতা অর্জন প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, একবার এক ব্যক্তি তার জামাতার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ নিয়ে আবদুল আজীজের নিকট আগমন করল। আরবীতে জামাতাকে "খাতেন" বলা হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি তার এরাবের (স্বরচিহ্ন) উপর খুব জোর দেয়নি, আবদুল আজিজও এরাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– مَنْ خَتَنَكَ (মান খাতানাক) অর্থাৎ তোমাকে কে খৎনা করেছে? অথচ তার জিজ্ঞাসা ছিল مَنْ خَتَنُكَ (মান খাতিনুকা) অর্থাৎ তোমার জামাতা কে? অতএব সে অভিযোগকারী বিদ্রূপ করে জবাব দিল যে, সাধারণ মানুষকে যে খৎনা করে থাকে আমাকেও সে খৎনা করেছে। এতে আবদুল আজীজ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। অতঃপর আবদুল আজীজ উপদেষ্টার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তিনি বললেন, আপনার জিজ্ঞাসা ছিল مَنْ خَتِنُكَ (মান খাতিনুকা) অর্থাৎ তোমার জামাতা কে? কারণ খাতেনুনের অর্থ হল জামাতা। এরপর আবদুল আজীজ কসম করলেন

যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভাষার উপর পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আর প্রাসাদের বাইরে বের হবেন না। অতএব তিনি পূর্ণ আট দিন প্রাসাদের ভিতরে থেকে ভাষায় পূর্ণ দখল অর্জন করে যখন বের হলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের ভাষাবিদ, পণ্ডিত।

জ্ঞান বিস্তার

আবদুল আজীজ শুধু নিজেই পাণ্ডিত্য অর্জন করে ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি তাঁর কর্মচারী, পরিষদ এবং দরবারের অন্যান্য লোকদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করলেন। এমনকি তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ভাষাজ্ঞান ভিত্তিতে বেতন-ভাতা ও পদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিলেন। যার ভাষা ভুল হতো তার বেতন কমিয়ে দিতেন এবং যার ভাষা শুদ্ধ-মার্জিত হতো তাকে পদোন্নতি দিতেন। তাঁর এ কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সাথেই কার্যকরী হল। সকলেই ভাষা আয়ত্ব করতে আগ্রহী হয়ে উঠল এবং খুব তাড়াতাড়িই তার কর্মচারীদের ভাষা পরিবর্তন হয়ে ত্রুটিমুক্ত হয়ে গেল।

একবার তাঁর একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কোন বংশের লোক? সে উত্তর করল– مِنْ بَنُوْ عَبْدِ الدَّارِ। অর্থাৎ আমি আবদেদ্দার বংশের লোক। এ বাক্যটিতে ব্যাকরণগত ত্রুটি ছিল। তার বলা উচিত ছিল– مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ

সে কর্মচারীর ভাষাগত এ ত্রুটির জন্য আবদুল আজীজ তার প্রতি খুব অখুশি হলেন এবং একশত দিনার বেতন কমিয়ে দিলেন।

(আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭)

আবদুল আজীজ মিশরের আলেম-উলামা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাদের প্রতি যে দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি প্রত্যেকটি শিক্ষিত পরহেযগার লোকের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিস্তারের জন্য বেশকিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন, এমনকি তাঁর প্রাসাদটিকেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। (ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮)

দানবীর

ইবনে কাছীর আবদুল আজীজকে তখনকার সময়ের সবচেয়ে বড় দানশীল বাদশাহ বলে উল্লেখ করেছেন, আর বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাই ছিলেন। তিনি শুধু দান-খয়রাতই করতেন না বরং সর্বসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে কৃষি বিভাগের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছিলেন, বহু ফলের বাগান তৈরি করেছিলেন। বহু অনাবাদী ভূমি নূতুন কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সমস্ত অনাবাদী ভূমিতে মিশরীয়দের স্বত্ব ছিল না, সে সমস্ত ভূমিতে আরবের কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ লোক এনে তাদেরকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। মিশরীয় উপসাগরের উপর সেতু নির্মাণ, বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ, মসজিদ নির্মানসহ অসংখ্য জনহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি কায়রো নগরীতে নিজের জন্য একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করে অবশেষে সেটা মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি হালওয়ান নামক স্থানে এসে বসবাস করতেন।

জনসেবা

কায়রোর জামে মসজিদ আজও আবদুল আজীজের স্মৃতি বহন করছে। তিনি পূর্বের মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে এমন এক বিরাট ও সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করলেন যে, সে সময় এরূপ মসজিদ দুনিয়ার আর কোথায়ও ছিল না।

দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ তাঁর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ছোট-বড় সকল কাজেই তিনি আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আবুল খায়ের মুরছেদ এবং আবদুর রহমান ইবনে মাজরাহ ছিলেন সে সময়কার বিশিষ্ট আলেম। তিনি তাঁদের উভয়কেই তাঁর প্রধান উপদেষ্টার পদে নিয়োগ দান করেছিলেন।

আবদুল আজীজের দানশীলতার কথা কল্প-কাহিনীর মত সর্বত্রই আলোচিত হতো। তাঁর বাবুর্চিখানায় প্রতি দুপুর ও সন্ধ্যায় দু'হাজার লোকের খানা রান্না করা হতো। যখন খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছানো হত, তখন দেখা যেতো যে, মিশরের বিশিষ্ট আলেম-উলামাসহ সর্বপ্রকার জ্ঞানী-গুণী লোকেরাই সেখানে খানায় শামিল হয়েছেন।

আবদুল আজীজ প্রতি বছর শীত ও গ্রীষ্মের শুরুতে হাজার হাজার দরিদ্র ও অভাবী-অনাথ লোককে শীত ও গ্রীষ্মের বস্ত্র বিতরণ করতেন। বিধবা,

ইয়াতীম ও নিঃস্ব লোকের ভাতার ব্যবস্থা করে অভাবী লোকদের দুঃখ দূর করতেন।

সাহিত্যানুরাগী

কবি-সাহিত্যিকগণ ছিলেন তাঁর নিকট খুবই প্রিয়। বিশেষতঃ কাছীর ও নাছীবকে তিনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলেন, অতীতে কেউ কোন কবিকে এরূপ অর্থ-সম্পদ দিয়েছে বলে কারো জানা নেই। তিনি যে সমস্ত লোককে মোটা অংকের অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) অন্যতম ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা) ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে আসেমের চাচা এবং পুত্র ওমর ইবনে আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধায়ক ও ওস্তাদ।

ইবনে কাছীর (র) আবদুল আজীজের মৃত্যুর শোকে কাতর হয়ে এ ছোট একটি বাক্য ব্যবহার করেছিলেন–

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مَرْوَانَ مِنْ خِيَارِ الْاُمَرَاءِ كَرِيْمًا جَوَادًا مُمَدَّحًا

অর্থাৎ আবদুল আজীজ একজন যোগ্য শাসক ও দয়ালু-দাতা এবং প্রশংসার পাত্র ছিলেন। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৮)

বিবাহ

আবদুল আজীজ জীবনে কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর কয়েকজন পুত্র সন্তানও ছিল; কিন্তু যে পুত্রের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া তাঁর খ্যাতি লাভ হয়েছিল তিনি ছিলেন এই ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)।

কৃতিত্ব

ইবনে কাছীর আবদুল আজীজের গুণাবলি বর্ণনা করে এটাও বলেছেন যে, তিনি ছিলেন খলীফায়ে রাশেদীনের ওমরের-পিতা।

ইবনে কাছীরের মতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর মধ্যে যে সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, তা এজন্যই যে, তিনি সর্বদাই স্বীয় পিতার গুণাবলি অর্জন করতে চেষ্টা করতেন।

বাস্তবিকই এ ধারণা অত্যন্ত সঠিক ও যুক্তিযুক্ত, তদুপরি এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) যে মাতার দুগ্ধ পান করেছিলেন, তিনিও ছিলেন দুনিয়ায় একজন অসাধারণ মা।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজের মাতা উম্মে আসেম

ইবনে সাদ বলেন– আবদুল আজীজ ইবনে মারওয়ান যখন ওমরের মাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার সচিবকে ডেকে বললেন, আমার পবিত্র আমদানী থেকে চারশত দিনার সংগ্রহ করুন, আমি পুণ্যবান ও উচ্চ ঘরে একটি বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছি।

(তাবকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫)

ইবনুল জাওযিও ইবনে সাদের উদ্ধৃতি দিয়ে তার কিতাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জওযি ৫ম খণ্ড)

ইবনুল জাওযি বলেন– এ পুণ্যবান উচ্চ ঘর ছিল হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বংশ। উম্মে আসেম ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর পুত্র হযরত আসেম(রা)-এর কন্যা। তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে একটি মৌখিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল হাকাম এ ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হল–

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাঁর খেলাফতের সময় দুধে পানি মিশানো নিষেধ করে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। এক রাত্রে তিনি মদীনার গুলি-গলি ঘুরে দেখতে বের হলেন। তখন একটি স্ত্রীলোক তার মেয়েকে বলছিল, সকাল হয়ে গেল, তুমি দুধে পানি মিশাও না কেন? বালিকা উত্তর করল, আমি কিভাবে দুধে পানি মিশাব? খলীফা ওমর (রা) যে দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন! মা বলল, লোকে পানি মিশায়, তুমিও মিশিয়ে নাও। খলীফা কিভাবে জানবেন? বালিকা বলল, ওমর (রা) যদিও না জানে, কিন্তু ওমরের আল্লাহর নিকট এটা গোপন থাকবে না। খলীফা হযরত ওমর (রা) যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, আমি কখনও তা করব না।

ইবনে আবদুল হাকাম বলেন– খলীফা হযরত ওমর (রা) এ কথোপকথন শুনতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি তার পুত্র আসেমকে

ডেকে এনে বললেন, বৎস! অমুক স্থানে গিয়ে এ বালিকাটির সন্ধান করে আস। তিনি সে বালিকার গুণাবলি বলে দিলেন। আসেম সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, উক্ত বালিকাটি হেলাল গোত্রের কোন একজন বিধবার কন্যা। আসেম ফিরে এসে পিতা হযরত ওমর (রা)-এর নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। হযরত ওমর (রা) তাকে এ বালিকাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, হয়তঃ এ বালিকার গর্ভেই এমন এক মনীষী জন্মগ্রহণ করবেন, যার জন্মে সমস্ত আরব গর্ববোধ করবে, যিনি আরবের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং সমস্ত আরবের নেতৃত্ব দিবে।

আসেম এ বালিকাকে বিয়ে করে স্ত্রীরূপে বরণ করে নিলেন। এ বালিকাই পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানের গৌরব হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর মাতা উম্মে আসেমকে গর্ভে ধারণ করে বিশ্বে অমর হয়ে রয়েছেন। আবদুল আজীজ উম্মে আসেমকে বিবাহ করলেন, তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করলো ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসক হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)।

ইবনে আবদুল হাকাম এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, মিশরের রাজা আজীজ মিশর হযরত ইউসুফ (আ) কে দেখে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। আর হযরত ওমর ফারুক (রা) এ বালিকাকে দেখে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

ইবনে আবদুল হাকামের টীকায় এ বালিকার নাম 'লাইলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শায়খুল কবীর মুহিউদ্দীন আল-আরাবী তার নাম 'কারীবা' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযির বর্ণনাও প্রায় একই ধরণের। অবশ্য তার এ বর্ণনাটি কিছুটা ভিন্ন ধরণের এবং প্রসঙ্গের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহল–

তারপর হযরত ওমর (রা) তদীয় খাস খাদেম আসলামকে বললেন, সেস্থানে গিয়ে দেখ, যারা এ ধরণের কথোপকথন করেছিল, তারা কে? তাদের কোন পুরুষ লোক আছে কিনা।

আসলাম বলেন, আমি সেস্থানে এসে এদিক ওদিক খোঁজ নিয়ে দেখলাম একটি কুমারী বালিকা এবং তার বিধবা মাতা ছাড়া তাদের সংসারে আর

কোন পুরুষ নেই। আমি তাদের এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা)-এর নিকট বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তখন খলীফা হযরত ওমর (রা) তদীয় পুত্রগণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কারও স্ত্রীর প্রয়োজন আছে কি যে, আমি এ বালিকার সাথে তার বিবাহ দিব? আবদুল্লাহ বললেন, আমার স্ত্রী আছে, সুতরাং আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন প্রয়োজন নেই। আবদুর রহমানও অনুরূপ উত্তর করলেন। তখন আসেম নিবেদন করলেন, পিতা! আমার কোন স্ত্রী নেই, আমার নিকট তাকে বিবাহ দিন। তারপর হযরত ওমর (রা) সে বালিকাকে ডেকে আনালেন এবং আসেমের সাথে তাকে বিবাহ দিলেন।

আমরা এজন্যই এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলাম, যেহেতু এটা পূর্বোক্ত বর্ণনার চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত। তদুপরি এটা হযরত ওমর (রা)-এর খাস খাদেম স্বয়ং আসলামের মৌখিক বর্ণনা। মা ও মেয়ের কথোপকথনের সময় আসলামও হযরত ওমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁকেই এটা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আসেমকে দেননি।

এ বালিকা যাকে হযরত ওমর (রা) তার পুত্র বধুরূপে গ্রহণ করলেন, তিনি ছিলেন হেলাল গোত্রের এক বিধবার কন্যা। মা-মেয়ে দুধ বিক্রয় করে জীবিকা চালাতো। সম্পূর্ণ দৈবক্রমেই হযরত ওমর (রা) এ ঘটনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন।

ইবনুল জাওযির বর্ণনা অনুযায়ী এ বালিকার গর্ভে আসেমের ঔরসে দু'জন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাদের একজনকে আবদুল আজীজ বিবাহ করেন এবং তার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)।

হযরত ওমর ইবন আবদুল আজীজ (র)

জন্ম

ইবনে আবদুল হাকামের বর্ণনা মতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবদুল আজীজ যখন এ বিবাহ করেন তাঁর পিতা মারওয়ান তখনও খেলাফতের আসন লাভ করেননি।

প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আল্লামা নব্বী তাহযীবুল আসমা ওয়াল ফাতে লিখেছেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতে ওমর মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে আবদুল হাকামের টীকায় লিখা আছে যে, ওমর ৬৩ হিজরীতে হালওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। এ দু'টি কথাই যদি আমরা সঠিক বলে মনে করি, তাহলে আবদুল আজীজের শাসনকাল ৬৫ হিজরীর পরিবর্তে ৬১ হিজরী থেকে শুরু হয়। অথচ সমস্ত ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, মারওয়ান ও আবদুল আজীজ ৬৫ হিজরীতেই মিশর অধিকার করেছিলেন।

ইবনে সাদ ও ইবনে আবদুল হাকাম প্রবীণ ঐতিহাসিক। বিশেষতঃ ইবনে আবদুল হাকাম ছিলেন মিশরের অধিবাসী। কাজেই তিনিই ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর জীবনীর সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য সনদ। তারপরও তাঁর পিতামহ বনী উমাইয়াদের খাস খাদেম ছিলেন। তিনি ১৫৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর ইন্তেকালের মাত্র ৫২ বৎসর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যদি তিনি ১৬১

হিজরী পর্যন্ত কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তবে তখনও পর্যন্ত মিশরে এরূপ লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ লাভ বিচিত্র কিছু নয়, যারা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর শাসনকাল দেখেছেন।

যদিও ইবনে আবদুল হাকাম ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ লিখেননি, তবে তিনি একথা পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সেখানকার শিক্ষকগণের নিকটই বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন।

তার ভাষ্যটি হল–

وُلِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا كَبَرَ صَارَ اَبُوْهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مَرْوَانَ اِلٰى مِصْرٍ اَمَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ كَتَبَ اِلٰى زَوْجَتِهِ اُمِّ عَاصِمٍ اَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিনি যখন কিছুটা বড় হলেন, তখন তাঁর পিতা আবদুল আজীজ মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসলেন এবং তিনি তাঁর পত্নী উম্মে আসেমকে তাঁর নিকট মিশরে যেতে লিখে পাঠালেন। (ইবনে আবদুল হাকাম ১৯ পৃষ্ঠা)

এটা এমন এক ঐতিহাসিক বর্ণনা, যিনি স্বয়ং মিশরের অধিবাসী ছিলেন এবং যে শতাব্দীতে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) ইন্তেকাল করেছেন, সেই শতাব্দীতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ ইবনে আবদুল হাকামের লিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাননি অথবা যদি পেয়েও থাকেন তবে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর স্থান নির্দেশ করতে তারা ভুল করেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ এ সম্পর্কে অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি মাত্র এ কয়টি কথা দ্বারা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন।

قَالُوْا وُلِدَ عُمَرُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةٍ وَهِىَّ السَّنَةُ الَّتِىْ مَاتَتْ فِيْهَا مَيْمُوْنَةَ زَوْجَةُ النَّبِىِّ صَلْعَمْ

অর্থাৎ বর্ণিত আছে যে, ওমর ৬৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ বৎসরই উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) ইন্তেকাল করেন। এ কথার সম্পর্ক দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে সাদের মতে এটা নির্ভরযোগ্য ছিল যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫ম, পৃ. ২২৪)

যদি হালওয়ান বা মিশরের অন্য কোন শহরে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে মনে করি, তবে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর জন্ম তারিখ অন্য কোন তারিখ অথবা মেনে নিতে হবে যে, আবদুল আজীজ তাঁর পিতা মারওয়ানের খেলাফতের পূর্বে এবং তিনি স্বয়ং মিশরের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পূর্বে তাঁর স্ত্রী উম্মে আসেমসহ মদীনা গিয়েছিলেন।

ক্রমবিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই তিনি প্রতিপালিত হন। সালেহ ইবনে কাইসান এবং আবদুল্লাহ ইবনে উতবার মত বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তাঁর শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। আল্লামা যুহরীর মতে, সালেহ ইবনে কাইসানকে তাঁর পিতা আবদুল আজীজই তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। সালেহ সময় সময় সাধারণ ক্রমোন্নতির সাথে সাথে শিক্ষাগত উন্নতি সম্পর্কেও তাঁর পিতা আবদুল আজীজকে অবহিত করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লামা যুহরীর কথা উল্লেখ্য যে, একদা সালেহ ইবনে কাইসান আবদুল আজীজের নিকট তাঁর পুত্র সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে তিনি এ অভিযোগও করেছিলেন যে, ওমর মাথার চুল আচরাতে নামাযে বিলম্ব করেছে।

(তাযকেরাতুন হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৩৩ পৃ. ইবনুল জাওযি ৯ পৃ.)

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) এমন সময়েই সালেহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যখন নামাযে বিলম্বের কারণে কঠোরতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং যখন মাথার চুল পরিপাটি সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ ধারণা ছিল, আর এটা বার বছর বয়সের উপর ছাড়া কম নয়।

আমাদের ধারণা বার বছর বয়সের পর সালেহ ইবনে কাইসান হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বার বছর বয়সের পূর্বে তিনি তাঁর নানা এবং মায়ের চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ইবনে আবদুল হাকামের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আমাদের এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি "তিনি অধিকাংশ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর নিকট আসতেন এবং মায়ের নিকটে গিয়ে বলতেন, মা! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমিও তোমার চাচার মত হই!" এতে মা তাঁকে আদর করে সান্ত্বনা দিতেন, চিন্তা করো না, তুমিও আমার চাচার মত হবে ইনশাআল্লাহ।" (ইবনে আবদুল হাকাম, ১৯ পৃ.)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, না তিনি ওমরকে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, যখন আবদুল আজীজ মিশর জয় করে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন উম্মে আসেম এবং তার পুত্র ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) উভয়েই মদীনাতে ছিলেন। আর যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র) ছিলেন উম্মে আসেমের পিতৃব্য এবং তখন আসেম ইন্তেকাল করেছিলেন, কাজেই মা-পুত্র উভয়েই তাঁর তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। উম্মে আসেম সকল কাজকর্মেই চাচার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তিনি যে পরামর্শই দিতেন সে অনুযায়ী কাজ করতেন। উদাহরণস্বরূপ ইবনে আবদুল হাকামের এ বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

যখন তাঁর পিতা আবদুল আজীজ মিশরে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে আসেমকে পুত্র ওমরসহ তার নিকট চলে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠালেন। উম্মে আসেম তার পিতৃব্যের নিকট এসে স্বামীর পত্র সম্পর্কে জানালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী! তিনি তোমার স্বামী, তাঁর নিকট চলে যাও। উম্মে আসেম যখন স্বামীর নিকট চলে যেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাঁকে বললেন, বালকটিকে আমাদের নিকট রেখে যাও, সে আমাদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব উম্মে আসেম ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)কে তাঁর চাচার নিকট রেখে তিনি স্বামীর

নিকট চলে গেলেন। আবদুল আজীজ পুত্রকে দেখতে না পেয়ে উম্মে আসেমকে বললেন, ওমর কোথায়? উম্মে আসেম উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কথা বললেন এবং বললেন যে, চাচা আবদুল্লাহ স্বগোত্রের সাদৃশ্যের কারণে তাকে তাঁর নিকট রেখে যেতে বলেছিলেন। আবদুল আজীজ এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা আবদুল মালেককে এ বিষয় জানিয়ে দিলেন। খলীফা আবদুল মালেক ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জন্য মাসিক এক হাজার দীনার ভাতা দানের নির্দেশ প্রদান করলেন। (ইবনুল জাওযি ৯)

মাতা যতদিন মদীনায় ছিলেন তিনিও মায়ের সাথে মারওয়ানের ব্যক্তিগত গৃহেই থাকতেন। কিন্তু তবুও তাঁর অধিকাংশ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর নিকট কাটতো। মা মিশরে চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে চলে আসলেন এবং তাঁর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর মা স্বীয় পিতৃব্যের নিকট তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, এতে তাঁর পিতা ইবনে ওমরের তত্ত্বাবধানকে শুধু সমর্থন করেননি, বরং তাঁর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করার কারণে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন।

এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, আবদুল আজীজ নিজে তার পুত্রের শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ করেননি, বরং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাঁর শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন, তবে তাতে আবদুল আজীজের অনুমোদন ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) তার ওস্তাদগণের প্রভাবে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবাহর প্রভাব তাঁর উপর বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল।

ইবনুল জাওযি বলেন–

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَيًّا مَّا صَدَرْتُ اِلاَّ عَنْ رَّأْيِهِ

অর্থাৎ ওমর বলতেন, যদি উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পরামর্শ ব্যতীত আমি কোন আদেশ জারী করতাম না।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) অন্যান্য ওস্তাদগণের তুলনায় উবায়দুল্লাহর নিকট অনেক কিছু শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। বিশেষতঃ অধিকাংশ হাদীস তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা করেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিগত কথা হল–

رَوَيْتُ مِنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَكْثَرَ مِمَّا رَوَيْتُ عَنْ جَمِيْعِ النَّاسِ

অর্থাৎ আমি অন্যান্য সকলের নিকট থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছি, তার চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছি উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে। (ইবনুল জাওযি- ৯)

উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবা একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি এতই আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোক ছিলেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) যখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তখন কোন দিনই তিনি তাঁর গৃহে গমন করেননি। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর ঘরে আসতেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা তাঁর আগমনের কোন মূল্যই দেননি, খাদেমের মাধ্যমে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ছাড়াও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত আনাস ইবনে মালেক এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), প্রমুখ মনীষীদের নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনুল জাওযি ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণের নাম ও তাঁদের নিকট থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন– যা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে। উদাহরণস্বরূপ দু' একটি এখানে উল্লেখ করছি। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট থেকে বেশ কিছুসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে দু'টি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

قَالَ اَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ يُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِكُمْ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ -

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি– "তোমরা লোকদেরকে সৎকার্যের আদেশ কর, অসৎ কার্যের নিষেধ কর, অন্যথায় তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের উপর শক্তিশালী হয়ে পড়বে, তারপর তোমরা তাঁকে যতই ডাক না কেন কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়ে দেবেন না।

قَالَ اَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوْجَزِ النَّاسِ صَلٰوةً فِىْ تَمَامٍ -

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায ছিল সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অথচ সংক্ষিপ্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর নিকট থেকে তিনি বহু হাদীস শিক্ষা করেছিলেন এবং কতিপয় হাদীস বর্ণনাও করে গিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُحِبُّ الشَّابَّ يُفْنِىْ شَبَابَهُ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَيُحِبُّ الْاِمَامَ الْمُقْسِطَ وَاَجْرُهُ اَجْرُ مَنْ يَّقُوْمُ سَنَتَيْنِ عَامًا يَّصُوْمُ نَهَارَهُ وَيَقُوْمُ لَيْلَهُ

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) বলেছেন, যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে তার যৌবন অতিবাহিত করে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককেও আল্লাহ ভালবাসেন এবং যে ব্যক্তি দু' বছর ব্যাপী দিনে রোযা রাখে ও রাতে আল্লাহর ইবাদত করে তাকে তার সমান পুরষ্কার দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা)-এর নিকট থেকেও তিনি অনেক হাদীস শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ শুধু একটি হাদীসের সন্ধান পেয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ اَسْمَاءِ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةَ الْكَرْبِ قَالَ اِذَا نَزَلَ بِكَ كَرْبٌ فَقُوْلِى اللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিপদের সময়কার একটি দুআ শিক্ষা দিয়ে বললেন, যখন তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তুমি বল যে, اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ, আল্লাহই আমার প্রতিপালক বা রব, আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) ইউসুফ ইবন সালামের নিকট থেকে অনেক হাদীস শিক্ষা করেছিলেন এবং বহু হাদীস বর্ণনাও করেছেন; কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে মাত্র এই একটি হাদীসই লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

قَالَ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُحَدِّثُ اِلاَّ يَلْمَعُ بِبَصَرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ -

অর্থাৎ ইউসুফ ইবনে আবদুস সালাম বলেছেন, নবী (সা) যখনই কোন হাদীস বলতেন, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকেও তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন। এছাড়া আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান, উরুয়া ইবন যুবাইর খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত, আমের ইবনে সাদ, ইবনে আবু ওয়াক্কাস আবু বুরদা, রবী ইবনে সারাতুল জুহানী, উরান ইবনে মালেক আয্-যাহরী, মুহাম্মদ ইবনে কাব, আবু সালাম এবং আবু হাযিম প্রমুখ মনীষীগণ তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ ছিলেন।

তন্মধ্যে কয়েকজন মুহাদ্দিস বিশেষ করে উরুওয়া ইবনে যুবাইর, আবু বুরদা, আয-যাহরী, আবু সালাম, খারেজা এবং আবুবকর ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। (ইবনুল জাওযি ১২ থেকে ৩৫)

ইবনে জাওযি বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) এ সমস্ত বিশিষ্ট ওলামাগণ ছাড়াও অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তিনি আরবী সাহিত্য ও আরবী কাব্য কার নিকট থেকে শিখেছিলেন তা

নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে তাঁর উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, মদীনায় থাকাকালে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

(ইবনুল জাওযি ১২-৩৫)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর নানা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যদিও স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তথাপি পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য সম-সাময়িক ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এজন্যই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাঁর মহান পিতা হযরত ওমর (রা)-এর আদর্শ বিচ্যুত না হয়েই তাঁর নাতী ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসন-পদ্ধতির ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, হযরত ওমর (রা) প্রত্যেক মুসলিম বালককে বিশেষতঃ প্রত্যেক যুবককে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। তিনি যখন মুসলমান বালক ও যুবকদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিয়োগ করেন তখন ভাষা শিক্ষা দেয়ার মত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনায় অবস্থানকালে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন– ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি এবং কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যখন মদীনা থেকে বের হয়ে সিরিয়া তারপর মিশরে গমন করেন তখন তিনি ছিলেন একজন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম। তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে মায়মুন ইবনে মেহ্রানের মত যোগ্য আলেমও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন–

اَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يَحْتَاجُ اِلَيْنَا فَاِذَا نَحْنُ تَلَامِيْذُهُ

অর্থাৎ আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর নিকট আগমন করলাম, আমাদের ধারণা ছিল যে, জ্ঞান সম্পর্কে তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী হবেন, কিন্তু তাঁর নিকট এসে উপলব্ধি করলাম যে, আমরা তাঁর ছাত্রতুল্য।

(ইবনুল জাওযি ২৭)

অন্য এক স্থানে মায়মুন ইবনে মেহ্রান ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)কে মুআল্লিমুল উলামা অর্থাৎ আলেমদের শিক্ষক এবং সম-সাময়িক সমস্ত আলেমকে তাঁর শিষ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। (ইবনুল জাওযি ৩৭)

ইবনে আবদুল হাকামের একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) দু'বার মদীনায় আগমন করেছিলেন।

তার ভাষ্যটি হল– তারপর ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) তাঁর পিতার নিকট মিশরে গমন করলেন এবং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী কিছুদিন পিতার নিকট অবস্থান করলেন।

একদিন তিনি গাধার পিঠে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। তাঁর ভাই 'আছবাগ" এ খবর শুনে হেসে উঠলেন। আবদুল আজীজ তাকে তিরস্কার করে বললেন, তোমার ভাই পড়ে আহত হয়েছে, আর তুমি তাঁর বিপদে হাসছ! আছবাগ উত্তরে বলল, পিতা! আমি ভাইয়ের অমঙ্গল কামনা করে হাসিনি এবং আমি তার আহত হওয়ায় মোটেই খুশী হইনি। তবে তিনি পড়ে আহত না হলে বনী উমাইয়ার শীর্ণ দেহধারীর নিদর্শন পূর্ণ হ্ত না। তিনি পড়ে আহত হওয়ায় বনী উমাইয়ার শীর্ণ দেহধারীর নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে এ কারণেই আমি হাসলাম।

আবদুল আজীজ এটা শুনে চুপ করে রইলেন এবং বললেন, যার সাথে অনেকের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত রয়েছে, মদীনা ছাড়া তার উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তারপর তিনি তাঁকে আবার মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। (ইবনে আবদুল হাকাম ১৯-২০ ও ইবনে কাছীর ১৯১৭)

এ ঘটনায় আছবাগ যে কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা বনু উমাইয়াদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ইবনে কাছীর বলেছেন যে, উমাইয়া বংশের লোকেরা বলাবলি করত যে, আমাদের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ খলীফা হবেন তিনিই যিনি হবেন দুর্বল দেহের অধিকারী। আর তিনি ছিলেন ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)।

(ইবন কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১৯)

ইবনুল জাওযি তার গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন যে, খোরাসানের একজন বুযুর্গ স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন মহান ব্যক্তি তাকে বলছেন– যখন বনী উমাইয়ার সবচেয়ে দুর্বল দেহধারী ব্যক্তি খলীফা নির্বাচিত হবেন তখন তিনি দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতার আবরণ দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। যেমন আজ অন্যায়-অত্যাচারে পূর্ণ হয়ে আছে। (ইবনুল জাওযি ৭)

ইবন কাছীর আরও বলেছেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) যখন গাধার পিঠ থেকে পড়ে আহত হলেন, তখন তাঁর পিতা আবদুল আজীজ তাঁর ক্ষত স্থানের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিলেন–

إِنْ كُنْتَ اَشْبَجَ بَنِىْ اُمَيَّةَ إِنَّكَ إِذًا سَعِيْدٌ

অর্থাৎ তুমি যদি বনী উমাইয়ার সেই শীর্ণকায় লোক হয়ে থাক তবে তুমি সৌভাগ্যশালী। (আল-বেদায়া ওয়ান বেহায়া ৭ম খণ্ড পৃ. ১৯২)

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল মিশরে, তখন আবদুল আজীজ মিশরের শাসনকর্তা এবং ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সেখানে গিয়েছিলেন।

ইবনে কাছীরের অপর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, আবদুল আজীজ যখন মক্কায় হজ্জ করতে আসতেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক এবং শিক্ষক সালেহ ইবনে কাইসানের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজ পুত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে অবগত হতেন।

(আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৮ম খণ্ড, ১৯২ পৃ.)

ইবনে কাছীর তাঁর শিক্ষা জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, বনু উমাইয়াদের সাধারণ লোকদের মত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ও হযরত আলী (রা)-এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন। এটা জানতে পেরে তাঁর উস্তাদ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি তাঁর সাথে কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) এই অসন্তুষ্টির কারণ জানতে চাইলে হযরত উবায়দুল্লাহ (র) অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন–

مَتٰى بَلَغَكَ اَنَّ اللّٰهَ سَخِطَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ بَعْدَ اَنْ رَضِىَ عَنْهُمْ

অর্থাৎ তুমি কখন অবগত হলে যে, বদরবাসীদের প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট হওয়ার পর তিনি আবার তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) শ্রদ্ধেয় উস্তাদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে খুব অনুশোচনা করলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোন দিন হযরত আলী (রা)-এর দোষ বর্ণনা করবেন না। বাকী জীবন তিনি সে ওয়াদা পালন করেছিলেন।

(ইবনে কাছীর ৮ম খণ্ড, পৃ. ১)

এখানে এ উদ্দেশ্যে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হল, যাতে পাঠকসমাজ উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁর মদীনার উস্তাদগণ কিরূপে তাঁর মন-মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছিলেন।

এ সময়কার উল্লেখযোগ্য অপর একটি ঘটনা হল, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) একদিন নামাযে শরীক হলেন না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক হযরত সালেহ (রা) এর কৈফিয়ত তলব করলে তিনি বললেন, আমি চুলে চিরুনী করছিলাম। এতে হযরত সালেহ (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেন– তুমি চুলে চিরুনী করাকে নামাযের উপর প্রাধান্য দিলে?

এরপর তাঁর পিতা আবদুল আজীজের নিকট এ অভিযোগ লিখে পাঠালেন। তখন এক বিশেষ দূত তাঁর শাস্তি প্রয়োগ করতে মদীনায় আসলেন এবং তাঁর মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেললেন এবং তাঁর সাথে কথা বললেন।

(ইবনে কাছীর ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাঁর পিতার এরূপ মনোবৃত্তিই তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল, যার ফলে মেহরানের মত বিশিষ্ট আলেমগণও তাদের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন।

ইবনে কাছীরের অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) মদীনায় অবস্থানকালে তাঁর দেখা-শুনার জন্য একদল সেবক নিযুক্ত ছিল। তিনি শাহী পরিবারের এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সদস্যের মতই

মদীনায় অবস্থান করতেন। কিন্তু এসব ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই সালেহ ইবন কাইসান (রা) তার পিতাকে বলেছিলেন, এ বালকের অন্তরে আল্লাহর ধ্যানে যত গভীরভাবে দাগ কেটেছে, আমার জানা মতে এরূপ আর কারও অন্তরে দাগ কাটতে পারেনি।

মদীনায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর জন্য খুবই উচ্চ ধরণের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর উস্তাদগণ তাঁকে শুধু ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁর মন-মস্তিষ্ককেও খুব মার্জিত ও পরিশীলিত করে দিয়েছিলেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর পিতার ইন্তেকাল

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করে মদীনা থেকে দামেশকে গেলেন, তারপর সেখান থেকে পিতার নিকট মিশরে চলে গেলেন এবং তাঁর পিতার ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি পিতার নিকট অবস্থান করেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) যখন তাঁর পিতা আবদুল আজীজের নিকট থাকতেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে কোন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন কিনা, তাঁকে প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিনা এবং তিনি তাঁর পিতার নিকট কত দিনই অবস্থান করেছিলেন তা জানা সক্ষম হয়নি।

মনে হয়, তিনি সামান্য কিছুদিন পিতার সাথে অবস্থান করেছিলেন। যখন তিনি পিতার নিকট আসলেন তখন তাঁর পিতা ও চাচা আবদুল মালেকের মধ্যে যুবরাজ নিযুক্তির ব্যাপারে মন-কষাকষি চলছিল।

আবদুল মালেকের ইচ্ছা ছিল যে, আবদুল আজীজ-এর পুত্র ওমর ওয়ালিদের স্বপক্ষে খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করুক। কিন্তু আবদুল আজীজ এতে সম্মত ছিলেন না।

ইবনে কাছীর বলেন, আবদুল মালেক প্রথম প্রথম ইশারা-ইঙ্গিতে তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতেন। তারপর তিনি তার মনোভাব স্পষ্ট উল্লেখ করেই একটি পত্র লিখলেন। আবদুল আজীজ খুব সংক্ষিপ্ত অথচ খুব পরিষ্কার ভাষায়

পত্রের উত্তর দিলেন যে, আপনি ওয়ালিদ সম্পর্কে যে আশা পোষণ করেন, আমি ওমর ইবনে আবদুল আজীজ সম্পর্কেও সেই আশা পোষণ করি।

এতে আবদুল মালেক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে লিখলেন যে, মিশরের সমস্ত রাজস্ব দামেশকে পাঠানো হোক। আবদুল আজীজ যখন থেকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন থেকেই তিনি একজন স্বাধীন শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসন করছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত তিনি মিশরের আমদানীর একটি পয়সাও দামেশকে পাঠাননি। তার কোন হিসাবও দেননি। তদুপরি মিশর ও পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত প্রশাসকগণ সরাসরি আবদুল আজীজের অধীনস্থ ছিল। সমস্ত আমদানীর অর্থ তার নিকট জমা হত, তিনি তাঁর ইচ্ছামত তা ব্যয় করতেন অথবা সরকারী কোষাগারে জমা রাখতেন। আবদুল মালেক অস্বাভাবিক রূপেই এ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। আবদুল আজীজ অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিক্ততা বৃদ্ধি করতে রাজি হননি। কাজেই তিনি এর একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এই–

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ও আপনি জীবনের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছি যে, আমাদের বংশের খুব কম লোকই এর পর জীবিত আছে। আমিও জানি না, আপনি ও জানেন না, আমাদের কে প্রথম মৃত্যু বরণ করবে! যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমার বাকী জীবনের এ সামান্য সময় আমাকে আর তিরস্কার করবেন না।

ইবনে কাছীর বলেন যে, এ সংক্ষিপ্ত চিঠি আবদুল মালেকের অন্তরে ভীষণ রেখাপাত করল। তিনি খুব কাঁদলেন এবং ভাইকে লিখলেন, আমার আল্লাহর কসম! তোমার বাকী জীবনে আমি আর তোমাকে কোন প্রকার তিরস্কার করব না।

আবদুল আজীজ তাঁর ভাইকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা লিখেননি। তিনি সে বছরই ইন্তেকাল করলেন। আবদুল মালেক এজন্যই বেশি অনুতপ্ত হলেন যে, তিনি কেন তাঁর ভাইয়ের যুবরাজের দাবী প্রত্যাহার করতে চাপ দিচ্ছিলেন। ইবনে কাছীর লিখেন, যখন আবদুল মালেক তাঁর ভাই আবদুল আজীজের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেল, তখন ব্যথা-বেদনার পাহাড় যেন তার

উপর ভেঙ্গে পড়ল। তিনি এবং তার পরিবারের সকলেই কেঁদে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। (আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৮ম খণ্ড, ৫৯ পৃ.)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সবসময় আবদুল মালেককে আবদুল আজীজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত, তা না হলে তাঁরা দু' মায়ের সন্তান হলেও তাদের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি ছিল। জীবনের পটভূমিকায় তারা সমানভাবে অংশ নিয়েছিলেন। রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের জন্য উভয়েই সমভাবে কাজ করেছিলেন।

আবদুল আজীজ শত আশা পোষণ করা সত্ত্বেও তার পুত্র ওমরকে রাজসিংহাসনে বসাতে পারেননি। যদি আবদুল আজীজ আরও কিছুদিন জীবিত থাকতেন তবে হয়তো তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে আফ্রিকা অথবা পাশ্চাত্যের কোন দেশের আমীর নিযুক্ত করতেন অথবা তারপর তাঁকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তাঁর জীবন তাঁকে এ সুযোগ দেয়নি। তার পুত্রদের বা ওমরের জন্য কিছু না করেই ৮৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করলেন। অবশ্য তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন।

ইবনে কাছীর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে বলেন– আবদুল আজীজ ধন-সম্পদ, উট-ঘোড়া, গাধা-খচ্চর ইত্যাদি অগণিত সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে শুধু স্বর্ণই ছিল তিন শত মুদ অর্থাৎ আমাদের দেশী হিসেবে ৭৫০ মণ (সাত শত পঞ্চাশ মণ)।

ঐতিহাসিকগণ বলেন– উমাইয়া বংশীয় বাদশাহদের মধ্যে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) ছিলেন সবচেয়ে সম্পদশালী। তিনি খুব উত্তম পোষাক পরিধান করতেন, উন্নত জীবন-যাপন করতেন, উত্তম খাদ্য আহার করতেন, উন্নতমানের বাহনে আরোহন করতেন এবং খুব বেশি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন।

আবদুল আজীজের মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে আবদুল মালেক তার পুত্র আবদুল্লাহকে মিশরের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিলেন, তখন আবদুল্লাহর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। তিনি ৮৬ হিজরীর জমাদিউল উখরায় মিশরে পৌছে শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

তখন সম্ভবত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মিশর থেকে দামেশকে এসেছিলেন। তবে এটা জানা যায়নি যে, তিনি স্বেচ্ছায় দামেশকে এসেছিলেন না, আবদুল মালেক শেষ জীবনে ভাইয়ের প্রতি সৃষ্ট তিক্ততা এড়াবার জন্যই তাঁকে দামেশকে ডেকে এনে তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছিলেন।

ইবনে কাছীর বলেন– তিনি যখন মিশর থেকে দামেশকে গেলেন তখন আবদুল মালেক তাঁকে তাঁর পুত্রদের সাথে অবস্থান করাতেন। তাঁকে তাঁর পুত্রদের চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিতেন। ইবনে কাছীরের ভাষ্যটি এই–

فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْهُ اَخَذَهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَخَلَطَهُ بِوَلَدِهٖ وَقَدَّمَهُ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْهُمْ ـ

অর্থাৎ যখন তাঁর পিতার ইন্তেকাল হল তখন খলীফা আবদুল মালেক তাঁকে দামেশকে আনিয়ে তার পুত্রদের সঙ্গে রাখলেন, এমনকি তাদের অধিকাংশের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

খলীফা আবদুল মালেক তাঁর মর্যাদা উন্নীত করার জন্য প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। উক্ত বিয়েতে তাঁকে প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ উপহার হিসেবে দিলেন এবং বারি বর্ষণের মত দান-খয়রাত করেছিলেন।

ফাতেমা খুবই সৌভাগ্যশালী মহিলা ছিলেন, তিনি একজন বুদ্ধিমতি শাহজাদী ছিলেন। কোন এক কবি তাঁর প্রশংসা করে যে কাব্য রচনা করেছিল, তার একটি অংশ ছিল এই–

بِنْتُ الْخَلِيْفَةِ - وَالْخَلِيْفَةُ جَدُّهَا

اُخْتُ الْخَلَائِفِ - وَالْخَلِيْفَةُ زَوْجُهَا

অর্থাৎ খলীফার কন্যা, খলীফার পোত্রী অনেক খলীফার ভগ্নি এবং তাঁর স্বামীও একজন খলীফা।

ফাতেমার স্বভাব ছিল মধুর ও প্রাণবন্ত। তিনি খুবই স্বামীভক্ত এবং দায়িত্বশীল মহিলা ছিলেন। আবদুল মালেকের মত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলীফার কন্যা হিসেবে তার মনে কোন অহংকার ছিল না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর সাথে তার বিয়ে হওয়ায় তিনি তার ভাগ্য প্রসন্নতার জন্য গর্ব করতেন। সারা বংশে ওমর উমাইয়া ইবনে আবদুল আজীজ (র) সবচেয়ে সুন্দর যুবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য আহত হওয়ার কারণে তিনি চলার সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেন না।

ইবন কাছীর আতাবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন– "যখন ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) নিজ পিতৃব্যের নিকট আসলেন, তখন তার পিতৃব্য জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চলার সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পার না কেন? ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন, আমি গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন অঙ্গে আঘাত পেয়েছিলে? তিনি উত্তরে বললেন, মূত্রাশয় ও পিঠের মধ্যবর্তী স্থানের জোড়ায়।

ইবন কাছীর বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) যে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করলেন, এতে খলীফা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট রূহ ইবনে থাম্বাহকে বললেন, যদি এ প্রশ্নই তোমার বংশের অন্য কাউকে করা হতো তবে এমন রুচিশীল ও মার্জিত উত্তর দিতে পারত না।

ঐতিহাসিকগণ এর কারণ উল্লেখ করেননি যে, খলিফা আবদুল মালেক তাঁর অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি এত দয়ালু ছিলেন না কেন? তবে অনুমিত হয় যে, জনসাধারণ সম-সাময়িক শিক্ষিত আলেম সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং মহৎ চরিত্রের প্রভাবে যেমন প্রভাবান্বিত ছিলেন, আবদুল মালেকও তাদের মতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ইবনে হাকাম এ প্রভাবের কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, যখন আবদুল আজীজ নিজ স্ত্রী উম্মে আসেমের নিকট থেকে তাঁর পুত্র সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র)-এর অভিমত জেনে আবদুল মালেককে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন, তখন থেকেই আবদুল মালেকের অন্তরে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এর ফলেই খলীফা তাঁর জন্য মাসিক এক হাজার দীনার ভাতা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথচ এত

বিপুল পরিমাণ ভাতা আর কোন শাহজাদার জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। এমনকি ওয়ালিদ এবং সুলায়মানও এ পরিমাণ ভাতা পেত না।

(আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৭ম খণ্ড, ১৯৫ পৃ.)

আমাদের বিশ্বাস যে, আবদুল আজীজের চিঠিতে শুধু খলীফার অন্তরে এ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মদীনার গভর্ণরও ওমর ইবনে আবদুল আজীজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার নৈতিক ক্রমোন্নতি সম্পর্কে গোপনে খলীফাকে জানাতেন– যার ফলে খলীফার অন্তর দিন দিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল এবং এ কারণেই আবদুল আজীজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি তার অন্যান্য সন্তানগণকে রেখেই ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)কে দামেশকে ডেকে আনলেন এবং তার নিজের পার্শ্বে অবস্থান করতে দিলেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)ও তাঁর পিতৃব্যের প্রতি গভীর মহব্বত ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইবনে কাছীর বলেন, যখন তাঁর পিতৃব্য খলিফা আবদুল মালেক ইন্তেকাল করলেন, তখন তিনি তাঁর বিয়োগ-ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি এতই ব্যথিত হয়েছিলেন যে, দীর্ঘ সতেরো দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করলেন। (আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫)

আবদুল মালেকের মৃত্যুর পর তার পুত্র ওয়ালীদ খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল মালেক তার প্রতি যেরূপ আচরণ করেছিলেন ওয়ালীদও সেরূপ আচরণই করতে লাগলেন। তিনিও সুলায়মান ব্যতীত অন্যান্য যুবরাজদের উপর তাঁকেই প্রাধান্য দিতেন।

তাঁর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেই ওয়ালীদ তাঁকে হেজাজের গভর্ণর পদে নিয়োগ দান করলেন। খলীফা আবদুল মালেকের মৃত্যুর কিছুদিন পরই তিনি এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

মদীনার শাসনকর্তা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) যে পদ লাভ করেছিলেন, এটা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার পদ ছিল। তিনি মদীনাকে সীমাহীন ভালবাসতেন। যেখানে সরওয়ারে দু'আলম (সা) চিরনিদ্রায় আরাম করছেন, ইসলাম আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যা ইসলামের প্রধান কেন্দ্র ছিল,

হযরত উরুয়া, হযরত ইকরামা, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, হযরত আবু সালমা, হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা এবং হযরত সালেহ ইবন কাইসান (রঃ) প্রমুখ মহামনীষীগণ এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট আলেমগণ অবস্থান করছিলেন, সেই পবিত্র ভূমির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণও ছিল সীমাহীন।

ওয়ালীদ যখন তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করেন তখন তাঁর সন্তুষ্টিতে নিযুক্ত করেছিলেন, না ওয়ালীদ নিজের ইচ্ছায়ই এরূপ করেছিলেন ঐতিহাসিকগণ এদিকে কোন ইঙ্গিত দেননি। তবে এতটুকু সত্য যে, মদীনার শাসনকর্তার পদ লাভ করে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

ইবনুল জাওযির মতে ৮৭ হিজরীতে তিনি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদও এ কথাই বলেন। কিন্তু ইবনে কাছীর তাঁর এ নিযুক্তি ৮৬ হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আবদুল মালেকের মৃত্যুর অব্যাবহিত পরেই তাঁকে মদীনার শাসনকর্তার পদে মনোনীত করা হয়। এ দু'টি মতের ঐক্য এরূপই হতে পারে যে, তিনি ৮৬ হিজরীতে নিযুক্ত হয়েছিলেন সত্য, তবে ৮৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মদীনায় শুভাগমন করেছিলেন।

(ইবনুল জওযি- ৩২, ইবনে সা'দ ৫ম, ২৪৪ পৃ.; ইবনে কাছীর ৮ম খণ্ড, ১৯৪)

এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। যদি বয়সের এ বর্ণনা সঠিক বলে ধরা যায়, তবে তাঁর জন্ম ৬১ হিজরীতেই হয়েছে বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) তাঁর স্ত্রী, সেবক-সেবিকা ও অনুচরগণসহ ৮৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে শাহজাদার বেশেই মদীনায় শুভাগমন করলেন।

ইবনে সাদ বলেন, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই সুন্দর, তিনি সবসময় সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতেন। তাঁর চাল-চলনে নমনীয়তা ছিল। যে দিয়ে চলতেন সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যেত। তিনি এতই মূল্যবান পরিধান করতেন যে, লোকেরা তাঁকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে

থাকত। তার পায়জামার আঁচল পায়ে জড়িয়ে থাকত, তাঁর কুঞ্চিত কেশ তাঁর ললাটদেশে এসে পড়ত।

ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, তাঁর চাল-চলনে আমীরানা এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাব ছিল। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, এ আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ-বিলাস সত্ত্বেও তিনি কখনও হারাম মাল ভক্ষণ করতেন না, পরস্ত্রীর প্রতি কোনদিন ফিরে চাননি এবং কখনও শরীয়ত বিরোধী কোন আদেশ জারী করতেন না।

তিনি যখন মদীনায় এসে শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন মদীনার দশজন বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেমকে একত্রিত করলেন। ইবনুল জাওযির ভাষ্যটি হল–

وَدَعَا عُمَرُ عَشَرَةَ نَفَرًا مِّنْ فُقَهَاءِ الْبَلْدَةِ مِنْهُمْ عُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَالسَّالِمُ فَقَالَ إِنِّى دَعَوْتُكُمْ لِاَمْرٍ تُوجَرُوْنَ فِيْهِ وَتَكُوْنُوْنَ فِيْهِ أَعْوَانًا عَلَى الْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا يَّتَعَدَّى أَوْ بَلَغَكُمْ مِّنْ عَامِلٍ لِّى ظُلَامَةً فَأَخْبِرُوْنِى بِاللّٰهِ وَتُوجَرُوْنَ -

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) শহরের বিশিষ্ট দশজন ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন। তন্মধ্যে উরুয়া, কাসেম এবং সালেমও ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আপনাদেরকে এ উদ্দেশ্যেই কষ্ট দিয়েছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আমার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। যদি আপনারা আমার কোন কর্মচারীকে জুলুম করতে দেখেন অথবা কারো প্রতি জুলুমের সংবাদ পান তবে আপনাদের উপর দায়িত্ব হল যে, সে ব্যাপারে আমাকে জানাবেন। তারা তাঁর এ আবেগ-অনুভূতির প্রশংসা করে সর্বোতোভাবে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেলেন। (ইবনুল জাওযি ৩২)

ইবনুল জাওযি লিখেছেন, যখন ওয়ালীদ ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে মদীনার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি মদীনায় যেতে বিলম্ব করতে লাগলেন। এতে ওয়ালীদ তার প্রধান উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন,

ব্যাপার কি? ওমর তার দায়িত্ব পালন করতে যায় না কেন? প্রধান উজির বললেন, ওমর শর্ত পেশ করেছেন! তারপর ওয়ালীদ ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কি শর্ত আছে? ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, আমার পূর্ববর্তী শাসকগণ জুলুম-অত্যাচার করেছে। তারা অন্যায়-অবিচার করে আমদানী বৃদ্ধি করেছে, আমি জুলুম-অত্যাচার করতে পারব না, আমদানীও বৃদ্ধি করতে পারব না।

(তাবকাতে ইবনে সাদ ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪)

ওয়ালীদ বললেন, আপনি সর্বদাই সত্য-ন্যায় পথ অবলম্বন করবেন। আমার অনুমতি থাকল, যদি এতে আপনি এক পয়সাও কেন্দ্রে পাঠাতে না পারেন তবুও আপনি অন্যায়-অত্যাচার করবেন না।

যখন ওয়ালীদ তাঁর সকল শর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করলেন, তখন তিনি মদীনায় গিয়ে সর্বত্র ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। মদীনা ছাড়া মক্কা এবং তায়েফও তাঁর শাসনাধীন ছিল।

তিনি ন্যায়বিচার ও সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক আবু বকর ইবন হাযমকে তিনি প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করলেন। মক্কা এবং তায়েফেও এ ধরণের ব্যক্তিগণকে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।

কর আদায়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কঠোরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। যেমন মদীনার ফকীহ্গণকে বলা হয়েছিল যে, যেখানেই তাঁরা কোন অন্যায়-অবিচার হতে দেখবেন, তাঁরা তাঁকে জানাবেন, মক্কা, তায়েফ এবং অন্যান্য স্থানের ফকীহগণের নিকট অনুরূপ আবেদন পেশ করা হল।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মদীনার শাসনকর্তা হিসেবে যেরূপ ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও নিষ্ঠার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, যার ফলেই মদীনার সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিদ্বেষী ফকীহ সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) তাঁকে মাহদী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ইবনে সাদ বলেন– একদা কোন এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র)কে জিজ্ঞেস করল যে, মাহ্দীর গুণাবলি কি কি? তিনি বললেন, মারওয়ানের বাসভবনে গিয়ে নিজের চোখে মাহ্দীকে দেখে আস।

(তাবকাতে ইবনে সাদ ৫ম খণ্ড ১৪১ পৃ.)

অতএব এ ব্যক্তি মারওয়ানের বাসভবনে এসে অন্যান্য সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) অনুমতি দিলে তাদের সাথে সেও ভিতরে প্রবেশ করল এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) কে দেখে এসে সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) কে বলল, আমি মারওয়ানের বাসভবনে গিয়েছিলাম কিন্তু মাহদী সম্পর্কে আমাকে কেউ কিছু বলল না এবং কেউ মাহদীর প্রতি ইঙ্গিতও করল না।

তখন সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) বললেন, তুমি কি ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখনি? সে বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন, তিনিই যুগের মাহদী।

আসলেই তিনি মাহদী ছিলেন। সাধারণ মানুষ পরবর্তীতে তা বুঝতে পেরেছিল। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) মদীনার সেই সমস্ত আলেমদের অন্যতম ব্যক্তি, যিনি কোন শ্রেষ্ঠ বা কোন সীমাহীন জালেম নরপতির সামনে মাথা নত করেননি। তিনি ওয়ালীদের মত খলিফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে পছন্দ করেননি। তিনি ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি ছিলেন শরীয়তের জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র। তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র)কে সম্মান করতেন।

ইবনে হাকাম বলেন, একবার ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য মসজিদের নিকট এসে তার দূতকে হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবের নিকট প্রেরণ করলেন। দূত ভুল করে হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবকে (র) বলল, আমীর! আপনাকে স্মরণ করেছেন। অথচ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) কোন আমীর বা বাদশাহর ডাকে কোনদিনই সাড়া দেননি। এবারের আহ্বানকারী যেহেতু ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাই সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) উঠে দাঁড়ালেন এবং সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁকে উঠতে দেখেই দৌড়িয়ে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদের পিতা! আমি আপনার নিকট যাচ্ছি, আপনি কি স্বস্থানে ফিরে যাবেন না? আমার দূত আপনার নিকট হাজির হয়েছিল আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে। আমি আপনাকে ডেকে নিতে তাকে আপনার নিকট পাঠাইনি। সে ভুল করেছে। আমি শুধু জিজ্ঞেস করার জন্যই তাকে পাঠিয়েছিলাম।

ইবনে আবদুল হাকাম ফকীহ্ সায়ীদ ইবন মুসায়্যাবের কঠোর স্বভাবের কথা আলোচনা করে বলেছেন, একদিন রাত্রে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র)-এর বৈঠকের পার্শ্বেই নামায পড়ছিলেন। তিনি খুব জোরে কিরাত পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে জোরে জোরে কিরাত পড়ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) তাঁকে জোরে কিরাত পাঠ করতে শুনে তার খাদেম বারাদকে বললেন, হে বারাদ! এ লোকের কিরাত আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, একে সরিয়ে দাও না! গোলাম বারাদ কিরাত পাঠকারীর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল, কাজেই তাঁকে সরানোর চেষ্টা করল না। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কিরাত পড়তেই লাগলেন। পুনরায় হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমি না তোমাকে এই ক্বারীকে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম! বারাদ উত্তরে বলল, হুজুর! মসজিদ শুধু আমাদের জন্যই নয়।

বারাদ নেহায়েত সত্য কথাই বলেছিল, মসজিদ শুধু তাঁর একার জন্য ছিল না। সমস্ত মুসলমানের জন্যই। হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ (র) একথা শুনে নিজেই মসজিদের শেষ প্রান্তে চলে গেলেন।

(ইবনুল হাকাম ২২ পৃ).

তিনি নবী করীম (সা)-এর মসজিদের সীমাহীন সম্মান করতেন। তিনি যখন কোন রাত্রে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন, তখন তাঁর কোন স্ত্রী বা বাঁদীকে মসজিদে আসার অনুমতি দিতেন না। কারণ এতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) যতদিন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, ততদিন খলিফা ওয়ালীদকে এবং তারপর সুলায়মানকেও মদীনা কিংবা তাঁর শাসনাধীন কোন অঞ্চলে কোন নির্যাতনমূলক আদেশ জারী করতে দেননি।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল হাকাম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন– একবার সুলায়মান হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলেন। ওমর ইবন আবদুল আজিজও তাঁর সাথে ছিলেন। রাত্রে তিনি তার বাহনেই শয়ন করেছিলেন। তাঁর বাহন কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, এমন সময় সেখান থেকে খুব গোলমালের শব্দ শুনা গেল। এ গোলমালের শব্দে সুলায়মানের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটল। তিনি উঠে বসলেন এবং লোক

পাঠিয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন যে, এরা কুষ্ঠ রোগী। তখন রাগান্বিত হয়ে তাদের এ বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

এ নির্যাতনমূলক নির্দেশের কথা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ জানতে পেরে আদেশ কার্যকরী দলকে বাঁধা দিলেন এবং তিনি সুলায়মানের নিকট গিয়ে এরূপ নির্যাতনমূলক আদেশ থেকে বিরত করলেন এবং তাদের বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে এস্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে অনুমতি গ্রহণ করলেন।

ওমর ইবনে আবুল আজিজ ব্যক্তিগতভাবেই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে পছন্দ করতেন না। একবার হাজ্জাজ খলীফা ওয়ালীদের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করলেন যে, তিনি হজ্জ করতে মক্কায় গিয়ে হজ্জ শেষে মদীনা যাবেন তারপর প্রত্যাবর্তন করবেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ হাজ্জাজের এ অভিপ্রায় জানতে পেরে ওয়ালীদকে লিখলেন, হাজ্জাজ এ স্থান হয়ে অতিক্রম করুক, এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। ওয়ালীদ এ চিঠি পেয়েই হাজ্জাজকে লিখলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তোমার মদীনা হয়ে যাতায়াত করা পছন্দ করেন না, কাজেই তোমার উচিত এ দিক দিয়ে অতিক্রম না করা। (ইবন আবদুল হাকাম, ১১–১৩; ইবন কাছীর ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ দীর্ঘ ছয় বছর মদীনার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে তাঁর কোন কর্মচারী কোন প্রজাকেই জুলুম করতে সাহস পায়নি। যদিও ঐতিহাসিকগণ তাঁর মদীনার শাসনামলের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেননি, তবুও ইবন কাছীর বলেন, এ সময় সামাজিক সৌহার্দ ও প্রজাদের সাথে কর্মচারীদের আচরণের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে পরিচিত ছিল। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত তিনি মদীনার বিশিষ্ট দশজন ফকীহকে ডেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোন সমস্যারই সমাধান করতেন না।

এ সমস্ত মনীষীগণ ছিলেন, হযরত উরুয়া, হযরত উবায়দুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ, হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, হযরত আবু বকর ইবনে সুলায়মান, হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত খায়েজা ইবন যায়েদ (র)।

আয-যাহরী তাযকেরাতুল হুফফাযে এবং সাদ তাবকাতের ৫ম খণ্ডে এ সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা ছিলেন মদীনার সবচেয়ে বড় ও বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ধারক ও বাহক।

ইবনে কাছীর এ দশজন ছাড়া হযরত সায়দ ইবনে মুসায়্যাবের (র) কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি হযরত সায়দ ইবনে মুসায়্যাব (র)-এর কোন সিদ্ধান্তই অমান্য করতেন না। হযরত সায়দ ইবনে মুসায়্যাবও এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলেম ছিলেন যে, তিনি কোন খলীফার দরবারেই গমন করতেন না। কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনিও তাঁর নিকট গমন করতেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ব্যক্তি শাসনের অভিযোগকারী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের চিন্তা করা উচিত যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) খলীফা ছিলেন না। তিনি মাত্র একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের সেরা দশজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশকে اَلشُّورٰى بَيْنَهُمْ। (পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ কর) বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই নয় কি? আধুনিক গণতন্ত্র এর চেয়েও উন্নত মানের পরামর্শ সভার আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছে কি?

মদীনায় ছয় বছরের শাসনামলে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) সত্য-ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন।

মক্কা-মদীনার আশেপাশে কূপ খনন করে জনসাধারণের পানির অভাব দূর করেছিলেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন বাগানটিতে একটি ঝর্ণা ও একটি হাউজ নির্মাণ করে আগতদের পানির অভাব পূরণ করেছিলেন। তিনি হেজাজের রাস্তাঘাট সংস্কার করেছিলেন, বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা এবং তায়েফের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তাসমূহের সংস্কার সাধন করে পর্যটনের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি। এ বিরাট কীর্তি তিনি মদীনায় শুভাগমন করার এক বছর পর অর্থাৎ ৮৮ হিজরীর সফর মাসে শুরু করেন। (মুয়াজ্বামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা; বালাযুরী ৭৬; মকাদ্দাসী ৪৭৭; ইবনে সাদ ২য় খণ্ড)

ঐতিহাসিকগণ খলিফা ওয়ালীদকে মসজিদের নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন, তা যথার্থই করেছেন। খলিফা ওয়ালীদ এ হিসেবেই এর নির্মাতা যেহেতু, তিনি এ মহান কর্মকাণ্ডের জন্য বিপুল সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য গাড়ী বোঝাই করে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

সিরিয়া, মিশর ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নতমানের প্রকৌশলী এনে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। যেখানেই উত্তম পাথর পাওয়া গিয়েছে সেখান থেকেই মর্মর, রুখাম ও মূসা পাথর গাড়ী বোঝাই করে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন।

যখন মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু হল তখন মনে হল মসজিদে নববী নয়, সমগ্র মদীনাই যেন পুনঃনির্মিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা মদীনার পুনঃনির্মাণ ছিল না, এটা ছিল প্রেম-প্রীতির দুনিয়ার নব নির্মাণ।

ইবনে সাদ বলেন– ওয়ালীদ ও ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এজন্যই যে, তখন মুসলমানদের সংখ্যা অগণিত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নামাযের সময় মসজিদে স্থান সংকুলান হতো না। যদিও হযরত উমর ফারুক (রা) ও হযরত ওসমান (রা) নিজ নিজ যুগে মসজিদে নববীকে বিশেষভাবে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেছিলেন, তবুও মসজিদে নামাযীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, মসজিদের বাইরের মহল্লায়ও মুসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়তে হত।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) এ অবস্থায় মুসল্লীদের দুদর্শার কথা খলিফা ওয়ালীদকে জানালে ওয়ালীদ এই মহান কাজ সম্পাদন করে এক অমর গৌরবের অধিকারী হলেন।

মসজিদে নববী পূননির্মাণের প্রেরণা দানকারী ওমরই হোক অথবা ওয়ালীদ নিজে নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকুক, মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণের

কাজ শুরু হলে শুধু মদীনায়ই নয়, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা, মক্কা এবং আরও বহু দূর-দূরান্ত থেকে দর্শকগণ এসে মদীনায় ভীড় জমাচ্ছিল। তখন মসজিদে নববী প্রদর্শনীর রূপ ধারণ করেছিল।

পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হল, তার সাথে সাথে খড়-কুটা ও খেজুর পত্র দ্বারা নির্মিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মীনীদের (রা) পবিত্র হুজরাসমূহও ভেঙ্গে দেয়া হল।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ যার নিকট থেকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, বর্ণনাকারী অশ্রুসিক্ত নয়নে বলছিল, আফসোস! যদি ঐ পবিত্র হুজরাসমূহ ভেঙ্গে না দেয়া হত, তবে আগত দিনের মুসলমানগণ দেখতে পারত, তাদের নবী (সা) কিভাবে জীবনযাপন করতেন, উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ কেমন হুজরায় বসবাস করতেন।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড)

বাস্তবিকই এ সমস্ত হুজরাসমূহ দর্শনীয় স্মৃতিই ছিল। হুজরার দেওয়াল, ছাদ এবং তাঁদের শয্যা আগত দিনের মুসলমানদের চোখের মনি হিসেবেই বিবেচিত হতো। কিন্তু এ খড়-কুটায় নির্মিত হুজরাসমূহ আজীবন রক্ষা করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তার অধিকাংশগুলিই ভেঙ্গে গিয়েছিল, দেওয়ালে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল, ছাদ ঝুলে পড়েছিল। তা না হলে দশজন বিশিষ্ট ফকীহ্ যাঁদের মধ্যে হযরত সায়দ ইবনে মুসাইয়্যাব, হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, হযরত ইবনে হাজম, হযরত সালেম এবং হযরত উরুয়া (র)-এর মত নবী প্রেমিকগণ কখনও এ সমস্ত পবিত্র হুজরা ভাঙ্গার সম্মতি দিতেন না। এমনকি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকটও এ খড়-কুটা ও মাটির নির্মিত পবিত্র মসজিদ এবং হুজরাসমূহ অত্যন্ত পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় ছিল। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুণসম্পন্ন মহামানব জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর অনুসারীগণ। তিনি কখনও এসব ভাঙ্গতে সাহস করতেন না। এ মসজিদও এসব হুজরা যখন ভাঙ্গা হয় তখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কেঁদেছিলেন, সায়দ ইবনে মুসাওয়াবের দু' চোখেও অশ্রু বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল।

কেবল উম্মাহাতুল মুমিনীনদের হুজরা সমূহই অত্র মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, বরং আশপাশের সমস্ত ঘর-বাড়ীও ক্রয় করে মসজিদ বৃদ্ধির কাজে শামিল করা হল।

যখন সমস্ত বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দিয়ে মসজিদের ভিত্তি তৈরি শুরু হল, তখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ যে দশজন বিশিষ্ট ফকীহদের পরামর্শক্রমে এ সমস্ত কাজ করতেন, সে ফকীহগণকে ডেকে এনে তাঁদের দ্বারা এ পবিত্র মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালেন। কারণ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের দৃষ্টিতে সম-সাময়িক যুগে এ দশজন ব্যক্তির চেয়ে শ্রদ্ধেয় সম্মানিত আর কেউ ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে খলীফা ওয়ালীদ এবং খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সুলায়মানও তাঁদের তুলনায় অতি নগণ্য ছিলেন।

এ সমস্ত সম্মানিত মনীষীগণ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৮০ জন প্রকৌশলী তাদের অধীনস্থ বহু রাজমিস্ত্রী সমন্বয়ে মসজিদের দেওয়াল উঠাতে শুরু করলেন। এ সমস্ত প্রকৌশলীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক রোমীয় ও মিশরীয় ছিল। তাবারী এ প্রকৌশলীদের সংখ্যা বলেছিলেন ৮০ জন বা একশত জন।

আল্লামা মুকাদ্দাসী (র) বলেন– এরা অত্যন্ত উচ্চস্তরের প্রকৌশলী ছিলেন, রোম সম্রাট তাদেরকে মিসকাল (এক মেসকাল সমান সাড়ে চার আনা পরিমাণ ওজন) স্বর্ণ এবং চল্লিশ গাড়ি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পাথরও সরবরাহ করেছিলেন। (মুয়াজ্জমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

দীর্ঘ তিন বছর ব্যাপী এ সমস্ত রোমীয় ও মিশরীয় প্রকৌশলীগণ মসজিদ নির্মাণের কাজে লিপ্ত ছিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদেরকে মুক্ত হস্তে রাজকীয় পুরস্কার দিয়েছিলেন। বিশেষতঃ দশজন বিশিষ্ট প্রকৌশলী তিন বছরে এক লক্ষ আশি হাজার দীনার মজুরী পেয়েছিলেন। দেয়ালের ভিত্তিতেও পাথর বসান হয়েছিল এবং স্তম্ভ সমূহ পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ইয়াকুতের ভাষ্যটি হলো– দেওয়াল ও ভিত্তি পাথরের নির্মিত ছিল এবং স্তম্ভসমূহও পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর দেওয়াল গাত্রে এবং স্তম্ভসমূহে যে সমস্ত উপাদান কারুকার্য খচিত হয়েছিল তাতেও বেশ কয়েক মণ স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। (মুয়াজ্জমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

মসজিদে নববী পূণনির্মাণে যে সমস্ত বিচিত্র রঙ্গের পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল, তা স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল এবং এতই মূল্যবান ছিল যে, কেবলামুখী গম্বুজ সংলগ্ন দোহারী ছাদটির মূল্য ছিল চল্লিশ হাজার আশরাফী। (খুলাছাতুল ওফা, ১৪০ পৃষ্ঠা)

দীর্ঘ তিন বছর ব্যাপী ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) এ মসজিদ নির্মাণ কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি সারা দিন সাধারণ মজুরদের মতই পাথর ও অন্যান্য উপকরণ ধৌত করে এ পবিত্র মসজিদ নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ তিন বছরে মসজিদ নির্মাণ কার্য শেষ হল।

ইয়াকুতের বর্ণনা মতে– মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল দু'শত গজ এবং প্রস্থও ছিল দু'শত গজ। সামনের দিক পূর্ণ দু' শত গজ ছিল এবং পিছনের দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ২ শত ৮০ গজ। (মুয়াজ্জমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

মধ্যবর্তী মেহরাবের কারুকাজ করতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম হয়েছিল। মসজিদে চারটি মেহরাব তৈরী করা হয়েছিল এবং একটি উন্নত ধরণের হাউজ ও একটি ঝর্ণা তৈরী করা হয়েছিল।

কলকশান্দি বলেন– মধ্যবর্তী মেহরাবটির অভ্যন্তর ভাগ খোলা ছিল। সমস্ত স্তম্ভই মর্মর ও রোখাম পাথর দিয়ে নির্মিত ছিল। রোখামই সবচেয়ে মূল্যবান পাথর। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ওয়ালীদের নির্দেশেই এ সমস্ত পাথর মাদায়েন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিছু পাথর রোম সম্রাট উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট কিছু মিশর ও আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। (কলকশান্তি, ৩য় খণ্ড)

এ দীর্ঘ সময় ওয়ালীদ মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে খুব অধীর ছিলেন এবং তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের গাড়ী বোঝাই করে পাঠাতেন আর উমর ইবনে আবদুল আজিজকে এ পবিত্র কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করতে নির্দেশ দিতেন। খুলাছাতুল ওফার বর্ণনা মতে, মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হলে ওয়ালীদ মদীনায় এসে মসজিদ দেখে খুবই আনন্দিত হলেন।

আবুল মুহসিন, বালাযুরী ও মাসুদীর বর্ণনা মতে, মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ৮৮ হিজরীতে; কিন্তু ইয়াকুতীর মতে ৮৭ হিজরীর সফর মাসে

শুরু হয়ে ৮৯ হিজরীতে শেষ হয়েছিল। আর অন্যান্যদের নিকট এটা শেষ হয়েছিল ৯১ হিজরীতে। (বালাযুরী, ৭৬ পৃষ্ঠা; মুকাদ্দাসী, ১২; মাসুদী, ৫ম খণ্ড)

যা হোক, ওয়ালীদ ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) উভয়েই এ মহান কাজের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁরা এতই শান-শওকতের সাথে এ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেছিলেন যে, এটা সম-সাময়িক যুগের বৃহত্তম প্রাসাদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। যদিও ইসলাম অনাড়ম্বরপ্রিয়, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাসাদে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার করা অপব্যয় বলে গণ্য হয়, কিন্তু ওয়ালীদের ব্যক্তিগত ধন ভাণ্ডারে যে সম্পদ জমা হয়েছিল, তা ব্যয় করার জন্য এর চেয়ে আর কোন উত্তম স্থান ছিল না। ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মত বিচক্ষণ এবং ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল একজন শাসনকর্তা এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদকে এরূপে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজে ব্যয় করেই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। যদি জনগণের ধন-ভাণ্ডারের হেফাযতের দায়িত্ব তাকে দেয়া হতো তবে তিনি কখনও তা থেকে এতে এভাবে ব্যয় করতেন না।

মসজিদ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর মাত্র দু' বছর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) মদীনার শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন। ইবনুল জাওযী বলেন- ৯৩ হিজরীতে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই শাসনকর্তার পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইবনে কাছীর বলেন যে, হাজ্জাজের প্ররোচনায় ওয়ালীদ তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। কারণ যা হোক, এ সৌভাগ্য ও সম্মানিত পদ হারিয়ে তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি যখন মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি মদীনার প্রতি অশ্রুসিক্ত নয়নে বারবার ফিলে তাকাচ্ছিলেন এবং ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন–

يَا مُزَاحِمُ نَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِيْنَةِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ تَنْفِىْ خَبْثَهَا - كَمَا يَنْفِىْ نَيْفِى الْكِيْرِ خَبْثُ الْحَدِيْدِ - وَيَبْقٰى طِيْبَهَا

অর্থাৎ হে মুজাহিম, আমার আশংকা হয় যে, আমরাও মদীনার রোষে পতিত হব। মদীনা তার অন্যায়কে দূর করে দেয়, যেমন রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয় এবং পরিচ্ছন্ন খাঁটি লোহা অবশিষ্ট থাকে। (ইবনুল জাওযি)

ইবনে কাছীর বলেন যে, আব্দুল মালেক ও তার বংশধরগণ হাজ্জাজের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। আব্দুল মালেক হাজ্জাজকে তার পিতার খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করতেন এবং মৃত্যুর সময় খলিফা মালেক ওয়ালীদকে হাজ্জাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও পূর্ববৎ সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেছিলেন। খলিফা ওয়ালীদও হাজ্জাজের মর্যাদা বুঝতেন। তদুপরি হাজ্জাজ-ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সম্পর্কে ওয়ালীদকে যে বিষয়ে অবগত করেছিল তাও ভুল ছিল না। হাজ্জাজ লিখেছিল, ইরাকের বিচ্ছিন্নতাবাদীগণ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে মদীনা ও তায়েফে আশ্রয় নিয়েছে। এ অবস্থা চলতে দিলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। (ইবনুল জাওযি–৩৫)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) অত্যন্ত দয়ালু লোক ছিলেন। তা ছাড়া হাজ্জাজ যাদেরকে দুস্কৃতিকারী বলে মনে করত তারা তাঁর দৃষ্টিতে নির্যাতিত বলেই বিবেচিত হত। তাঁরা যখন তাঁর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করত তখন তিনি তাদেরকে আশ্রয় দেয়া নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আশ্রয় দিতেন।

হাজ্জাজ ওয়ালীদের নিকট এ অভিযোগ করে দৃঢ়তার সাথে বলল, যদি দুষ্কৃতিকারীগণ এভাবে পালিয়ে গিয়ে হেজাজে আশ্রয় নিতে থাকে তবে সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। ওয়ালীদের নিকট ওমর ইবনে আবদুল আজিজের চেয়ে রাজত্ব ও রাজ সিংহাসন অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ধারণায় এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে এ সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ করে নিরবিচ্ছন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে? হাজ্জাজ তার বন্ধুদের মধ্যে দু'জনের পক্ষে সুপারিশ করল। অতএব ওয়ালীদ তাদের একজনকে মদীনা ও অপরজনকে মক্কার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে দামেশকে ফিরিয়ে নিলেন।

ইবনে কাছীর হাজ্জাজের এ অভিযোগকে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ হাজ্জাজের নির্যাতন-নিপীড়ন সম্পর্কে ওয়ালিদের নিকট অভিযোগ করেছিলেন।

ইবনে কাছীর খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ পদচ্যুত হয়েছিলেন।

ইবনুল জওযি তাঁর পদত্যাগের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাও উল্লেখ করা হলো। ইবনুল জাওযি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের (রা) পুত্র খুবাইব মদীনাতেই বসবাস করতেন। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, আবুল আছের বংশধরগণ যখন ত্রিশ জনে পৌছবে, তখন তারা আল্লাহর বান্দাগণকে দাসে পরিণত করবে এবং আল্লাহর সম্পদ লুট করবে।

এ হাদীছ মুখে মুখে প্রচার হয়ে ওয়ালিদের কানেও গিয়ে পৌছল। তাঁর মতে এটা ছিল খুবাইবের মনগড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি একটি মিথ্যা অপবাদ। কাজেই তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে লিখলেন যে, খুবাইবকে এই অপরাধে একশত বেত্রাঘাত কর। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁকে ডেকে এনে বেত্রাঘাত করতে নির্দেশ প্রদান করলেন। খুবাইব খুব দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, জল্লাদ খুব নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেছিল। তারপর যখন তাঁকে ফিরিয়ে নেয়া হল, তখন বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় তিনি মারা গেলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেয়ে শোকে-দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন এবং গভর্ণর পদ ত্যাগ করলেন।

তবে তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কিত দু'টি ঘটনাই যথাসম্ভব সত্য। কারণ খুবাইবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ পদত্যাগ করে ওয়ালিদকে লিখেছেন, কিন্তু এ পদত্যাগ পত্র ওয়ালিদের নিকট পৌছার পূর্বেই তিনি হাজ্জাজের পত্রে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করে আদেশ জারী করেছেন।

তিনি পদচ্যুত হয়ে থাকুন অথবা পদত্যাগ করেই থাকুন, তিনি যখন মদীনা হতে দামেশকের পথে যাত্রা করলেন তখন রাত্র ছিল এবং জেনে বুঝেই তিনি রাত্রের সফর অবলম্বন করেছিলেন।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঘটনাক্রমে সে রাত্রেই চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সেবক মুজাহিম এ অবস্থা লক্ষ্য করে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) কে বললেন–

اَلَا تَنْظُرُ اِلَى الْقَمَرِ مَا اَحْسَنَ اِسْتِوَاءً فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ -

অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করে দেখছেন কি? আজ রাতের সাথে কি সুন্দর মিল রয়েছে?

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) চন্দ্রের প্রতি তাকিয়ে মুজাহিমকে বললেন, আমি তোমার কথার অর্থ বুঝেছি। তবে মনে রেখ, আমাদের যাত্রার উপর চন্দ্র-সূর্যের কোন প্রভাব পড়বে না, হ্যাঁ একমাত্র পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর ফায়সালা।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) পদত্যাগ করলে মক্কা-মদীনা ও তায়েফবাসীগণ যে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হল, কোন ঐতিহাসিকই তার বর্ণনা দেননি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)-এর পদত্যাগে মদীনার ফকীহগণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ছিলেন। কারণ তাঁদের মাহদী এবং তাদের প্রিয় শাসক মদীনা হতে বহিস্কৃত হলেন এ দুঃখে তাঁরা অধীর হয়ে পড়লেন। বিশেষতঃ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। কারণ তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের দ্বারাই ওয়ালিদের ক্রোধ হতে মুক্তি পেয়েছিলেন।

ইবনে কাছীর বলেন, আব্দুল মালেক এবং তারপর ওয়ালিদ উভয়ই সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র)-এর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতেন। কারণ, সায়ীদের একটি কন্যা সমসাময়িক যুগে সব চেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিত ও ভদ্র বলে খ্যাত ছিল। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞানেও সে ছিল পারদর্শী। তার এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে আব্দুল মালেক তার পুত্র ওয়ালিদের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) তাঁর এই প্রস্তাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ফলে আবদুল মালেক রাগান্বিত হয়ে মদীনার শাসনকর্তাকে লিখলেন যে, সাঈদকে বেত্রাঘাত কর। কাজেই তাকে বেত্রাঘাত করা হল।

যখন আবদুল আজীজ মারা গেলেন, তখন আবদুল মালেক তার পুত্র ওয়ালিদের খেলাফতের পক্ষে জনসাধারণের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করলেন। মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা হিশাম ইবনে ইসমাঈল তাঁর অনুসরণ করলেন, কিন্তু হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) ওয়ালীদের

খেলাফতের বায়আত করতে অস্বীকার করলেন। যার কারণে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হল এবং চরমভাবে অপমানিত করে সমস্ত মদীনায় ঘুরান হল।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজের দ্বারাই তাঁর প্রতি এ সমস্ত নিপীড়নমূলক আচরণ বন্ধ হয়েছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) সায়দ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) কে খুব শ্রদ্ধা করতেন, তিনি তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ প্রদান করতেন না। কারণ হযরত সায়দ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) সম-সাময়িক যুগে মদীনার সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেম ও সাধক ছিলেন।

ইবনে কাছীরের ভাষ্যটি হলো–

كَانَ مِنْ اَزْهَدِ النَّاسِ فِىْ فُضُوْلِ الدُّنْيَا وَالْكَلَامِ لَايَعْنِىْ وَمِنْ اَكْثَرِ النَّاسِ اَدَبًا فِى الْحَدِيْثِ-

অর্থাৎ অনর্থক কথা ও কাজে তিনি বেশি সংযত ছিলেন এবং হাদীসের বেলায় তিনি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ইবনে কাছীর বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন হযরত সায়দ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর মঙ্গলের জন্য দু' হাত উঠিয়ে মহান আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন।

অন্তর্বর্তীকাল

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের জীবনের দীর্ঘ ছয়টি বছর অর্থাৎ ৯৩ হিজরী থেকে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল– ঐতিহাসিকগণ তার কোন বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

ইবনে কাছীর এ সম্পর্কে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন–

ثُمَّ قَدِمَ دِمِشْقَ عَلٰى بَنِىْ عَمِّهٖ

অর্থাৎ তারপর তিনি দামেশকে তাঁর চাচাত ভাইদের নিকট চলে গেলেন।

এ বাক্যের সাথে সাথেই ইবনে কাছীর যহরীর বর্ণনার একটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, যার প্রবক্তা স্বয়ং ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র)।

"একদিন দ্বিপ্রহরের সময় ওয়ালীদ আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি তাঁর নিকট এসে দেখলাম যে, তিনি খুবই অস্থির। তিনি আমাকে বসতে বললেন, আমি বসলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি খলীফাগণকে গালি দেয় তাকে হত্যা করা যাবে? এতে আমি নীরব রইলাম। তিনি সে কথাই আবার বললেন। তখনও আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনি তৃতীয় বারেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি হত্যাও করছে? ওয়ালীদ বললেন, না, সে শুধু গালি দিয়েছে। আমি বললাম, তবে তাকেও অনুরূপ গালি দেয়া হোক। এতে ওয়ালিদ অসন্তুষ্ট হয়ে তার পরিবার-পরিজনের নিকট চলে গেলেন।

ইবনুল জাওযিও এ জাতীয় একটি ঘটনা সুলায়মানের যুগে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সুলায়মানের যুগে এক ব্যাক্তি খলীফাগণকে গালি দিয়েছিল। সুলায়মান হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, তুমিও তাঁকে গালি দাও। সুলায়মান বললেন, সে আমার বাপ দাদাকে গালি দিয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আজিজ বললেন, তুমিও তার বাপদাদাকে গালি দাও। কিন্তু সুলায়মান তাঁর কথা রক্ষা না করে সে ব্যক্তিকে হত্যা করে।

ইবনুল জাওযি আরও বলেন, এ সময় সুলায়মানের পুত্র, খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী আয়্যুবও সেখানে ছিল। সে একে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতা জ্ঞান করে তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগল। সুলায়মান পুত্রকে তিরস্কার করে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এ সমস্ত ঘটনা ব্যতীত ঐতিহাসিকগণ আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীদ ও সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তারা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে ডেকে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তবে তারা কোন কোন সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন আবার কোন কোন সময় তারা তাঁর মতামত অগ্রাহ্যও করতেন।

কোন জটিল-সমস্যা হলে ওয়ালীদ তাঁর খাদেমগণকে নির্দেশ দিতেন যে, সেই সৎ লোকটিকে ডেকে আন। তারাও ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে সৎলোক বলেই বিশ্বাস করত। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন। এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে যা ঠিক তিনি সে পরামর্শই দিতেন। পরিণাম কি হবে জিজ্ঞাসাকারী খুশি হবে না অখুশি হবে, তিনি তার ভয় করতেন না।

উদাহরণ স্বরূপ ইবনে আব্দুল হাকামের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, একদা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের সাথে তার কোন বোনের উত্তারিধকার সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সুলায়মান বললেন এ সম্পর্কে খলীফা আব্দুল মালেকের একটি দলীল আছে। তাতে তিনি তাদেরকে মিরাছ হতে বঞ্চিত করেছেন এবং তিনি তাঁর পুত্রকে সেই দলীল আনতে নির্দেশ দিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ উপহাস করে বললেন, খলিফা কি কুরআন পাক আনতে নির্দেশ দিলেন? ওয়ালিদের পুত্র আয়্যূব একে অভদ্রতা জ্ঞান করে ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে বলল, এ কথাটিই একটি লোককে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, তুমি যখন খলীফা হবে তখন এরূপই করিও। এতে সুলায়মান পুত্রকে তিরস্কার করলেন এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

ইবনুল জাওযি বলেন, কোন কোন সময় খলীফাগণ তাঁর কথা মেনেও নিতেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, একবার এক সফরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সুলায়মানের সাথে ছিলেন। তাঁদের সাথে সামরিক বাহিনীর কিছু লোকও ছিল। সুলায়মান কিছু লোককে গান গেতে শুনে তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে নপুংসক করে দিতে নির্দেশ দিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রতিবাদ করে বললেন, এটা শরীয়ত বিরোধী একটি নির্দেশ। তাদেরকে ছেড়ে দাও। সুলায়মান তাঁর কথা মেনে নিলেন।

এরূপ এক সফরে তিনি সুলায়মানের সাথে ছিলেন, এমন সময় খুব ঝড় শুরু হলো ও বিদ্যুৎসহ বজ্রপাত হতে লাগল। সুলায়মান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার বাহনের উপর জড়সড় হয়ে বসেছিলেন এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে ডাকছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এটা দেখে

হাসতে লাগলেন। সুলায়মান অভিমান করে বললেন, আমরা ভয়ে মরি আর আপনি হাসেন! ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, এটা আল্লাহর রহমত, রহমত দেখে আনন্দ করা উচিত। কাঁদতে হয় আল্লাহর আযাব দেখে। একদিন সুলায়মান দেখলেন, বহুলোকের সমাগম হয়েছে। তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সমস্ত লোক কি চায়? হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, এরা তোমারই নিকট অভিযোগ করতে এসেছে। সুলায়মান বললেন, এ এক লাখ টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। ওমর বললেন, এর চেয়েও ভাল হবে যে, তুমি তাদের অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার বিধান কর। অতএব সুলায়মান ওমরের কথা মত তাদের অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করলেন।

একবার সুলায়মান ও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মধ্যে একটি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)-এর কোন গোলাম সুলায়মানের কোন এক গোলামকে খুব মারপিট করল। উক্ত গোলাম সুলায়মানের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করল যে, এতে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খুব খুশি হয়েছেন। তারপর ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আসলে সুলায়মান তার নিকট এ অভিযোগ করলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি বললেন, তোমার বলার পূর্বে আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। সুলায়মান ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আপনি মিথ্যাবাদী। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন,

تَقُوْلُ كَذِبْتَ وَمَا كَذِبْتُ مُنْذُ شَدَدْتُ عَلٰى اِزَارِىْ وَاِنَّ فِى الْاَرْضِ عَنْ مَجْلِسِكَ هٰذَا لَسِعَةً۔

অর্থাৎ তুমি বল, আমি মিথ্যাবাদী, অথচ আমি যখন হতে কাপড় পরিধান করি, তখন হতে কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহর পৃথিবী তোমার মজলিস হতে অনেক প্রশস্ত। এ কথা বলে সুলায়মানের মজলিস হতে বের হয়ে আসলেন এবং বাড়ীতে এসেই তিনি মিশরে যেতে প্রস্তুত হলেন। সুলায়মান এটা জানতে পেরে খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং লোক পাঠিয়ে ওমরের নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনলেন। যখন ওমর

ইবনে আবদুল আজিজ তার নিকট আসলেন তখন তিনি বললেন, আপনি মিশর যাত্রা করে আমাকে যেরূপ বিব্রত করছেন এরূপ আর কখনও হয়নি।

ঐতিহাসিকগণ বিশেষতঃ ইবনে আব্দুল হাকাম, ইবনুল জাওযি এবং ইবনে কাছীর তার সত্যবাদীতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং ৯৩ হিজরী হতে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর দামেশকে অতিবাহিত করেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযি এটাও বলেছেন যে, একদিন সুলায়মান কোন এক জনপদে গিয়েছিলেন। তার কাফেলা ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হল। তখন সুলায়মান চিৎকার করে বলেছিলেন, হে ওমর! হে ওমর!

বনু উমাইয়্যার লোকদের সাধারণ রীতি ছিল যখন তাদের কেউ কোন বিপদে পতিত হত তখনই ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে ডাকত এবং তিনিও এইত আমি আসছি" বলে তার ডাকে সাড়া দিতেন।

ইবনুল জাওযির অপর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, শুধু বনু উমাইয়্যার খলীফাগণই নয় বরং সাধারণ লোকেরাও বিপদাপদে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সাহায্য প্রার্থী হত।

৯৩ হিজরী হতে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত বনু উমাইয়া এবং বনু উমাইয়ার খলীফাগণ বিশেষতঃ ওয়ালীদ ও সুলায়মান সকল প্রকার দুঃখ-শোকে, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পরামর্শ চাইতেন, আর তিনিও পরম বিশ্বস্ততার সাথে তাদেরকে উত্তম পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন।

খেলাফতের উত্তরাধিকার লাভ

সুলায়মানের চরিত্রে যদিও দোষ-ত্রুটির কোন সীমা ছিল না, তবুও তাঁর মহত্ব ছিল যে, তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। সাধারণত তিনি তাকে সঙ্গে করেই সফর করতেন এবং অধিকাংশ ব্যাপারেই তিনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইতোপূর্বে আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও সুলায়মানের প্রিয় পুত্র আয়্যুবের মধ্যে বির্তক এবং সুলায়মান ও ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কিত তিনটি ঘটনা বর্ণনা করেছি।

আয়্যুব সুলায়মানের প্রিয় পুত্র এবং খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খাতিরেই সুলায়মান তাঁর এ পুত্রকে দুই বার তিরস্কার করেছেন এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সুলায়মান তাঁকে মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ দেয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অথচ এতসব হওয়ার পর কারও ধারণা ছিল না যে, মৃত্যুর কঠিন হাত যখন তাঁর দ্বারে করাঘাত করবে তখন তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী রেজা বিন হায়াতের পরামর্শেই সুলায়মান এ মহৎ কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন– সুলায়মানের পুত্র আয়্যুব খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিল। কিন্তু সুলায়মানের পূর্বেই সে ইন্তেকাল করল। এছাড়া সুলায়মানের অন্যান্য সন্তানগণ সকলেই ছিল অল্প বয়স্ক। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল এবং তিনি কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ এবং রেজা ইবনে হায়াত এসে উপস্থিত হলেন। সুলায়মান রেজাকে বললেন, আমার সন্তানগণকে জামা-কাপড় পরিধান করিয়ে আমার নিকট নিয়ে আস। তারপর তার সন্তানগনকে তার নিকট হাজির করা হল। তারা এতই অল্পবয়স্ক ছিল যে, তারা জামা কাপড় পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারত না। সুলায়মান তাদের প্রতি তাকিয়ে এ কথা কয়টি আবৃত্তি করলেন। আমার সন্তানগণ ছোট ছোট তারা যদি বড় হতো তবে আমি সফল হতাম। এতে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ পবিত্র কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং পাঠ করিলেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করে আল্লাহর স্মরণ করে নামায পড়ে সেই সফল হয়েছে।

সুলায়মান রেজাকে পুনরায় আদেশ করলেন যে, আমার পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করে আমার নিকট নিয়ে আস। তারপর যখন তাদেরকে আনা হল, তখন দেখা গেল যে তাদের কোমরে বাঁধা তরবারী মাটি স্পর্শ করছে।

ইবনে সাদ বলেন, রেজা বিন হায়াত বলেছেন, শুক্রবার দিন সুলায়মান সবুজ রঙের রেশমী কাপড় পরিধান করলেন। তারপর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আক্ষেপ করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি একজন যুবক বাদশাহ্। তারপর লোকের সাথে জুমার নামাযে শরীক হবার জন্য বের হলেন। নামায হতে ফিরে এসে তির্নি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন এবং একটি অছিয়তনামায় তিনি তার অল্প বয়স্ক পুত্র আয়্যুবকে খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। এতে আমি নিবেদন করলাম, আমীরুল মোমিনীন! যে খলিফা কোন যোগ্য লোককে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত না করে যায়, তিনি কিরূপে কবরে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করতে পারেন? সুলায়মান বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা এস্তেখারা করব এবং আরও চিন্তা ভাবনা করব। এভাবে এক দুই দিন চলে গেল। অবশেষে তিনি তার পূর্ব লিখিত অছিয়তনামাটি ছিড়ে ফেললেন এবং আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, দাউদ ইবনে সুলায়মান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? আমি বললাম, তিনি আছেন কনষ্টান্টিনোপলে। আপনি জানেন না যে, তিনি কি জীবিত আছেন না ইন্তেকাল করেছেন। সুলায়মান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তবে তোমার মতামত কি? আমি বললাম, মতামতের অধিকারী তো আপনিই। আমার কর্তব্য হল আপনার মতামত সম্পর্কে চিন্তা করা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথাযথ বাস্তবায়িত করা।

সুলায়মান বললেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? আমি বললাম, তিনি একজন সৎ ও যোগ্য লোক। সুলায়মান বললেন, তোমার কথা সঠিক। তিনি যথার্থই একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু যদি আমি তাঁকে খলিফা মনোনীত করি এবং আব্দুল মালেকের সন্তানদের মধ্যে কাউকেও খলিফা মনোনীত না করি তবে খুব গোলমাল হবে এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করুক, তারা এটা কখনও সহ্য করবে না। কিন্তু যদি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পর তাদের কাউকে খলীফা মনোনিত করে যাই তবে হয়ত তারা এটা মেনে নিতে পারে। ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেক এখন রাজধানীতে উপস্থিত নেই। আমি তাকেই ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পরবর্তী খলীফা মনোনীত করছি। এতে সে কিছুটা শান্ত্বনা লাভ করে আমার

মনোনয়নে রাজী হতে পারে। আমি বললাম, আপনার মতামত যথার্থ এবং মতামত প্রকাশের জন্য আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

ইবনে সা'দ বলেন ইবনে জাওযি, ইবনে কাছীর, ইবনে হাকাম ও তাবারীসহ প্রায় সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে এক মত যে, এই রেজা বিন হায়াতই ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফতের পক্ষে সুলায়মানকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যদি আয়্যুবের মনোনয়নে আপত্তি না করতেন, যদি সুলায়মানকে কবরের শাস্তি সম্পর্কে ভয় না দেখাতেন তবে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মনোনয়নের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি হতো।

ইবনে হাকাম ও ইবনে সাদের বর্ণনা যদিও পরস্পর বিরোধী, তবুও তারা উভয়েই স্বীকার করছেন যে, রেজা বিন হায়াতই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে খলীফা মনোনিত করার জন্য সুলায়মানকে সম্মত করিয়েছিলেন।

রেজা বিন হায়াত খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্বশীল, সংকল্পে অটল ও বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উজির ছিলেন এবং কারো ব্যক্তিত্বে তিনি আকৃষ্ট হতেন না। তিনি খুবই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের প্রতি সুলায়মানের মন আকৃষ্ট করেছিলেন।

ইবনে সা'দ পূর্ববর্তী ঘটনাবলি ছাড়াও এক বর্ণনায় বলেছিলেন যে, রেজা বিন হায়াত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে খলীফা মনোয়নের জন্য নিজের পক্ষ হতে সুলায়মানকে পরামর্শ দিয়েছেন।

ইবনে জাওযি ইমাম শাফী (র) এর একটি কথা বর্ণনা করেছিলেন যে,

إِنِّىْ لَأَرْجُوا اَنْ يُدْخِلَ اللّٰهُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ الْجَنَّةَ
بِا سْتِعْمَالِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

অর্থাৎ আমি আশা করি যে, আল্লাহপাক সুলায়মানকে এ জন্যই জান্নাতে স্থান দিবেন যে, তিনি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে খলিফা মনোনীত করেছিলেন।

রেজা বিন হায়াতের পরামর্শক্রমেই সুলায়মান ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পক্ষে মনোয়ন পত্র লিখেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ সুলাইমানের উজীরে আজম রেজা বিন হায়াতের মৌখিক ভাষ্যটি এরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

সুলাইমান অছিয়তনামাটি লিপিবদ্ধ করে তাতে সীল মোহর করলেন এবং দেহরক্ষী প্রধান কাব ইবনে হামেদুল আইসীকে ডেকে তাঁর বাড়ীর লোকজনকে একত্রিত করতে আদেশ দিলেন। কাব বনু উমাইয়্যার লোকজনকে ডেকে একত্রিত করল। তখন খলিফা সুলাইমান রেজাকে বললেন, তুমি আমার লিখিত চিঠিসহ তাদের নিকট গিয়ে বল যে, এটা আমার লিখিত অছিয়তনামা এবং তাদেরকে এটা মেনে নিতে এবং এতে আমি যাকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছি তার আনুগত্য স্বীকার করতে দাও। তারপর যখন প্রধানমন্ত্রী রেজা তার কথামত তাদের নিকট গিয়ে উক্ত নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বলল, আমরা আমিরুল মুমিনীনের নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করতে চাই। রেজা বিন হায়াত তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা যখন সুলাইমানের নিকট উপস্থিত হল, তখন সুলাইমান তাদেরকে উক্ত অছীয়তনামার প্রতি ইঙ্গিত করলেন, তারা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে খলীফা তাদেরকে বললেন, এটাই আমার অছীয়তনামা, আমার নির্দেশ মেনে নাও এবং আমি যার জন্য খেলাফতের অছীয়ত করেছি তার আনুগত্য স্বীকার করে তারপর তা একের পর এক কর। সকলেই বায়আত গ্রহণ করল। তারপর প্রধান মন্ত্রী রেজা বিন হায়াত সেই সীল মোহরকৃত অছীয়তনামা নিয়ে বাইরে আসলেন।

রেজা বিন হায়াত আরো বলছেন যে, যখন সমস্ত লোক চলে গেল, তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমার নিকট এসে বললেন, আমার সন্দেহ হয় যে, এ অছীয়তনামাতে আমার সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছে। তিনি আরো বললেন, রেজা! "তোমার প্রতি আল্লাহ সদয় হোন" তুমি আমার বন্ধুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে এ সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাও। যদি আমার সন্দেহই সঠিক হয়, তবে তুমি বল আমি এখনই পদ হতে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিলাভ করি। কারণ এখনও সময় আছে। রেজা বিন হায়াত বললেন, এ সম্পর্কে আমি আপনাকে কোন কিছুই বলতে পারব না। এ কথা শুনে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাগ করে সেখান হতে চলে গেলেন।

রেজা বিন হায়াত বলেন, এরপর হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, "রেজা! তুমি আমাকে এ অছীয়তনামার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানাও।"

যদি এতে আমার সম্পর্কে কিছু বলা হয়ে থাকে তবে এখন হতেই আমি তা জেনে নিলাম, আর যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে, তবে এখনই তার প্রতিবাদ করব। কারণ আমার মত লোক এরূপ অন্যায় অবিচার নীরবে মেনে নিতে পারে না।

রেজা বিন হায়াত গোপন রহস্য উদঘাটন করতে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলেন। হিশাম নিরাশ হয়ে ফিরে গেল এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতে মারতে মারতে বলতে লাগল, "যদি খেলাফতের দায়িত্ব আমি না পাই, তবে আব্দুল মালেকের বংশে আর কে আছে?

রেজা বিন হায়াত আরো বলেন, এরপর আমি সুলাইমানের নিকট এসে দেখি তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আমি তাকে কেবলমুখী করে দিলাম। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদের নিকট হতে দ্বিতীয়বার বায়আত না নাও তবে তারা মানবে না। তারপর সুলাইমান আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রেজা বিন হায়াত বলেন আমি সবুজ রঙ্গের একটি চাদর দিয়ে তাঁর দেহ আবৃত করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাঁর স্ত্রী সংবাদ বাহক পাঠিয়ে তার অবস্থা অবগত হতে চাইলেন। আমি বললাম, খলীফা এখন ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন। সংবাদ বাহক চাদর দিয়ে খলিফার দেহ আবৃত দেখে তাঁর স্ত্রীকে এই সংবাদই দিল। বেগম সাহেবাও তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। আমি উক্ত সংবাদবাহককে দরজায় দাঁড় করিয়ে তার নিকট থেকে অঙ্গিকার নিলাম যে, সে কাউকে এখানে আসতে অনুমতি দেবে না। তারপর আমি সেখান হতে বের হয়ে কাব ইবনে হামিদুল আইসীর নিকট লোক পাঠালাম এবং খলিফা পরিবারের সমস্ত লোকজনকে "মসজিদে ওয়াবিতে" হাজির করার ব্যবস্থা করলাম এবং তাদেরকে বললাম যে, তোমরা অছিয়ত নামার প্রতি বায়আত কর। তারা বলল, আমরা তো একবার বায়আত করেছি

আবার কেন? তুমি কি দ্বিতীয় বার আয়আত গ্রহণ করতে চাও? আমি বললাম এটা আমিরুল মুমিনীনের অছিয়তনামা। প্রতিশ্রুতি দাও যে, এ মোহরকৃত অছীয়তনামায় যাকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, তোমরা তার আনুগত্য স্বীকার করবে। তখন একে একে তাদের সকলেই দ্বিতীয় বার বায়আত করল।

রেজা বিন হায়াত বলেন, যখন সকলেই দ্বিতীয় বায়আত করল, তখন আমি মনে করলাম যে, এখন কথা মজবুত হয়ে গিয়েছে, কাজেই তাদেরকে খলিফার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেওয়া উচিত। তখন আমি বললাম, তোমরা সকলেই দাঁড়িয়ে যাও, শোন তোমাদের খলিফা ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আমি সীলমোহরকৃত চিঠি খুলে সকলের সামনে পাঠ করতে লাগলাম, কিন্তু যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নাম ঘোষণা করলাম, তখন হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক চিৎকার করে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আমি তার বায়আত করব না। আমিও চিৎকার করে বললাম, আল্লাহর কসম! তুমি বায়আত না করলে আমি এখনই তোমাকে হত্যা করব। উঠ, বায়আত কর। তারপর সে বাধ্য হয়ে উঠলো। তখন সে দু' পা ফরাশের উপর মারছিল এবং ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন পড়ছিল। আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে বললাম, উঠুন! মিম্বরে আরোহন করুন। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সাথে ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন বলতে বলতে মিম্বরে আরোহন করে বললেন; এমন হল কেন?

রেজা বিন হায়াত আরো বলেন, যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মিম্বরে আরোহন করলেন এবং হিশাম ইবনে মালেক ইন্না লিল্লাহি বলতে বলতে বায়আত করতে আসল, তখন যে ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে বলল, আফসুসের বিষয়– আব্দুল মালেকের সন্তানরা বঞ্চিত হল আর তোমাকে খলিফা মনোনীত করা হল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ উত্তরে বললেন হ্যাঁ আমিত কখনও এটা কামনা করিনি, বরং অপছন্দই করতাম। আবার তিনি ইন্না লিল্লাহি পাঠ করলেন। এরপর সুলায়মানের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লামা সাদ, তাবারী ইবনুল জাওযী ও ইবনে কাছীর যে বর্ণনা

প্রদান করেছেন তা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুলায়মান ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে যেরূপ প্রীতির চোখে দেখতেন তাতেই তিনি সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়লেন যে, হয়তঃ তাকেই খেলাফতের জন্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলনা, কাজেই তিনি রেজা বিন হায়াতের মাধ্যমে দৃঢ় অবগতির পর পদ হতে ইস্তফা দিয়ে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, অন্যথায় তিনি এরূপ করতেন না। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফতের ঘটনা বর্ণনা করে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের হাতে কিছুটা ভিন্ন ধরণের সূক্ষ্ম তথ্য সংযোজন করেছেন। তিনি বলেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ পূর্ব হতেই অবগত ছিলেন এবং রেজা বিন হায়াতের নিকট এসে তাকে তার বন্ধুত্ব ও আল্লাহর রহমতের দোহাই দিয়ে কোন মতে এ পদ হতে ইস্তফা গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য রেজা বিন হায়াতকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু রেজা বিন হায়াত কোন মতে তাতে রাজী হলেন না।

ইবনে খালদুনের এ বর্ণনায় বুঝা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন এবং পদ হতে ইস্তফা দিয়ে মুক্তি লাভ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রেজা বিন হায়াতই ছিল তার একমাত্র প্রতিবন্ধক।

যা হোক আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য যে, রেজা বিন হায়াতই হযরত ইবনে আব্দুল আজিজকে খেলাফতের পদ গ্রহণের জন্য রাজী করেছিলেন। এ ব্যাপারে ইবনে সাদের এ বর্ণনাটিও বিশেষ প্রাণিধান যোগ্য। রেজা ইবনে হায়াত বলেন যে, যখন সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের মৃত্যুযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তখন আমি অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর বাইরে আসা যাওয়া করতে লাগলাম। এই অবস্থায় ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাকে ডেকে বললেন, রেজা তুমি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, তোমাকে ইসলাম ও আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি প্রসঙ্গক্রমে খলীফার সামনে আমার আলোচনা উঠে এবং যদি তিনি তোমার পরামর্শ চান, তবে অনুরোধ করে আমার পক্ষ হতে তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিও। আমি তোমার জন্য আল্লাহপাকের নিকট দোয়া করব। কারণ এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রেজা বিন হায়াত বলেন, আমি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে তিরস্কার করে বললাম, তুমি তো কম লোভী নও! তোমার ইচ্ছা যে, আমি তোমাকে খলীফা মনোনীত করার জন্য সুলায়মানের নিকট সুপারিশ করি। এতে ওমর ইবনে আজীজ খুব লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন। আমিও ভিতরে চলে গেলাম। তখন সুলায়মান বললেন, তুমি কাকে খলীফা মনোনীত করতে পরামর্শ দাও এবং তার সম্পর্কে অছীয়তনামা লিখতে বল? আমি বললাম আমিরুল মুমিনীন, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা, আপনি এখনই আল্লাহর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। তিনি আপনাকে এব্যপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সুলায়মান বললেন, তবে তোমার ইচ্ছা কি? তখন আমি ওমর ইবনে আবদুল আজীজের নাম প্রস্তাব করলাম। সুলায়মান এ বলে প্রতিবাদ করলেন যে, তবে আব্দুল মালেকের অছীয়তনামার কি হবে? তিনি আমার নিকট তার জীবিত সন্তানদের ব্যাপারে এবং ওয়ালিদের নিকট হতেও এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আমি বললাম, তাদের কাউকেও ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে দেন, কোন ঝামেলা থাকবে না। সুলায়মান আমার কথা সম্পূর্ণ রূপেই বুঝতে পারলেন এবং বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, কাগজ কলম নাও। আমি কাগজ কলম এনে দিলাম, তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পক্ষে খেলাফতের অছিয়তনামা লিখে দিলেন।

ইবনে সা'দের অপর এক বর্ণনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ খেলাফতের পদ লাভের জন্য মোটেই আশা করতেন না। তিনি অছীয়তনামা শুনে শপথ করে বললেন যে তিনি কখনও খেলাফতের পদ লাভের আশা করেননি। তার বক্তব্য ছিল এই وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِهٰذَا, আল্লাহর কসম! কখনও আমি এর আশা করিনি।

ইবনে আব্দুল হাকাম এ ঘটনাটি যদিও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে কিছু নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। তার ভাষ্যটি এরূপ–

১। তারপর সুলাইমান যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন রেজা বিন হায়াত তাঁর মৃত্যুর সংবাদ গোপন করে লোকদের কাছে গমন করে বললেন, খলিফা তোমাদেরকে অছীয়ত নামায় লিখিত ব্যক্তি সম্পর্কে নতুনভাবে বায়আত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২। রেজা বিন হায়াতের এ কথা শুনে তারা বলল, আমাদেরকে খলিফার কাছে নিয়ে চলুন। তখন রেজা ভিতরে প্রবেশ করে মৃত খলিফাকে বালিশের সাহায্যে সোজা করে বসিয়ে দিলেন এবং একজন খাদেমকে তাঁর নিকট দাঁড় করিয়ে তিনি নিজে বাইরে আসলেন এবং লোকজনকে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। লোকেরা ভিতরে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দূর হতেই তাঁকে দেখছিল এবং সালাম করে বের হয়ে যাচ্ছিল। তখন একজন খাদেম রোগীর ন্যায় খলিফার গায়ের চাদর এদিক-ওদিক করছিল।

৩। রেজা বিন হায়াত তখন লোকদেরকে মসজিদে একত্রিত করলেন, তখন খলিফা পরিবারের লোকজনের সাথে অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেরাও একত্রিত হয়েছিল এবং তারা সকলেই এক সঙ্গে অছীয়তনামায় নির্দেশিত ব্যক্তির প্রতি বায়আত করলেন।

৪। তারপর যখন অছীয়তনামা পাঠ করা হল, তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নাম শুনে হিশাম ইবনে মালেককে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল, তখন একজন সিরিয়বাসী যুবক তরবারী উত্তোলন করে হিশাম ইবনে মালেককে ধমক দিয়ে বলল, "খলিফার অছীয়তনামা পড়া শেষ হোক, তারপর তুমি চিৎকার করবে।"

তারপর ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেকের নাম শুনে হিশাম বলল, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য স্বীকার করলাম। এরপর সকলে উঠে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের হাতে বায়আত করল।

এ ব্যাপারে ইবনুল জওযিও একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, হিশাম ইবনে মালেক বলল, আমি তখনই এ অছীয়তনামা মেনে নেব, যখন আমি জানতে পারব যে, তাতে আব্দুল মালেকের সন্তানদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। লোকেরা তার এই কথার জন্য তাকে তিরস্কার করল এবং সে ভীষণ লজ্জা পেল। তখন সমস্ত লোক সামি'না ওয়া আতা'না অর্থাৎ আমরা আনুগত্যের শপথ করলাম বলে নতুনভাবে বায়আত করল। যখন রেজা ইবনে হায়াত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মিম্বরে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। তিনি মিম্বরের নিকটই ছিলেন, তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম"! আমি প্রকাশ্য বা গোপন কোনভাবেই এর আশা করিনি।

ইবনুল জাওযি আরো বলেন, এ দ্বিতীয় বায়আতের পর সুলাইমানকে দাফন করে যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মসজিদে আসলেন, তখন মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে আমার মতামত ও ইচ্ছা ছাড়াই খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম জনতার কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। অতএব আমি তোমাদেরকে আমার বায়আত হতে মুক্তি দিলাম। তোমরা স্বাধীনভাবে যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন কর। সমস্ত লোক সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা আপনাকেই খলিফা মনোনীত করেছি, আমরা আপনাকেই খলিফা মনোনীত করেছি। আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

প্রথম পদক্ষেপ

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সুলায়মানের জানাযায় নামায পড়িয়ে যখন তাকে দাফন করলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ অন্য কোন কাজ করার পূর্বেই দোয়াত-কলম আনিয়ে সর্বপ্রথম তিনটি নির্দেশ প্রদান করলেন।

লোকজন তাঁর ব্যস্ততায় কানাঘোষা করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "এতো তাড়াহুড়া কেন, এ কাজ তো তিনি ঘরে ফিরেও করতে পারতেন। মনে হয় খেলাফতের লোভ-লালসায় তাঁকেও পেয়ে বসেছে।

ইবনুল হাকাম বলেন, খেলাফতের লোভ-লালসার কারণেই ওমর ইবনে আবদুল আজিজ দোয়াত-কলম আনার ব্যবস্থা করেননি, বরং তিনি নিজেই নিজের পর্যালোচনা করেছেন এবং এই অবহেলাও তার অনুভূতি এবং কর্তব্য পরায়ণতার প্রতিকুলে ছিল বলেই তিনি এরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন।

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজের এ ব্যস্ততার কারণ কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কেননা, যদি তিনি বাদশাহী পছন্দ করতেন, যদি তিনি বাদশাহীর উপকরণাদি লাভ করতে ভালবাসতেন তবে ওয়ালিদ বা সুলাইমানের যুগে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে হলেও এর জন্য কোন প্রচেষ্টা চালাতেন। অথচ বাস্তব ও সত্য কথা হলো ঐতিহাসিক ইবনে আব্দুল হাকাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, সমগ্র বনু উমাইয়ার মধ্যে ওয়ালিদ ও সুলায়মান ব্যতীত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ

সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বনু উমাইয়ার সকলের নিকটই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দেশব্যাপী উলামা, ফুকাহা এবং মুহাদ্দেসিন -সকলের নিকটই প্রশংসনীয় ছিলেন। তদুপরি মিশর ও আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় তাঁর যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত-অনুরক্ত ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে ওয়ালিদ বা সুলায়মানের যুগেও মিশরে স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কারণ তৎকালীন তিনজন নামকরা সেনাপতি মোহাম্মদ ইবনে কাসেম, মূসা ইবনে নাছীর এবং কুতাইবা ইবনে মুসলিম ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পরম ভক্ত ছিল। বিশেষতঃ মূসা ও কুতাইবা তাঁর ইশারায় লাখ লাখ সৈন্যসহ ময়দানে হাজির হতে দ্বিধাবোধ করত না।

মূসা ইবনে নাছীর সম্পর্কে ঐতিহাসকদের ধারণা হলো, মূসার সাথে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পিতা আব্দুল আজিজের বন্ধুত্ব ছিল। ওমরের সাথেও মূসার সম্পর্ক সেরূপ ঘনিষ্ট ছিল। কারণ মূসা যখন ইরাকের মন্ত্রী ছিলেন, তখন খলীফা আব্দুল মালেকের রোষে পড়ে তিনি কুফা হতে পালিয়ে মিশরে আব্দুল আজিজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এটা জানতে পেরে আব্দুল মালেক তার ভাই আব্দুল আজিজকে লিখলেন যে মূসা পলাতক ব্যক্তি-তাকে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু আব্দুল আজিজ কোন পরওয়াই করলেন না। বরং তাকে তিনি আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সেখানকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেন। মূসাও সেই সুযোগে বিপুল পরিমাণে শক্তি বৃদ্ধি করে নিলেন।

সুলাইমান তার অভিষেকের সময় যখন মূসাকে গ্রেফতার করেন, তখন ওমর ইচ্ছা করলে মূসাকে স্বপক্ষে আনতে পারতেন এবং মূসাও তার সমর্থন পেলে এমন এক বিদ্রোহ ঘটাতে পারতেন যার ফলে সুলাইমান কেন, সমগ্র বনু উমাইয়ার নাম -নিশানা পর্যন্ত মুছে যেত। কিন্তু ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এমনটা করলেন না।

যদি তিনি খেলাফত পরিচালনার লোভ করতেন তবে কুতাইবা ইবনে মুসলিম– যিনি প্রাচ্যের মহান বিজেতা ছিলেন, তার দ্বারাও তিনি সে দিনই খেলাফতের পতাকা উড্ডীন করতে পারতেন, যেদিন দামেশকে সুলাইমানের খেলাফতের সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইবনে কাছীর স্পষ্ট

ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াজিদ ইবনে মুহারিবের কারণে কুতাইবা সুলায়মানের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সুলায়মানকে পদচ্যুত করার জন্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। যদি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গোপনে ও একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে তাকে কোন ইঙ্গিত দান করতেন যে সুলাইমানের পরিবর্তে তুমি আমার বায়আত গ্রহণ কর তবে কুতাইবা তাঁর এতটুকু ইশারায় তার খেলাফতের পতাকা উড্ডীন করে দিতেন। এবং তার এ কর্মতৎপরতায় কেউ বাধা দিতে সাহস পেত না। তিনি প্রকাশ্যে রাজধানী দামেস্কে এসে উপস্থিত হতেন, আর একজন উমুবী যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতাই তাকে তাঁর এ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিত।

কিন্তু ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খেলাফতের মসনদকে শুধু কন্টকাপূর্ণ নয় বরং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ণ শয্যা মনে করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা থাকে, সে খলিফা নিযুক্ত হবার পর তার সেই অধিকারটুকুও খর্ব হয়ে যায়।

যা হোক, তাঁর এরূপ কর্তব্যপরায়ণতাই সুলাইমানের জানাযার পর তাঁকে তিনটি ফরমান জারি করতে বাধ্য করেছিল। তম্মধ্যে প্রথম ফরমান ছিল মুসলিমা ইবনে আব্দুল মালেককে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক তার ভাই মুসলিমাকে ৯৮ হিজরীতে কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরণ করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কনষ্টান্টিনোপল জয় না করা পর্যন্ত সে সেখানেই অবস্থান করবে, পরবর্তী নিদের্শ না পাওয়া পর্যন্ত সে ফিরে আসতে পারবে না।

মুসলিমা যখন সেখানে গিয়ে কনষ্টান্টিনোপুলের নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি প্রত্যেক অশ্বরোহীকে দুই মণ গম সঙ্গে নিতে নির্দেশ দিলেন। অশ্বরোহী সৈনিকগণ তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করল এবং তারা কনষ্টান্টিনোপুলের নিকটে গমের একটি পাহাড় সৃষ্টি করে দিল। মুসলিমা তাদেরকে এ গম খেতে নিষেধ করলেন এবং রোমানদের ভান্ডার লুণ্ঠন করে এবং তাঁদের কৃষিক্ষেত্রে চাষ করা খাদ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলেন।

সৈন্যবাহিনী কাঠ-খড় দ্বারা সেখানেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে কৃষিকাজ শুরু করে দিল। তাদের কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা

লুটতরাজ করে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতো। যখন তাদের কৃষি ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হল তখন পূর্বের খাদ্য সংরক্ষণ করে উৎপন্নদ্রব্য তারা খেতে লাগল।

তাবারী বলেন, বাহ্যতঃ মুসলিমার এ কর্মসূচী খুবই উত্তম ছিল। কিন্তু রোমানগণ চালাকী করে তাদের এ কর্মসূচী সম্পূর্ণরূপে ভন্ডুল করে দিল। রোমান সেনাপতি এক রাত্রিতে অর্তকিতে আক্রমণ করে মুসলমানদের নতুন ও পুরাতন উভয় শষ্য ভান্ডারে আগুন ধরিয়ে দিল। সমস্ত শষ্য ভান্ডার পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল। এখন সুলাইমানের সৈন্যবাহিনী খাদ্যের বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে লাগল।

মুসলমানরা খাদ্যের অভাবে তাদের বাহনের জন্তগুলি খেয়ে অবশেষে বৃক্ষের মূল ও পাতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। সুলাইমান যথারীতি এ সংবাদ অবগত হয়ে এর কোন প্রতিকার করলেন না। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি ওয়াবেক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে কনষ্টান্টিনোপুল ত্যাগ করতে অনুমতি দিলেন না । তাবারী এ ঘটনা উল্লেখ করে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই করুণ ও মর্মান্তিক। তিনি বলেন, তারা অনাহারে তাদের বাহনের সমস্ত পশু খেয়ে ফেলল, মাটি ব্যতিত গাছের শিকড় ও পাতাসহ সবকিছুই তারা ভক্ষণ করছিল, অথচ সুলাইমান ওয়াবেকে অবস্থান করেও এর কোন প্রতিকার বিধান করতে এগিয়ে আসলেন না। এভাবেই শীতকাল এসে পড়ল এবং সুলায়মান মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, রোমানরা যখন মুসলমানদের সাথে প্রবঞ্চনা করে তাদের খাদ্যসামগ্রী জ্বালিয়ে দিল এ সংবাদ শুনে সুলাইমান খুবই রাগান্বিত হয়ে কসম করলেন যে, তিনি মুসলিমাকে আর ফেরত আনবেন না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট এটা একটি নিবর্তনমূলক কসম ছিল, কাজেই তিনি সুলাইমানের জানাযা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ কসম ভঙ্গ করে মূহুর্তকাল বিলম্ব না করেই মুসলিমাকে দেশে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন। তিনি লিখলেন তুমি ফিরে আস। এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে দামেস্কে ফিরিয়ে আন।

সুলায়মানের জীবিত অবস্থায় যখন তিনি মুসলমানদের এ দুঃখ কষ্টের কথা জানতে পারলেন তখন সুলায়মান একগুঁয়েমিতে অবিচল ছিলেন কিন্তু ওমর ইবনে আবদুল আজিজ অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, এটা ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে বিচলিত ও মর্মাহত করেছিল অতঃপর তিনি খেলাফতের পদ লাভ করার পর এক মূহুর্তও মুসলমানদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। এ কারণেই তিনি পত্র লিখতে ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি দ্বিতীয় যে পত্র লিখেছিলেন তা প্রথম পত্র অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি এ পত্রের মাধ্যমে মিশরের রাজস্ব সচিব উসামা ইবনে যায়েদ আত্‌তানুহীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, তাকে প্রত্যেক ঘাটিতে এক বছর করে বন্দী করে রাখা হোক।

ইবনে হাকাম এ কঠোর নির্দেশের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সে ছিল একজন অত্যাচারী ও আল্লাহর সীমালঙ্ঘনকারী শাসক। সে মানুষকে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে শাস্তি দিত। সে এমন সব অপরাধে মানুষের হাত কেটে দিত যাতে আল্লাহপাক অনুরূপ বিধান দেননি। সুতরাং ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ আল্লাহভীরু শাসনকর্তা এরূপ জালেম ও জল্লাদ কর্মকর্তাকে কিভাবে বরদাশত করতে পারেন? অতএব তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব মুসলমানগণকে এরূপ পাপিষ্ট ব্যক্তির হাত থেকে মুক্তি দিতে ব্যস্ততার সাথে পত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তিনি তৃতীয় ফরমান লিখেছিলেন আফ্রিকার শাসনকর্তা ইয়াযিদ ইবনে আবু মুসলিমকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে। ইয়াযিদ ইবনে মুসলিম শাহী নির্দেশাবলী অতি কঠোরভাবে কার্যকরী করত, মানুষের উপর সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার করত, মানুষকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিত। অথচ সে যথারীতি আল্লাহর যিকির ও তসবীহ্ তাহলীলও পাঠ করত। সে যখন কাউকে শাস্তি দিত তখন তার গোলামকে আদেশ দিত, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, হে বালক! তার শরীরের অমুক অমুক স্থানে জোরে জোরে আঘাত কর। কখনো কখনো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ধ্বনী করে এসব নির্দেশ দিত।

বাস্তবিক পক্ষে এটা আল্লাহর যিকির ও ইসলামের প্রতি বিদ্রূপেরই নামান্তর ছিল। সে যেন আল্লাহর নাম নিয়েই মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করত এবং মানুষকে শাস্তি দিত।

এ তিনটি ফরমান লিখে যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সুলায়মানের কবরস্থান হতে উঠে আসলেন, তখন তাঁর জন্য শাহী সওয়ারী হাজির করা হল। তিনি এ সমস্ত সওয়ারী দেখে বললেন, এ সমস্ত কিসের সওয়ারী? উত্তর দেওয়া হল, এ নবনির্বাচিত খলিফার জন্য নির্ধারিত সওয়ারী। ইতোপূর্বে এসব বাহনে আর কেউ আরোহন করেনি। এতে নবনির্বাচিত খলিফা প্রথম দিন আরোহন করে থাকেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এসব সওয়ারী ফিরিয়ে দিয়ে তার নিজের খচ্চরের দিকে এগিয়ে চললেন এবং ব্যক্তিগত সেবক মুজাহিমকে বললেন, এ সমস্ত বায়তুল মালে নিয়ে যাও। এগুলি সাধারণ মুসলমানের সম্পদ।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, তাঁর জন্য এরূপ নতুন তাঁবু ও শামিয়ানা টানানো হল-যাতে ইতোপূর্বে আর কেউ তাতে বসবাস করেনি। এটাই সাধারণ প্রচলিত প্রথা ছিল। যে ব্যক্তি নতুন খলিফা নির্বাচিত হবেন তার জন্য এরূপ নতুন তাবুর ব্যবস্থা করা হত।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ সমস্ত নতুন তাবু দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কিসের তাবু? উত্তর দেওয়া হল, এ সমস্ত তাবুতে ইতিপূর্বে কারও বসার সৌভাগ্য হয়নি। কোন নবনির্বাচিত খলিফা খেলাফতের মর্যাদায় আসীন হবার পরই এসব তাবুতে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুজাহিমকে বললেন, এগুলিও মুসলমানদের সম্পদ, এগুলোও বায়তুলমালে জমা করে দাও। এরপর তিনি তার খচ্চরে আরোহন করে সে সব বিছানার প্রতি অগ্রসর হলেন যা পূর্বনিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ নতুন ছিল এবং যা ইতোপূর্বে আর কারও জন্য বিছানো হয়নি এবং কোন খলিফাও যাতে বসার সৌভাগ্য লাভ করেননি। মোটকথা এসব বিছানা সম্পূর্ণ নতুন ছিল শুধু অভিষেক অনুষ্ঠানের মর্যাদার খাতিরেই ঐসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বাহন হতে অবতরণ করে এ বিছানার নিকটবর্তী হয়ে তার হাতের ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে তা গুটিয়ে দিলেন এবং খালি চাটাই বের করে তাতে উপবেশন করলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা হলেন তখন সমস্ত লোক তার সামনে দন্ডায়মান হল, তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, লোক সকল! তোমরা যদি আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাক তবে আমিও দাঁড়িয়ে যাব। যদি তোমরা বস আমিও বসব। মানুষ শুধু আল্লাহর সামনেই দাঁড়াবে। আল্লাহ মানুষের জন্য কিছু কাজ ফরযও কিছু কাজ সুন্নত করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এগুলি যথারীতি পালন করবে, সে সফলকাম হবে আর যে ব্যক্তি একথার প্রতি অবহেলা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তোমাদের মধ্যে যে আমাদের সাহচর্যে আসবে তার পাঁচটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। সে আমাদের নিকট তার সেসব প্রয়োজনীয় কথা পৌঁছাবে, আমরা যা অবগত নই।

২। আমাদেরকে এরূপ সুবিচারের প্রতি ধাবিত করবে– যা আমাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল না।

৩। সত্যবাদিতার দিক দিয়ে সর্বদাই আমাদের সঙ্গী হবে।

৪। সবসময় আমাদের ও মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করবে।

৫। আমাদের নিকট কারও বদনাম না গীবত করবে না।

এই পাঁচটি বিষয় যে লক্ষ্য রাখবে না তার জন্য আমাদের দরজা বন্ধ থাকবে।

এ সম্পর্কে ইবনুল জাওযি মুহাম্মদুল মারুযির মাধ্যমে যে বর্ণনা করেছেন তাতে সুলায়মানের দাফন শেষ এবং খলিফার জন্য নতুন সওয়ারী হাজির করার বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে- তিনি বললেন, আমার বাহন আন। যখন তাঁর বাহনের জন্তুটি তাঁর নিকট উপস্থিত করা হল এবং তিনি তাতে আরোহন করলেন, তখন শহররক্ষী প্রধান এসে তার সামনে হাজির হল এবং খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে আগে আগে চলল। খলীফা তাকে বললেন, আমার সামনে হতে সরে যাও, তোমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার নিকট তোমার কোন কাজও নেই। আমি একজন সাধারণ

মুসলমান, একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি চলতে লাগলেন। মানুষও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। তিনি মসজিদে এসে মিম্বরে আরোহন করে বসলেন, সমস্ত লোক তার চারদিকে জমায়েত হল। এরপর তিনি এই ভাষণ দিলেন,

হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দিচ্ছি। আল্লাহর ভয় সর্বপ্রথমে। আল্লাহর ভয় ব্যতীত কোন উপায় নেই। নিজের জীবন পরিপাটি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন মনে কর তবে যে ব্যক্তি পরকালের কাজ করে যায় আল্লাহ তার দুনিয়ার কাজ সঠিক করে দেন। যদি তোমরা তোমাদের অভ্যন্তরকে ঠিক রাখ তাহলে আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক দিক ঠিক রাখবেন। মৃত্যুকে বেশি স্মরণ কর। মৃত্যু যখন আসবে তখন তার জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত থাকা উচিত। মৃত্যু মানুষের জীবনের সমস্ত আনন্দ উপভোগ কেড়ে নেয়। এ উম্মত আল্লাহ ও তার রাসূল এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কোন মতবিরোধ করবে না। কিন্তু তারা ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া ফাসাদ করবে। আল্লাহর কসম, প্রাপ্য অধিকার ছাড়া আমি কাউকে কোন কিছুই দেবনা, কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করব না। তারপর তার কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে লোক সকল! যে আল্লাহর আনুগত্য করে মানুষের উপর তার অধীনতা স্বীকার করা ফরজ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষের উপর তার আনুগত্য স্বীকার করা জায়েয নেই। আমি যদি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করি তবে তোমরা আমার কথা মেনে চলবে আর যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তবে তোমরাও আমার কথা অমান্য করবে।

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ সময় নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়েছেন, "হে লোক সকল! এটা বাস্তব সত্য যে, তোমাদের নবীর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না, তোমাদের কিতাবের পর আর কোন কিতাব অবতীর্ণ হবে না। মহান আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন সেগুলো হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তাই হারাম। আর এ হারামের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। হে লোক সকল! স্মরণ রেখো, আমি চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে এ আসনে উপবেশন করিনি। আমি শুধু আল্লাহর বিধানসমূহ কার্যকরী করতেই দায়িত্ব গ্রহণ

করেছি। আমি কোন নতুন বিষয়ের দাবী করব না, আমি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলব। হে লোক সকল! দেখো, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারোও আনুগত্য তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে না।

আরও মনে রেখো, আমি তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নই। আমি তোমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আল্লাহপাক তোমাদের চেয়ে আমাকে অনেক বেশী দায়িত্ব দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযি বলেন, তার এ ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই একজন আনসারী সর্বপ্রথম উঠে এসে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তারপর একের পর এক লোক এসে বায়আত গ্রহণ করতে লাগল, এরূপে সাধারণ বায়আত অনুষ্ঠান শেষ হল। তারপর তিনি তার তাবুতে আসলেন, পূর্ব হতেই তাঁর জন্য সুলায়মানের গালিচা বিছানো ছিল, তিনি এ গালিচা উঠিয়ে একটি আরমানি বিছানা বিছিয়ে তাতে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি মুসলিম জনতার দায়িত্ব গ্রহণ না করতাম তবে তোমার উপর বসতাম না।

এ আরমানি বিছানাটি খুবই নিম্নমানের ছিল বলেই তিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন, তা না হলে তিনি তা পছন্দ করতেন না।

ইবনুল জাওযির অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাঁর সামনে এসেছিল তার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে তিনি কেঁদে অস্থির হয়ে গেলেন, তাঁর চোখের পানিতে হাতের লাঠিটিও ভিজে গিয়েছিল। অবশেষে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে নিজের তরফ হতে দুশত দীনার এবং বায়তুল মাল হতে আর তিনশ দীনার প্রদান করলেন এবং তার জন্য পৃথকভাবে মাসিক দশ দীনার ভাতা ধার্য করে দিলেন।

তারপর তিনি তার বাসস্থানে আসলেন, তখন রাত অনেক হয়েছিল। কাজেই তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। পরের দিন সকালে সুলায়মানের বাসগৃহে চলে গেলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, সারা রাত ধরে সুলায়মানের পরিবারের লোকেরা শাহী আসবাবপত্র উল্টাপাল্টা করতে লাগল, অব্যবহৃত সুগন্ধি ব্যবহৃত বোতলে রাখল, নতুন কাপড় পরিধান করতে লাগল, যেন সেগুলোও

ব্যবহৃত দেখা যায়। তারা এসব করার কারণ হলো, পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল যে, যখন কোন খলিফার মৃত্যু হত তখন খলিফার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, সুগন্ধি ও অন্যান্য সামগ্রী তার সন্তানগণ অংশীদার হতো, আর যা অব্যবহৃত থাকত তা নতুন খলিফা লাভ করত।

পরের দিন সকালে সুলায়মানের পরিবারের লোকেরা ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে এ সমস্ত সামান-পত্র দেখিয়ে বলল, এগুলি তোমার আর এগুলি আমাদের। খলিফা এ কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বলল, সুলায়মান যে সব কাপড় পরিধান করেছেন, যে সব সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন সেগুলো তার সন্তানদের আর যেগুলি ব্যবহার করেননি সেগুলো আপনার।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ ব্যাখ্যা শুনে বললেন, এসব আমারও নয় তোমাদেরও নয়। এসব মুসলমানদের সম্পদ। তখন তার খাদেমকে বললেন, মুজাহিম এসব বায়তুল মালে জমা করে দাও।

এখন শুধু বাঁদীগণ অবশিষ্ট থাকল। এই সমস্ত বাঁদী তাঁর সামনে হাজির করা হল, এরা জীবিকার জন্য এ পেশা গ্রহণ করেছিল। তাদের প্রত্যেকের পরিচয়, বংশ, দেশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, এদের প্রত্যেককে তাদের পিতা-মাতার নিকট পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, মন্ত্রীগণ, পরিষদবর্গ এবং উমাইয়া বংশের লোকেরা এসব দেখে নিরাশ হয়ে পড়ল, তারা বুঝল যে, তিনি শুধু ইনসাফ তথা ন্যায় বিচারকেই বেছে নিবেন। তিনি কোন অন্যায়-অবিচার প্রশ্রয় দিবেন না।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজের জুলুম প্রতিরোধ

ইসলামী জীবনবিধান তথা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কেবল সে সমস্ত লোকই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় এবং যারা সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতে পছন্দ করে এবং সমকালীন সাধারণ মানুষ যে স্তরে থাকবে তারা সেই স্তরেই থাকবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, অবশ্যই অবগত আছেন যে, মহানবী (সা) নিজে তাঁর কর্মময় জীবনে এর বহু দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। ইবনে সা'দসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বদাই নিজের দলের অভাবী লোকদের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি সাধারণ মানুষ অনাহারে থাকত তিনিও অনাহারে থাকতেন। তিনি অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থান কোন দিক দিয়েই সাধারণ মানুষ হতে উচ্চস্তরে অবস্থান করতেন না। সাধারণ লোকেরা যা খেত, সাধারণ মানুষ যা পরিধান করত তিনিও তাই খেতেন ও পরতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করেছেন। তার ঘরের চার দেওয়াল ছিল মাটির, ছাদ ছিল খেজুর পত্র ও খড়ের, তাঁর ঘরে কোন খাট পালঙ্ক ছিল না। তিন দিন পর্যন্ত তার ঘরে চুলা জ্বলত না। জীবনে তিনি কখনও পেট ভরে আহার করেননি। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা) যিনি সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মিনী ছিলেন। তিনি কসম করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও খেজুর ও পানি অথবা রুটি ও পানি দিয়ে পেট ভরে আহার করেননি এবং তাঁর এ অভ্যাস মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল।

হযরত আবু বকর (রা) খেলাফতের আসন অলংকৃত করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত অনুসরণ করে জীবন যাপন করেছেন। যাদের উপর শাসন করার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনিও তাদের কাতারে এসে যোগদান করেছিলেন। তিনি তাঁর সোয়া দুই বছর খেলাফতের সময়ে কখনও সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনের চেয়ে নিজের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেননি। সাধারণ মানুষ যা খেত, পরিধান করত তিনিও সেরূপ খাওয়া পরা করতেন, সাধারণ মানুষ যেস্থানে বসবাস করত তিনিও সেরূপ স্থানে বসবাস করতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর যুগ অত্যন্ত প্রাচুর্য্য ও সুখ-সমৃদ্ধির যুগ ছিল। তাঁর যুগে মানুষের জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে উন্নীত হয়েছিল। কোন মুসলামানই তখন অনাহারে ও বস্ত্রাভাবে জীবন যাপন করেনি। সকলেই দুই বেলার খাওয়া এবং সাধারণভাবে পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে পারত। এজন্য হযরত ওমর (র) তার পূর্ববর্তী বুজর্গদের মত অনাহারে থাকতেন না,

তিনি তিন দিন পর্যন্ত উপবাস করতেন না, বস্ত্রহীনও থাকতেন না এবং মুক্ত আকাশের নীচেও শয়ন করতেন না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বসাধারণের মতই জীবন অতিবাহিত করেছেন। মোটা আটার রুটি খেতেন, তৈল, সিরকা এবং শুকনো গোশত ছিল তাঁর সাধারণ খাদ্য। তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে বেশ কয়টি তালি থাকত।

যদিও তিনি ভাতা রেজিষ্ট্রারের তালিকায় ৩৯ ক্রমিক নম্বরের অধিকারী ছিলেন। যদিও তিনি বদরী সাহাবীদের মত ভাতা গ্রহণ করতেন তথাপি তার জীবন যাপন প্রণালী ছিল সাধারণ মানুষের মত।

হযরত আলী (রা)-এর জীবনও সাধারণ মানুষের জীবনের মত অনাড়ম্বর ছিল। তিনি যে কাপড় পরিধান করতেন তার মূল্য চার দেরহামের বেশি ছিল না। তিনি যে খাদ্য খেতেন তার চাকর-বাকররাও তা পছন্দ করত না। তিনি সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত খলিফা হওয়ার ফলেই তার ভাল খাদ্য ও ভাল পোষাক পরিধান করার কোন অধিকার আছে বলে তিনি মনে করতেন না।

তিনি যে পোষাক পরিধান করতেন তা দেখে কোন অপরিচিত লোক তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারত না। একবার কোন এক আমীর তাকে দীন মজুর মনে করে তার মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী, হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) এ চার মহাপুরুষের জীবনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ চারজনের কেউই কোন দিক দিয়ে নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত মনে করতেন না এবং নিজেদের সন্তান বা পরিজনের প্রয়োজনকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিতেন না।

এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (র) একটি স্পষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) পানি উঠাতে উঠাতে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট একজন দাসীর জন্য আবেদন করেছিলেন। দেয়ার মত দাসীও ছিল তবুও মহানবী (সা) তার আবেদন গ্রহণ করে বললেন, কোন আনসারী স্ত্রী আমার নিকট দাসীর জন্য আবেদন করেছিল, তাদের প্রয়োজন তোমার পূর্বে পূরণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) যে ক্ষেত্রে তার প্রাণপ্রিয় কন্যার প্রয়োজনকে আনসারদের স্ত্রীদের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেননি। সেক্ষেত্রে তারই স্থলাভিষিক্ত হযরত আবু বকর, ওমর ফারুক, উসমান যিন্নুরাইন ও আলী (রা) কখনও নিজেদের প্রয়োজনকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেননি। যদি তারা এমন কিছু করতেন তাহলে ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তারা সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে পারতেন না।

আমাদের দাবী হলো, একমাত্র ইসলামই এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা সাধারণ মানুষের উপর বিশিষ্ট লোকদের কখনও প্রাধান্য দেয় না। ইসলামমের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণও ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ বাস্তবায়নের পর তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত মনে করেননি এবং তাঁদের পরও যারা ইসলামের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরাও তাঁদের নিজেদেরকে অথবা তাদের সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনকে কোন দিক দিয়েই প্রাধান্য দেননি।

তাঁদের ধারণায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল আল্লাহপাকের তরফ হতে একটি পবিত্র আমানত। আল্লাহর রসূল (সা) এবং তাঁর সুযোগ্য খলীফাগণ রাষ্ট্রীয় ধন ভান্ডারকে সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ মনে করতেন। তাঁরা নিজেদেরকে সে ধন ভান্ডারের একজন বিশ্বস্ত সংরক্ষণকারী মনে করতেন। তাঁরা এমন চরিত্রবান ছিলেন যে, তাদের কোন প্রকার খেয়ানত সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। একজন সাধারণ নাগরিক সে কোষাগার হতে যেটুকু পাবার অধিকারী ছিল তারাও তার চেয়ে এর অতিরিক্ত কিছু পাবার অধিকারী ছিলেন না।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে উবাইদের বর্ণনা মতে, রসূলুল্লাহ (সা) শাসনকর্তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পুরণ করার মত অর্থই শুধুমাত্র তাদেরকে কোষাগার হতে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এর অতিরিক্ত এক পয়সা নেয়া তাঁর মতে খিয়ানতের শামিল ছিল।

আমানত ও খিয়ানতের এ ধারণা ইসলামের একটি মৌলিক ধারণা। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতের পরেই এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে শক্তি প্রয়োগ করে খেলাফত লাভ করেছিলেন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত

ছিলেন না বলেই সরকারী কোষাগারকে সর্বসাধারণের সম্পদ হিসেবে মনে না করে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করেছিলেন। কোষাগার থেকে তিনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করতেন। বিলুপ্ত হয়ে যায় । হয়তো উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক যাকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তার বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রচেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি আমীর মুযাবিয়া (রা)-এর চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তার সন্তান সন্ততি বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং পরিবার পরিজনদের জন্য সরকারী কোষাগার হতে যথেচ্ছাভাবে ব্যয় করেছেন। রাজ্যের আমদানী হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন। তিনি বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, খাটপালঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন, রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং সর্বসাধারণের ধন-ভান্ডারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করেই তা থেকে খরচ করেছেন।

বাস্তবিক পক্ষে এটাই কি ইসলামের বিধান ছিল? না কখনই এটা ইসলামের বিধান ছিল না। তিনি নিজেও তো উপলব্ধি করতেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শের সামনে নিজেকে জওয়াবদিহী করতে হবে এ কথা ভাবতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ ইবনে কাছীর আব্দুল মালেক সম্পর্কে ইবনুল আরাবীর নিম্ন ভাষ্যটি বর্ণনা করেছেন।

لَمَّا سُلِّمَ عَبْدُ الْمَالِكِ بِالْخِلَافَةِ كَانَ فِىْ حُجْرِهِ مُصْحَفٌ فَاطْبَقَهُ وَقَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ

অর্থাৎ আব্দুল মালেক যখন খলীফা মনোনীত হলেন তখন তার নিকট একখানা কোরআন শরীফ ছিল। তিনি তাকে বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এটাই আমার ও তোমার শেষ বিদায়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে–

هٰذَا اٰخِرُ الْعَهْدِ مِنْكَ ـ

অর্থাৎ এটাই তোমার শেষ সাক্ষাত।

আব্দুল মালেক খেলাফতের আসন গ্রহণ করার পূর্বেই আল্লাহর কিতাবের সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল। অথচ ইবনে কাছীরের বর্ণনা মতে, খলীফা হবার পূর্বে

যখন আব্দুল মালেক মদীনায় অবস্থান করতেন তখন তিনি আল্লাহভীরুতা ও সংযম শীলতার কারণে মদীনার বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ইবনে জুবাইর শহীদ হবার পর আব্দুল মালেক হজ্জের সময় এক সাধারণ ভাষণে বলেছিলেন যে, আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণ নিজেরা খেতেন, অপরকে খাওয়াতেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি একমাত্র তরবারীর সাহায্যে এ উম্মতের রোগের চিকিৎসা করব।

ইবনে কাছীর স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল মালেক একজন রক্ত পিপাসু বাদশাহ ছিলেন। তিনি অগণিত লোককে হত্যা করেছিলেন। তারই প্রতিনিধি হাজ্জাজ অনর্থক লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল।

আব্দুল মালেক ও তার প্রতিনিধি হাজ্জাজ এ দুজন যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন-তার সম্পদ কেড়ে নিতেন এবং তাকে হত্যাও করা হতো, আর তারা দু'জন যার প্রতি সন্তুষ্ট হতেন তাকে সরকারী ধনভান্ডার খুলে দিতেন।

এখন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের সামনে দু'টি মাত্র পথই খোলা ছিল। হয়তো তিনি তাঁর পূববর্তীদের অনুসরণ করবেন অথবা আল্লাহর রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করবেন।

তিনি আল্লাহর রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পথকে বেছে নিলেন এবং আব্দুল মালেকসহ অন্যান্য শাসকগণ যে সমস্ত অন্যায় অবিচার, জুলুম করেছিল তিনি সেই সবের প্রতিকার বিধান করলেন। তিনি নিজ হস্তে এর সূচনা করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দের বর্ণনায় জানা যায় যে, ইবনে সুহাইল বলেছেন, আমি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে তার ঘর হতে জুলুম প্রতিরোধ ও সংস্কারের সূচনা করতে দেখেছি। সর্বপ্রথম তিনি নিজের পরিবারের লোকদের জুলুম অত্যাচার প্রতিরোধ করে অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আবু বকর ইবনে বুসরা বলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন জুলুম অত্যাচার প্রতিরোধ ও লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ ফেরত দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, সর্বপ্রথম আমার নিজের পক্ষ থেকেই শুরু করা উচিত। সুতরাং তিনি নিজের অধিকারভুক্ত ধন-সম্পদের হিসাব

করে তার কাছে স্থাবর-অস্থাবর যে সমস্ত ধন-সম্পদ ছিল তিনি তা মুসলমাগণকে ফেরত দিয়ে দিলেন, এমনিক ওয়ালিদ তার প্রাচ্যদেশীয় আমদানী থেকে তাকে একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন, তাও খুলে তিনি বাইতুলমালে জমা দিলেন।

ইবনে জাওযি বলেন, যে রাত্রিতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খেলাফতের মসনদে বসলেন সে রাতেই তার ঘর হতে ক্রন্দনের শব্দ পাওয়া গেল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, তিনি যখন তার বাঁদীগণকে অনুমতি দিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে থাকতে পারে, আর ইচ্ছা করলে চলেও যেতে পারে। কেননা আমি এমন এক দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করেছি যে, এরপর আমি আর তাদের প্রতি ফিরে তাকাতে সময় পাবনা। যে চায় আমি তাকে মুক্ত করে দিতে প্রস্তুত, আর যে চায় সে থাকতে পারে কিন্তু আমার সাথে কারও কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমার উপর কোন আশা ভরসাও করতে পারবে না।

একথা শুনে বাঁদীরা কাঁদতে লাগল।

ইবনে জাওযির অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি এবং ইবনে আবু যিকর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের বাড়ীর কাছে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তার ঘরের কান্নার আওয়াজ শুনে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, খলীফা তার স্ত্রীকে এ বলে অধিকার দিয়েছেন যে তুমি ইচ্ছা করলে এ ঘরে থাকতে পার, ইচ্ছা করলে তোমার পিত্রালয়ে চলে যেতে পার। কারণ আমি যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি এরপর স্ত্রীলোকের প্রতি আমার সাধারণ আসক্তিটুকুও আর নেই।

এ কথা শুনে খলীফার স্ত্রী ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং তাঁর ক্রন্দনের ফলে তার বাঁদীরাও ক্রন্দন করতে লাগল।

এ ভদ্র মহিলাই দোর্দন্ড ও প্রতাপশালী খলীফা আব্দুল মালেকের সর্বাধিক প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী দু'জন খলীফা ওয়ালিদ ও সুলায়মানের ভগ্নি ছিলেন। তিনি যে ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করেছেন সে যুগে আর কারও ভাগ্যে জুটেনি।

ইবনে জাওযি এ রাতের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজের স্ত্রী ফাতেমার একটি সুন্দরী দাসী ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে খুব ভাল বাসতেন। খলীফা হবার পূর্বে তিনি স্ত্রী ফাতেমার নিকট বহুবার এ দাসীটি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তার এ ব্যর্থতা দাসীর প্রতি তাঁর আকর্ষণকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। তারপর তিনি যখন খলীফা মনোনীত হলেন তখন ফাতেমা তাকে বললেন, আমি সে দাসীটি আপনাকে দান করে দিলাম। এতে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ফাতেমাকে বললেন, তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। ফাতেমা তাকে খুব ভালরূপে সজ্জিত করে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ওমর ইবনে আজিজ তাকে দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি দাসীকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এক কর্মচারীর উপর জরিমানা করে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল, আমিও তার অন্তুর্ভূক্ত ছিলাম। তারপর হাজ্জাজ আমাকে খলীফা আব্দুল মালেকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁর স্নেহাধিক কন্যা ফাতেমাকে দান করলেন।

এই ঘটনা শুনে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খুব ব্যথিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হাজ্জাজ যে কর্মচারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছিল সে কী জীবিত আছে? দাসী বলল, উক্ত কর্মচারী মারা গিয়েছে তবে তার সন্তানগণ জীবিত আছে । হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উক্ত দাসীকে বিদায় করে দিয়ে কুফার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠালেন যে, অমুকের পুত্রকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তারপর সে ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট এসে উপস্থিত হল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার পিতার বাজেয়াপ্ত সমস্ত সম্পত্তির সাথে এ দাসীটিও ফেরত দিলেন। ইবনুল জাওযি আরও বলেন যে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই দাসীর মহব্বত তার অন্তরে একটা স্থান দখল করে রেখেছিল কিন্তু এরপর তিনি আর কখনও এই দাসীর সাথে সাক্ষাত করেননি ।

ইবনে কাছীরের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার ব্যক্তিগত যে সব সম্পত্তি কোষাগারে জমা দিয়েছিলেন তন্মধ্যে

৭ –

ফাদাকের বাগানটিও ছিল। তিনি বিশিষ্ট লোকদের এক সভায় ফাদাকের বাগানটি জমা দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন, ফাদাক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মতই তার আমদানী ব্যয় করতেন। তারপর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) এরূপ করেছেন। কিন্তু মারওয়ান ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে তা দখল করে ভোগ করেছিল এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একাংশ আমিও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ওয়ালিদ এবং সুলায়মানও তাদের অংশ আমাকে দান করেছেন। কাজেই আমি আমার সেসব সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে ফেরত দিচ্ছি তার চেয়ে অপবিত্র আর কোন সম্পত্তি নেই। আমি যা বায়তুলমালে জমা দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে এটা ব্যয় করতেন এটা সেভাবেই ব্যয় করা হবে।

অপর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ শুধু স্থাবর সম্পত্তি ও নগদ অর্থই বায়তুলমালে জমা দেননি, তিনি তাঁর স্ত্রীর মূল্যবান অলংকারাদী এবং পোষাকাদী পর্যন্ত বায়তুলমালে জমা দিয়েছেন।

ইবনুল কাছীর বলেন, তিনি খেলাফতের পদ লাভ করার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক চল্লিশ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা। এ সবই তিনি বায়তুলমালে জমা দিয়েছেন, অথচ তার অনেক সন্তানাদী ছিল, কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন এবং এক স্ত্রী তো ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাহজাদী।

এভাবে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ শুরু করলেন এবং নিজবংশের সমস্ত জবর দখলকৃত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সরকারী কোষাগারে জমা দিলেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত প্রাদেশিক শাসককর্তাগণকে লিখলেন যে, আমার পূর্বে যে স্থানেই কোন জুলুম অত্যাচার করে মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে তা তাদেরকে ফেরত দেয়া হোক।

ইবনে সা'দ ইবনে যুহাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন তাঁর নিজের ও নিজের বংশের ধন-সম্পদের হিসাব-নিকাশ করে তাদের অপবিত্র সম্পত্তি বায়তুলমালে জমা দিলেন তখন ওয়ালিদের এক পুত্র তার বংশের লোকদের বললেন, তোমরা ওমর ইবনে খাত্তাবের বংশের একজন লোককে খলীফা মনোনীত করেছ অতএব তিনিও তাঁর মতই করছেন।"

উদ্দেশ্যে ছিল যে, ওমর ফারুকের সন্তানগণ তাদের পূর্ব পুরুষের নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করবেন না। আমরাও ইতিপূর্বে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের বাল্যজীবন বর্ণনার সময় তাঁর কথা লিখেছি যে, তিনি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর নিকট হতে তার মাতার নিকট ফিরে আসতেন তখন বলতেন, "মা, আমিও আপনার চাচার মত হতে চাই"। তিনি খলীফা মনোনীত হবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পুত্র সালেমের নিকট এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।

ইবনে কাছীর বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহকে বলেন যে, আমার জন্য ওমর চরিত রচনা করুন, আমি সে অনুযায়ী কার্য্যক্রম চালাব। সালেম বলেন, আপনি পারবেন না। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন আপনি সেটা কিভাবে বুঝলেন? সালেম কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে বললেন, যদি আপনি সে অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে হযরত ওমর (রা) কেও হারিয়ে দিবেন, তাঁর চেয়েও উত্তম আদর্শ সৃষ্টি করতে পারবেন। কারণ তার যুগে সৎকর্মে সহযোগিতাকারী লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু আপনার কোন সাহায্যকারী নেই।

সালেম যদিও সত্য কথা বলেছিলেন যে, সৎকর্মে তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই কাজেই তিনিও হযরত ওমর (রা) হতে পারবেন না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি হযরত ওমর (রা)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফলে তিনি বিশ্বে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে অমর হয়ে রয়েছেন।

ইবনে সা'দ বলেন, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর পর হতে জনগণের প্রতি বনু উমাইয়াদের যে সমস্ত অন্যায় অবিচার চলে আসছিল হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সেগুলোর সংস্কার সাধন করলেন এবং সে যুগ হতে যে সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে আসছিল, তাও তিনি ফেরত দিলেন। অর্থাৎ বনু উমাইয়ার লোকেরা অন্যায়ভাবে যে সমস্ত ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিল অথবা পূর্ববর্তী খলীফাগণ মুসলমান জনসাধারণের সম্পদ হতে তাদেরকে যা দান করেছিল ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সেসব মুসলমানদের ফেরত দিয়েছিলেন।

ইবনে কাছীরের ভাষ্যটি হলো–

مَا زَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ مِنْ لَدُنْ مُعَاوِيَةَ (رض)
اِلٰى اَنْ اُسْتَخْلِفَ اَخْرَجَ اَيْدِىَ وَرَثَةِ مُعَاوِيَةَ (رض)

অর্থাৎ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পর হতে তার যুগ সৃষ্ট সকল প্রকার অবিচারের সংস্কার সাধন করলেন। এমনকি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা লুণ্ঠিত জনসাধারণের সকল অধিকার আদায় করে দিলেন।

দামেশক ছাড়াও মক্কা, মদীনা, ইয়ামেন, তায়েফ, ইরাক এবং মিশরের যে সব স্থানে লুণ্ঠিত সম্পদ জমাকৃত ছিল তা হিসেব অনুযায়ী নিজ নিজ মালিককে ফেরত দেয়ার জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) সাধারণ আদেশ জারী করলেন।

আয়্যুব সুখতিয়ানী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) অন্যায় ভাবে অর্জিত ও লুণ্ঠিত সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা করে দিলেন এবং বায়তুলমালে যে সমস্ত অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ অথবা লুণ্ঠিত সম্পদ ছিল তাও তিনি তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে কয় বছর সে মাল বায়তুলমালে জমা ছিল সে কয় বছরের যাকাত রেখে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ নির্দেশ সংশোধন করে শুধু চলতি বছরের যাকাত রেখে দিতে নির্দেশ দিলেন।

আবু জুনাদ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) ইরাকের অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করতে আমাদেরকে আদেশ দিলেন, তার এই আদেশ কার্যকরী করতে গিয়ে প্রকৃত হকদারের হক আদায় করতে করতে বায়তুলমাল খালি হয়ে গেল। অতঃপর প্রশাসনিক ব্যয় বহন করার মত আর কোন অর্থই বায়তুলমালে থাকল না, সুতরাং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সিরিয়া হতে ইরাকে অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।

আবু জুনাদ আরও বলেন যে, সত্ত্বাধিকারীদের সত্ব ফিরিয়ে দিতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সাক্ষ্য প্রমাণের কড়াকড়ি করলেন না, বরং নিপীড়িত জনতার নিপীড়ন প্রতিরোধ পথ সহজ করে দিলেন। তিনি

নিপীড়নের কারণ অবগত হলেই তার লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দিতেন তাকে অকাট্য প্রমাণাদী সংগ্রহ করতে বলতেন না।

ইবনে হাজম বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদেরকে লিখে পাঠালেন যে, "আমি যেন কোষাগারের হিসাব করে তার পূর্বে প্রত্যেক মুসলামান ও জিম্মিদের সম্পদের পরিসংখ্যান করি এবং যদি কোন মুসলমান বা কোন জিম্মির প্রতি কোন অন্যায় করা হয়ে থাকে তবে আমি যেন তার ক্ষতি পূরণ ফিরিয়ে দেই। যদি নির্যাতিত ব্যক্তি ইন্তেকাল করে থাকে তবে তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।"

ইবনে সা'দ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে হাজমকে এবং তৎকালীন সবচেয়ে বড় বড় ফকীহগণকে লিখেছেন যে, তাদেরকে মানুষের কাছে গিয়ে অভিযোগ শুনতে বলেন। কেউ যদি সে উমাইয়্যা বংশেরও হয়, তবুও যেন তারা তাকে কোন প্রকার ছাড় না দেন এবং হিসাব নিকাশের সময় যেন খলীফার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যেহেতু ঝগড়ার সময় তারা অধিক শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ নিজেও এ মূলনীতি সামনে রেখেই কাজ করেছিলেন। ইবনুল জাওযি বলেন, একবার কয়েকজন গ্রাম্যলোক এসে তার আদালতে অভিযোগ করল যে, ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক তার খেলাফতের সময় তার এক টুকরা জমি কেড়ে নিয়ে খলিফার পরিবারের লোককে দিয়েছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার এ দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বললে সে বলল এটা একটি অনাবাদি ভূমি ছিল, আমিই সর্বপ্রথম এটা আবাদ করেছি। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই ফরমান স্মরণ হয়ে গেল–

اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ مَنْ اَحْيَاءَ اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ জমি আল্লাহর, বান্দাও আল্লাহর, অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে সে ঐ ভূমির মালিক হবে।

সুতরাং মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গ্রাম্য লোকটির দাবী মেনে নিলেন।

ইবনুল জাওযি বলেন, খলিফা সুলাইমানের দাফন কার্য শেষ করে শাহী প্রাসাদে এসেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জুলুম অবিচার প্রতিরোধ শুরু করে দিলেন। তিনি সমস্ত পর্দা, গালিচাসহ সকল আসবাবপত্র বিক্রয় করে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বায়তুলমালে জমা দিলেন।

ইবনুল জাওযির অপর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, সুলায়মানের দাফন শেষ করে পরবর্তী দিন হতেই তিনি জুলুম অত্যাচার প্রতিরোধ করতে শুরু করে দিলেন। ফজরের নামাযের পূর্বেই তিনি ঘোষক ওয়াবেককে শহরের অলিগলিতে এ বলে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, যার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অবিচার করা হয়েছে সে যেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে এসে তার আবেদন পেশ করে।

এ ঘোষণা শুনে সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে অভিযোগ পেশ করেছিল হেমসের অধিবাসী একজন অমুসলিম জিম্মি। সে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে এসে আবেদন করল যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমার অভিযোগের ফসয়সালা করুন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার অভিযোগ জানতে চাইলে সে বলল, আব্বাছ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক তার এক টুকরা জমি জবরদস্তিমূলক দখল করে নিয়েছিল। আব্বাছও সেস্থানেই উপস্থিত ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আব্বাছকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? আব্বাছ বলল, খলিফা ওয়ালীদ আমাকে এ সম্পত্তি দান করে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যিম্মিকে জিজ্ঞেস করলে সে তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল। সুতরাং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার দাবী মেনে নিয়ে আব্বাছকে তার জমি ফেরত দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন জুলুম প্রতিরোধ শুরু করলেন তখনও জোহরের সময় হয়নি। তিনি সমস্ত লোককে মসজিদে একত্রিত করে তাদের সামনে মুজাহিমকে তাঁর নিজের সম্পত্তির দলীল সমূহ এক এক করে পাঠ করতে বললেন। ইবনুল জাওযি বলেন, মুজাহিম এক একটি দলীল পাঠ করত আর হযরত ওমর

ইবনে আব্দুল আজিজ নিজের হাতে প্রত্যেকটি দলীল কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতেন। এত হলো দলীল দস্তাবিজের কথা। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের নিকট খুব মূল্যবান একটি মতি ছিল। তার পিতা আব্দুল মালেক এটা তাকে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ফাতেমার নিকট এ মতিটি চেয়ে বললেন, তুমি দু'টি বিষয়ের একটি বেছে লও। হয়তো এ মতি বাইতুল মালে জমা দাও আর না হয় আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি তোমা হতে পৃথক হয়ে যাই। কারণ এ মতি থাকা অবস্থায় তোমার সাথে একই ঘরে অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ফাতেমা নিবেদন করলেন, আমি মতির চেয়ে আপনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। এক একটি মতি কেন? এরূপ যদি হাজার মতি আমার থাকত তবুও আমি আপনাকেই প্রাধান্য দিতাম। অতএব হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মতি এনে বাইতুলমালে জমা করে দিলেন।

ইবনুল জাওযি একটি দীর্ঘ ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এখনও জুলুম প্রতিরোধের কাজ শুরু করেননি। সূচনাতেই তিনি তার প্রধান উপদেষ্টা ও ব্যক্তিগত খাদেম মুজাহিমকে বললেন যে, পূর্ববর্তী খলিফাগণ আমাকে এমন কিছু সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন-প্রকৃত পক্ষে আমি সে সবের মালিক নই এবং সেসব দান গ্রহণ করাও আমার পক্ষে উচিত নয়। এখন যেহেতু আমি খলিফা কাজেই সে সমস্ত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করা প্রয়োজন। এতে মুজাহিম তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল এবং সে তাকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার সন্তানদের কি উপায় হবে? তিনি বললেন, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। একথা মুজাহিমের মনোপুত হল না, সে তার পুত্র আব্দুল মালেকের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আব্দুল মালেক পিতার কাছে এসে বললেন, আপনি যা সংকল্প করেছেন, যথা শীঘ্র সম্ভব তা বাস্তবায়ন করুন। আপনি আমাদের জন্য কোন চিন্তাই করবেন না। দীনের কাজে বিলম্ব করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার পুত্র আব্দুল মালেকের এ কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তার

কপালে চুম্বন করলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে এমন সৎ সন্তান দান করেছেন এজন্যে তিনি তাঁর শুকরিয়া আদায় করলেন।

খলিফা সুলায়মান মৃত্যুর পূর্বে গাসবা ইবনে সায়াদ ইবনে আছকে বিশ হাজার দীনার দান করে একটি দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এ দানপত্র বিভিন্ন দপ্তর অতিক্রম করে কোষাধ্যক্ষের নিকট এসে সীলমোহর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গাসবার হাতে পৌছার পূর্বেই সুলাইমান ইন্তেকাল করলেন।

সুলায়মানের দাফনের পর দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফতের প্রথম দিন গাসবা তাঁর নিকট আসল, তখন উমাইয়া বংশের সকলেই ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে সমবেত ছিল। উমাইয়া বংশের লোকেরা গাসবাকে দেখে ভাবল যে, গাসবা খলিফার পরম বন্ধু। দেখা যাক খলিফা তার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে। তারপর তাঁর সঙ্গে তারা নিজেদের ব্যাপারে কথা বলবে।

তাদের সামনেই গাসবা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কক্ষে প্রবেশ করল এবং বলল জনাব, খলীফা সুলায়মান আমাকে কিছু দীনার দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশ কোষাগারে এসে পৌছেছে। আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে আমি অবশ্য আশা পোষণ করি যে, আপনি তা বরাদ্দকৃত দীনার দেওয়ার নির্দেশ দিবেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা? গাসবা বলল, বিশ হাজার দীনার। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, বিশ হাজার দীনারতো চার হাজার মুসলমান পরিবারের জন্যই যথেষ্ট। এটা তোমাকে দেয়া কিভাবে সম্ভব? এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আমি একজনকে কিভাবে দেব? আল্লাহর কসম! এটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

গাসবা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের উত্তর শুনে রাগে শাহী দানপত্র মাটিতে ছুড়ে মারল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, দানপত্র নষ্ট না করে যত্নের সাথে রেখ। হয়তো আমার পর এমন কেউ আসবে যে এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে। গাসবা অতিযত্নে সেই দানপত্রটি রেখে দিল। আর যেহেতু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের

পক্ষে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল কাজেই তাকে খোঁচা দিয়ে বলল, হুজুর এইত কথা হল, কিন্তু "জাবালুল ওয়ারস" সম্পর্কে আপনি কি করবেন? হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের জাবালুল ওয়ারস নামে একটি বড় জায়গীর ছিল। তিনি এ কথা শুনে গাসবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, তুমি আমাকে খোচা দিচ্ছ।

তারপর তিনি তার ছেলেকে ডেকে দলীল-দস্তাবেজ আনতে নির্দেশ দিলেন। পুত্র সিন্দুক এনে হাজির করল। তিনি জাবালুল ওয়ারসের দলীলসহ সমস্ত দলীল দস্তাবেজ ছিড়ে ফেললেন। গাসবা এ দৃশ্য দেখে বাইরে অবস্থানরত উমাইয়া বংশের লোকদেরকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তারা গাসবাকে অনুরোধ করল যে, তুমি ভিতরে গিয়ে আমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে অনুমতি এনে দাও। গাসবা ফিরে গিয়ে উমাইয়াদের পক্ষে আপনার বংশের লোকেরা বলছে যে, আপনার পূর্বে তাদেরকে যে ভাতা প্রদান করা হতো তা যথারীতি আদায় করতে নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে বাধিত করুন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, আল্লাহর কসম! এটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং আমি এমন করতে পারব না। তখন গাসবা বলল, তবে আপনি তাদেরকে অন্য কোথায়ও চলে যেতে অনুমতি দিন। তারা জীবিকার জন্য কোন উপায় বের করে নিক।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তারা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে, আমার পক্ষ হতে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন নেই। তারপর গাসবা আবার বলল, তবে আমাকেও অনুমতি দিন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তুমিও যেতে পার। তবে আমি মনে করি তুমি একজন সম্পদশালী লোক, তুমি এখানে থাকলে ভালই হত, কারণ আমি সুলায়মানের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেব। তুমি ইচ্ছা করলে তা হতে এমন কিছু জিনিস পত্র ক্রয় করতে পার যা পরে বিক্রয় করলে লাভবান হবে। অতঃপর গাসবা সেখানেই অবস্থান করল এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সুলায়মানের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করার সময় গাসবা এক লক্ষ দীনারের মাল ক্রয় করে ইরাকে নিয়ে গিয়ে দুই লক্ষ দীনার বিক্রয় করল।

ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে যে শাহী ফরমান জারী হয়নি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট তা একেবারে মূল্যহীন ছিল।

ইবনে হাকাম তার পূর্বেকার নিবর্তনমুলক শাহী ফরমানের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধার আরোও একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের" রুহ্ নামক একটি ছেলে ছিল। গ্রামে লালিত পালিত হওয়ার ফলে তাকে গ্রাম্য বলেই মনে করা হত। কিছু লোক হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট এসে অভিযোগ করল যে, হেমছের সরাইখানা ওয়ালিদ ইবনে মালেক তার পুত্র রুহ্কে প্রদান করেছিলেন। এখনও রুহ্ সেগুলো দখল করে ভোগ করে চলছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রুহ্কে এ সমস্ত সরাইখানা প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রুহ্ আবেদন করল যে, ওয়ালিদ এ সব সরাইখানা আমাকে যে দানপত্র লিখে দিয়েছেন তা এখনও আমার নিকট আছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, ওয়ালিদ লিখিত দানপত্র তোমার কোন উপকারেই আসবে না। কারণ এ সমস্ত সরাইখানা যে তাদের, এ সম্পর্কে তারা প্রয়োজনীয় স্বাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন রুহ্ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ নির্দেশকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে হেমছের অধিবাসীদের সরাইখানা ফেরত দিতে অস্বীকার করল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এ ঘটনা জানতে পেরে শহররক্ষী প্রধান কাবকে বললেন যে, তুমি এখনই রুহের নিকট চলে যাবে, যদি রুহ সরাইখানার দখল ছেড়ে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিয়ে থাকে তবে তো ভালই, অন্যথায় তুমি তার শিরচ্ছেদ করবে। ঘটনাক্রমে উক্ত মজলিসের এক ব্যক্তি হেমছে গিয়ে রুহকে এই সংবাদ অবহিত করল। অতঃপর কাব যখন তার নিকট উন্মুক্ত তরবারী হাতে উপস্থিত হল, এর পূর্বেই সে সমস্ত সরাইখানা ফেরত দিয়ে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের প্রতিশোধ হতে আত্মরক্ষা করল।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, রুহ ছিল ওয়ালীদের পুত্র এবং ওয়ালিদও তার পূর্বে একজন পরাক্রমশালী খলীফা এবং তার পরম আত্মীয় ছিলেন। তবুও সত্য এবং ন্যায়ের খাতিরে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের কোন মূল্যই দিলেন না। ইবনে হাকাম বলেছেন যে, রুহের মত উমাইয়া বংশের আরো কিছু কিছু লোক হযরত

ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সংস্কারের পাল্লায় পড়েছিল এবং তিনি তাদের নিকট হতে বে-আইনি দখলকৃত সত্তর হাজার দীনার আদায় করে বাইতুল মালে জমা দিয়েছিলেন।

ইবনে হাকাম এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তী খলীফাগণ বনু উমাইয়ার লোকদের জন্য যেসব ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাও বন্ধ করে দিলেন এবং তার এক ফুফুর ভাতাও বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর এ ফুফু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য এক রাতে তাঁর স্ত্রী ফাতেমার নিকট আগমন করলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ শাহী কাজ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর পুত্র এসে ঘর থেকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রদীপ নিয়ে গেল। ফাতেমা বললেন, তিনি এ মাত্র শাহী কাজ কর্ম হতে অবসর হয়েছেন, ছেলে এসে তার ব্যক্তিগত প্রদীপ নিয়ে গিয়েছে। আপনি ভিতরে এসে অপেক্ষা করুন। অতঃপর তাঁর ফুফু ভিতরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর দেখলেন, তিনি যে ঘরে এসে আহার করতে বসেছেন তার সামনে দু' টুকরো রুটি, একটু লবণ ও সামান্য তৈল ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। ফুফু খাদ্যের এ আয়োজন দেখে বললেন, এসেছিলাম নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু কথা বলতে কিন্তু এখন দেখি তোমার সম্পর্কেই আমার প্রথম কথা বলতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খাদ্যের সমালোচনা করে বললেন, তুমি কি এর চেয়ে উন্নত মানের আহার্য গ্রহণ করতে পার না? তখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, "আমার শ্রদ্ধেয় ফুফু আম্মা! এর চেয়ে উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণ করার মত অবস্থা যে আমার নেই। যদি আমার সামর্থ থাকত তবে নিশ্চয়ই আপনার কথা পালন করার চেষ্টা করতাম।"

তারপর ফুফু আলোচনা শুরু করে বললেন, "তোমার চাচা আব্দুল মালেক জীবিতকালে আমার জন্য অনেক ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁরপর তোমার ভাই ওয়ালীদ তা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল এবং সুলায়মানও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল কিন্তু তুমি খলীফা হয়ে আমার সে ভাতা বন্ধ করে দিলে?"

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, ফুফুজান! আমার চাচা আব্দুল মালেক এবং আমার ভাই ওয়ালিদ ও সুলায়মান আপনাকে সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ হতে আপনার ভাতা বরাদ্দ করেছিল। এসব সম্পদ তো আমার নয়। আমি শুধু আমার সম্পদই আপনাকে দিতে পারি, যদি আপনি সুখী হন। ফুফু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ সম্পদ আছে? তিনি বললেন, আমার বার্ষিক আমদানী দু'শত দীনার, আপনি তা গ্রহণ করুন। ফুফু বললেন, এতে আমার কোন উপকার হবে না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তা ছাড়া যে আমার কাছে আর কিছু নেই! তাঁর ফুফু এ কথা শুনে ফিরে গেলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মোটেই অসত্য কথা বলেননি। তার বার্ষিক আমদানী ছাড়া তাঁর অন্য কোন সম্পদ ছিল না। অথচ তিনি খলীফা হবার পূর্বে মিকিদাস, জাবালুল ওয়ারস এবং ফাদাকের মত জায়গীর ছাড়াও ইয়ামামাতেও কয়েকটি জায়গীর ছিল। তিনি খলীফা মনোনীত হবার পর দ্বিতীয় দিন এ সমস্ত সম্পদ বাইতুলমালে জমা দিয়েছেন। তাঁর অধিনে ছিল একমাত্র সুয়াইদা নামক একটি ঝরণা তা হতেই তিনি বার্ষিক ১৫০ দীনার মূল্যের শষ্য পেতেন।

ইবনে জাওযি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের এ ফুফুই একবার তাঁর বংশের পক্ষ হতে সুপারিশ করার জন্য তাঁর নিকট আসলেন। তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট বনু উমাইয়ার লোকদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ হলো, তুমি তাদের রুজি কেড়ে নিয়েছ অথচ তুমি তা তাদেরকে প্রদান করনি। অন্যরা তাদেরকে এসব প্রদান করেছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জবাব দিলেন, সত্য ও ন্যায় যা ছিল আমি তা করেছি। তারপর তিনি একটি দীনার, একটি অঙ্গার দানি ও এক টুকরা মাংস আনতে বললেন এবং অঙ্গার দানিতে সে দীনারটি গরম করলেন। যখন তা খুবই গরম হয়ে গেল, তখন সেটা গোস্তের টুকরার উপর রেখে দিলেন। ফলে গোস্তের টুকরাটি যখন পুড়ে গেল তখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর ফুফুকে বললেন, ফুফুজান! আপনি কি আপনার

ভাতিজাকে এরূপ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান না? তাঁর ফুফু লজ্জিত হয়ে বনু উমাইয়ার লোকদের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমরা ওমর ইবনে খাত্তাবের ঘরে বিবাহও করবে অথচ তার মত সন্তান হলেও চিৎকার করবে। এখন তোমরা মজা বুঝ।

ইবনুল জাওযি বলেন গাসবা একবার ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট এসে আবেদন করল, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমার জন্য যে ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন, আপনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার পরিবার পরিজনের জন্য সম্পদের প্রয়োজন আছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার জমিতে গিয়ে চাষাবাদ করে পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারি। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, চলে যাও। সে যখন দরজায় উপস্থিত হল তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, যদি জীবিকা সংকীর্ণ হয় তবে মৃত্যুকে অধিক মনে করবে এতে জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর যদি জীবিকা প্রয়োজনের চেয়ে প্রশস্ত হয় তবুও মৃত্যুর কথা মনে করবে এতে জীবিকা কিছুটা সংকীর্ণ মনে হয়ে আসবে।

সুলায়মানের এক পুত্র হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট অভিযোগ করলেন, তার যে ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ সম্পত্তির পক্ষে তার নিকট দলীল আছে। সে ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে সেই দলীলটি দেখাল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্বে এই সম্পত্তি কার ছিল? সে বলল, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তবে তো এটা হাজ্জাজই পাবে। সে তোমার চেয়ে বেশি হকদার। সুলায়মানের পুত্র কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, না এটা হাজ্জাজের ছিল না। এটা বাইতুল মালের ছিল। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তবে মুসলমানগণই এর বেশি হকদার।

এই অধিকার প্রশ্নেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের বংশের সমস্ত লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এ সব লোক প্রত্যেক দিন তাঁর নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করত এবং তাদের দখলকৃত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করতে তাঁকে পরামর্শ দিত।

একবার আব্দুল মালেকের সব চেয়ে অহংকারী পুত্র হিশাম যে বনু উমাইয়ার শাহজাদার মধ্যে নিজেকে খেলাফতের সবচেয়ে বেশি হকদার মনে করত, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট তার বংশের পক্ষে মধ্যস্থতা করতে এসে একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে তাঁকে পরামর্শ দিল। সে বলল, আমার বংশের লোকেরা বলে, যে পর্যন্ত আপনার খেলাফতের সম্পর্ক তা আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার পূর্ববর্তী খলিফাগণ যা করে গিয়েছেন, আপনি সেটা সে ভাবেই ছেড়ে দিন। এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবেন না।

যদি অন্য কোন রাজনীতিবিদ হত এবং ন্যায়নিষ্ঠ না হয়ে রাজনীতি প্রিয় হত তবে অবশ্যই এ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। ফলে তার বংশের লোকেরাও খুশী হত এবং তাঁর উপর কোন প্রকার অসন্তুষ্টও হত না। কিন্তু যেহেতু নিজেকে রক্ষা করা বা বংশের লোকদের খুশী করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল শুধু ন্যায় ও সুবিচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা– যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তার দায়িত্বের উপরও কোন প্রকার অভিযোগ না ওঠে। এ জন্য তিনি হিশামকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমার নিকট এরূপ দু'টি ফরমান আনা হয় একটি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর লিখিত এবং অপরটি আব্দুল মালেক লিখিত এবং উভয় ফরমান একই বিষয় সম্পর্কীত হয়, তবে তুমি আমাকে কোন ফরমান অনুযায়ী কাজ করতে পরামর্শ দিবে? হিশাম বলল, পূর্বেরটির। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, তবে আমি ঠিকই করেছি। কারণ আমিও আল্লাহর কিতাবকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। যে সব বিষয় আমার নিকট বলছ তা আমার যুগেরই হোক অথবা আমার পূর্বের যুগেরই হোক আমি তাতে আল্লাহর কিতাবের পরেই স্থান দিব।

হযরত ওসমান (রা) এর পৌত্র সায়ীদ ইবনে খালিদ উমাইয়া বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব বিনয়ের সাথে হিশামের সমর্থন করে বলছিলেন যে, আমিরুল মুমিনীন! আপনার যুগের বিষয় সমূহেরই ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর থাকুন, আপনার জন্য কল্যাণকর হবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সায়ীদকে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমরা সকলেই তাঁর নিকট ফিরে

যাব। মনে কর, এক ব্যক্তি কয়েকটি ছোট বড় ছেলে রেখে ইন্তেকাল করল। বড় ছেলেরা তার শক্তিতে ছোটদেরকে নির্যাতন করে তাদের ধন সম্পদ আত্মসাত করতে লাগল, আর তোমার নিকট ছোট ছেলেরা এসে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করল, এখন তুমি কি করবে? খালেদ বলল, 'সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আমি বড়দের নিকট থেকে ছোটদের হক আদায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, আমিও দেখছি যে, আমার পূর্ববর্তী শাসকগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, এমনকি তাদের অধীনস্থ লোকেরাও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই জনগণকে নির্যাতন করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অতএব আমার কাছে ক্ষমতা আসার পর সবল হতে দুর্বলের অধিকার আদায় করে দেয়া ছাড়া আমি অন্য কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যথার্থই বলেছিলেন, মূলতঃ এরূপই হয়েছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর স্থলাভিষিক্ত শাসকগণ বিশেষতঃ খলিফা আব্দুল মালেক এবং তার উত্তরাধিকারীগণ সাধারণ নাগরিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাদের উত্তম ফসলোপযোগী জমিসহ অন্যান্য সহায় সম্পদ জোর করে দখল করেছিলেন। তারা সম্পূর্ণ ইরানী যুবরাজদের মতই জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ নাগরিক ও তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। মনে হত তারা যেন আকাশ হতেই জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং বাকী সব লোক মাটি থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা স্বর্ণ রৌপ্য খচিত গদীতে আরাম করতেন, স্বর্ণের বাসনে খাদ্য খেতেন, রেশমী কাপড় পরিধান করতেন। তাদের কারও আস্তাবলে সুন্দর ঘোড়ার অভাব ছিল না। তাদের প্রাসাদ রঙধনুর মত উজ্জ্বল ঝলমলে ছিল। তাদের অন্তঃপুরে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী মহিলাগণকে দাসী হিসেবে আনা হত এবং তাদের সাথে আনন্দ উপভোগকে শুধু শরিয়ত সম্মতই মনে করত না বরং গৌরব বলেই মনে করত।

ইবনুল জাওযি বলেন, একবার যুদ্ধক্ষেত্র হতে কয়েকজন সুন্দরী যুদ্ধবন্দিনী ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সামনে আনা হল। যখনই কোন সুন্দরী মহিলাকে তার সামনে আনা হত তখনই ওয়ালিদের পুত্র আব্বাছ

মুখে পানি উঠিয়ে বলত, আমিরুল মুমিনীন! আপনি স্বয়ং একে গ্রহণ করুন। এ কথা সে বার বার বলতে লাগল। এতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি কি আমাকে ব্যাভিচার করার জন্য বলছ।

আব্বাছ যেরূপ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, সে অনুযায়ী এটা ব্যাভিচার ছিল না। তার পিতা, তার চাচা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের অন্তঃপুরে এরূপ দাসীর অভাব ছিল না। সেও ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে সে কথাই বলেছিল– যা তার পিতা, তার দাদা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে করতে দেখেছে। কাজেই ওমর ইবনে আবদুল আজিজের এ কথায় তার মনে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। সে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ঘর হতে বের হয়ে গেল এবং দরজায় অবস্থানরত তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলল, তোমরা এ লোকের দরজায় এসে বসেছ, সেতো তোমাদের বাপ-দাদাকে ব্যাভিচারী বলছে।

আসলে এটা তার বাপ-দাদাকে ব্যাভিচারী মনে করার কথা নয়, প্রকৃতপক্ষে ইয়াযিদ হতে শুরু করে খলিফা সুলায়মান পর্যন্ত উমাইয়া বংশীয় যুবরাজগণ সম্পূর্ণরূপেই শরিয়ত বিরোধী জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিল। তারা সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। তাদের জীপনযাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপেই ইসলামের পরিপন্থী ছিল।

ইসলাম এ জন্য আবির্ভূত হয়নি যে, কোন মানুষ অপর কোন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, আমীর লোকেরা অন্তঃপুরে হাজারও সুন্দরী রমণী রেখে ভোগ বিলাস করবে আর সর্বসাধারণের সহায় সম্পদ জোর করে নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। অপরদিকে সাধারণ মানুষ ক্ষুধা দারিদ্রের কবলে নিষ্পেষিত হয়ে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করবে।

আল্লাহর কিতাব এবং মহানবীর (স) জীবনাদর্শ এরূপ জীবন উপভোগের অনুমতি দান করেনি বলেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ দাসী ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন।

যা হোক, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন খালেদকে এসব কথা বললেন, তখন সে নির্বাক হয়ে গেল এবং অবশেষে বলল, আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।

খালেদ অবশ্যই চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে সৎকর্ম করার জন্যে দোয়া করেই বিদায় হলেন। কিন্তু ওয়ালিদের পুত্র শাহী জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল, সে কঠোর ভাষায় ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে তিরস্কার করে তাঁকে একটি পত্র লিখল। 'তুমি তোমার পূর্ববর্তী খলিফাদের দোষ-ত্রুটি খোঁজ করছ, তাদের উপর অভিযোগ দাঁড় করছ। তুমি তাদের প্রতি ও তাদের সন্তানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন পথ অবলম্বন করছ। তুমি কোরাইশ বংশীয় লোকদের ও তাদের ধন-সম্পদের উপর জুলুম করে অন্যায়ভাবে তা বাইতুল মালে জমা করে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপাক যাদের সাথে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করেছ।

হে আব্দুল আজিজের পুত্র! আল্লাহকে ভয় কর। তুমি জালিম, এ মসনদে তুমি তৃপ্তি লাভ করতে পারছ না। তুমি তোমার অন্তরের দুর্বার আগুন নিভাবার জন্যই নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার শুরু করেছ।

আল্লাহর কসম! যিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছিলেন, তুমি তোমার শাসনের সামান্য সময়ের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর নবী (সা)-এর পথ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছ। অথচ তোমার এ শাসন আমলকে তুমি একটি পরীক্ষা মনে করছ। তোমার উপরও একজন পরাক্রমশালীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। তুমি তাঁর শক্তি অতিক্রম করতে পারবে না এবং তিনি তোমার এসব জুলুম-অত্যাচারকেও ক্ষমা করবেন না।

এ ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে যে সব জুলুম-অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা কি বাস্তবিকই জুলুম অত্যাচার ছিল? তা শুধু এ ছিল যে, তিনি তার নিকট হতে এবং তার আত্মীয় -স্বজনদের নিকট হতে মুসলমানদের অধিকার আদায় করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। স্বয়ং জালিমগণ অবিচারকে সুবিচার আর সুবিচারকে অবিচার বলে মনে করেছিল।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খুব উত্তম ও সঠিকভাবেই তার উত্তর লিখেছিলেন যে, "তুমি মনে কর যে, আমি জালিম-অত্যাচারী। কারণ আমি তোমাকে ও তোমার আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহপাকের সে সমস্ত

৮—

সম্পদের অংশ দিতে রাজী নই যা কেবল আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও বিধবাদের জন্যই নির্ধারিত ছিল।

তুমি আমার উপর এ অভিযোগ আনার সময় ভুলে গেলে কেন আমার চেয়েও বড় জালিম সে ব্যক্তি যে, তোমার মত একটি নির্বোধকে শুধু পিতৃ স্নেহেই একটি বিরাট মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেছিল, আর তুমি যথেচ্ছাভাবে মুসলিম বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করেছিলে। তোমার এ নিয়োগের পশ্চাতে পিতৃস্নেহ বৈ আর কোন কারণ ছিল কি? না আর কোন কারণ ছিল না।

আফসোস! তোমার ও তোমার পিতার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন কত লোক যে অভিযোগ করবে, সে দিন তোমরা কিভাবে এ অভিযোগকারীদের থেকে আত্মরক্ষা করবে, তা ভেবে অস্থির হই।

আমার চেয়ে বহু গুণ বেশি জালিম সেই ব্যক্তি, যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফীর মত নরাধমকে আরবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিল। এই হাজ্জাজ বিনা কারণে মুসলমানদের হত্যা করত এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিত।

আমার চেয়েও বহু গুণ বেশি জালিম সে ব্যক্তি, যে কুরয়া ইবনে শুরাইকের মত চরিত্রহীন, অসভ্য ও মুর্খকে মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেছিল এবং তাকে প্রকাশ্যভাবে অনর্থক খেলাধুলা, মদ্যপানসহ সকল প্রকার অন্যায় অপকর্মের অনুমতি দিয়েছিল। আমার চেয়েও শতগুণ জালিম এবং আল্লাহর আইন লঙ্ঘনকারী সে ব্যক্তি, যে আলিয়া বারবারিয়াকে মুসলমানদের সম্পদের অংশীদার করে দিয়েছিল। যদি আমি পর্যাপ্ত সময় পেতাম তবে আমি আল্লাহর সম্পদ এবং মুসলমানদের অধিকার পূর্ণভাবে তোমাদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতাম এবং তোমার ও তোমার বংশের সকল গর্বই খর্ব করে দিতাম। দীর্ঘ দিন যাবত তোমরা সাধারণ নাগরিকদের সম্পদ লুণ্ঠন করে খাচ্ছ। আল্লাহর কসম! এখন যদি তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে বিক্রয় করে দেয়া হয় এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বঞ্চিত, বিধবা, ইয়াতিম ও দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তবুও তোমাদের কৃত জুলুম-অত্যাচারের ক্ষতি আদায় হবে না।

আমরা জানিনা, ইবনে ওয়ালিদ এই পত্র পেয়ে তা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছিল কি না। তবে সত্য কথা হলো, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ওয়ালিদের পুত্রকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করেননি।

কুররা ইবনে শুরাইক এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বনু উমাইয়ার ললাটে দু'টি কলঙ্কের ছাপ ছিল। এই দু' জালিমের একজন মিশরে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিল, অপর জন ইরাকে রক্তের নদী প্রবাহিত করেছিল। বিশেষতঃ হাজ্জাজ ছিল সে যুগের হালাকু খাঁ। পার্থক্য ছিল শুধু এ যে, হালাকু খাঁ ছিল অমুসলিম আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিল মুসলমান এবং নিজেকে হাফিজে কুরআন দাবী করত। হালাকু খাঁর অপরাধ ক্ষমাযোগ্য কিন্তু হাজ্জাজের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। এ হাজ্জাজই উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিল। তিনি মৃত্যুর সময় তার পুত্র ওয়ালিদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, হাজ্জাজই তোমাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সবসময় তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে, কাউকেও তার উপর প্রাধান্য দিবে না।

ইবনে খালকান বলেন, বাস্তবিকই হাজ্জাজ সমকালীন যুগে বিশিষ্ট বাগ্মী ও পবিত্র কোরআনের হাফিজ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ হাফিজে কোরআনই আব্দুল মালেকের রাজত্বকে সুসংহত করতে কাবা শরীফের উপর পাথর নিক্ষেপ করতেও সংকোচবোধ করেনি। এ জালিম শাসক পবিত্র কাবার চার দেওয়ালের ভিতরে রক্তনদী বহাতেও তার বিবেক দংশন করেনি। সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) ও তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল যারা মহানবী (সা)-এর পবিত্র চেহারা হতে নূর গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। যে হযরত আনাস (রা) যিনি একাধারে দীর্ঘ দশ বৎসর মহানবী (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন, তার উপর কঠোরতা করত এবং তাকে অপদস্ত করতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি। এ পাপিষ্ঠ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-এর মত বিশিষ্ট যুগশ্রেষ্ঠ সাহাবীর লাশ মুবারক চল্লিশ দিন পর্যন্ত শূলিতে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

এ পাপিষ্ঠ কা'বা শরীফের উপর পাথর নিক্ষেপ এবং সাহাবীগণের সন্তানগণকে হত্যা করেও এই অপরাধের জন্য জীবনে কোন দিন অনুতপ্ত হয়নি

এবং লজ্জিত হয়নি। সে কুফার লোকগণকে অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল। অনেক নিরপরাধ জ্ঞানী গুণী মানুষকে হত্যা করেছিল, শুধু এ অপরাধে যে, তাঁরা আব্দুল মালেককে ন্যায় হিসেবে মানতে পারেননি। সে বিনাদ্বিধায় মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুট করেছিল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং নিষ্পাপ মানুষের রক্ত দিয়ে আল্লাহর জমিনকে রঙ্গীন করে তুলেছিল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব

যারা পরের প্রতি হিসাব-নিকাশের বেলায় কঠোর-ইতিহাসে এরূপ শাসকদের উদাহরণ যথেষ্ট থাকলেও নিজেদের হিসেব নিকেশের বেলায় আরোও অধিক কঠোর এরূপ শাসনকর্তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

এদিক বিবেচনা করলে ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অন্যের সম্পদের উপর হিসেবের কঠোরতা করার আগে নিজের সম্পদের পর্যালোচনা ও পরিসংখ্যান করেছিলেন।

ইবনে সাদ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা মনোনীত হবার পর তার সম্পত্তির পরিসংখ্যান করলেন। তাঁর নিকট যে সমস্ত দাস দাসী, বস্ত্র, সুগন্ধি এবং এ জাতীয় আরো যে সব অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছিল, তিনি সে সব বিক্রি করে বিক্রি লব্ধ ত্রিশ হাজার দীনার আল্লাহর পথে দান করে দিলেন এবং তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের স্তরে নেমে আসলেন। সুয়াইদা ব্যতিত তাঁর আর কোন সম্পত্তি ছিলনা। এ সুয়াইদা হতে তিনি বার্ষিক দেড়শত দীনার মূল্যের ফসল পেতেন। এটা ছিল তাঁর একমাত্র আমদানী এবং এ আমদানী দিয়েই তাঁর সংসার চলত।

আব্দুল ফরিদের ভাষ্যকার বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বায়তুল মাল হতে কোন অর্থই গ্রহণ করতেন না এমনকি রাজস্ব হতেও না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে একবার বলা হল যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাজস্ব খাত হতে দৈনিক দুই দেরহাম গ্রহণ করতেন, আপনি অন্ততঃ সেই পরিমাণই গ্রহণ করুন, তিনি যে পরিমাণ গ্রহণ করতেন। তিনি বললেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর কোন সম্পদ ছিল না, কিন্তু আমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ আছে। সুতরাং আমি কেন গ্রহণ করব?

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বায়তুল মাল অথবা জনগণের ধন-ভান্ডার হতে অর্থ গ্রহণ করাকে খুবই অন্যায় মনে করতেন। তিনি খুব অনাড়ম্বর ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তবুও বায়তুল মালের উপর সামান্য বোঝা চাপিয়ে দেওয়াও পছন্দ করতেন না। এমনকি যদি কোন সময় সামান্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হত তবুও তিনি তা বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করতেন না। ইবনুল জাওযি এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি স্ত্রী ফাতেমার নিকট এসে বললেন, আমার আঙ্গুর খেতে খুব ইচ্ছা হয়েছে, তোমার নিকট কি একটি দেরহাম আছে? ফাতেমা অবাক হয়ে বললেন, আপনি এত বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা, আপনি একটি দেরহামেরও ব্যবস্থা করতে পারেন না?

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, খিয়ানতের অপরাধে ধৃত হয়ে জাহান্নামের বেড়ী পরিধান করার চেয়ে এই অবস্থাকেই ভাল মনে করি।

অন্য কথায় বায়তুল মাল হতে সামান্য অর্থ গ্রহণ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মতে দোযখের পথ প্রশস্ত করা মনে হতো। তাঁর সততা-সাধুতা এতই দৃঢ় ছিল যে, কঠিন প্রয়োজনের মুহূর্তেও তিনি বায়তুল মাল হতে কোন অর্থই গ্রহণ করতেন না।

ইবনুল জাওযি বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়লেন, অথচ বায়তুল মালে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী মওজুদ ছিল, কিন্তু তিনি সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না।

তিনি ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, তোমাদের নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? ঘরে কয়টি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁকে সেই খেজুর দেয়া হলে তিনি তা খেয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তার পেটে আগুন ভরে আল্লাহপাক তাকে তার নিকট হতে দূর করে দেন।

তিনি কখনও তার পেটে এ আগুন ভরতেন না। তাঁর আমদানী খুবই সামান্য ছিল, তার ও তার পরিজনের প্রয়োজন মিটাবার মত অর্থ আয় হত না। কাজেই অধিকাংশ সময়ই তাঁর ঘরে ভাল কোন খাদ্য-দ্রব্য তৈরি হত না। সাধারণত তিনি পিঁয়াজ ও তেল দিয়েই রুটি খেতেন।

ইবনুল জাওযি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এক ভৃত্য আবু উমাইয়ার কথা বর্ণনা করে বললেন যে, ভৃত্য জুমার সময় তার মনিব পত্নীর নিকট আসলে তিনি তাকে পিঁয়াজ দিয়ে রুটি খেতে দিলেন। সে প্রতিবাদ করে বলল, প্রত্যেক দিন পিঁয়াজ! আর পিঁয়াজ! আর ভাল লাগে না ! মনিব পত্নি বললেন বৎস! এটা যে, তোমার মনিবের খাদ্য।

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তার মনিবের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা। বায়তুল মালের উপর যাতে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি না হয়, এ উদ্দেশ্যেই তিনি এ খাদ্য বেছে নিয়েছিলেন। মুসলমানদের বায়তুল মাল ছিল তাঁর নিকট নিষিদ্ধ খাদ্যের মত। এমন কি কোন সময় যদি সরকারী ডাক যোগে কোন জিনিস তাঁর নিকট আসত, তিনি তাও গ্রহণ করতেন না।

ইবনুল জাওযি উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করেন, একবার তার বন্ধু আম্মারা ইবনে নাসী সরকারী ডাকের মাধ্যমে কিছু খেজুর পাঠাল। যে ব্যক্তি খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আসল তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খেজুর কিভাবে বহন করে এনেছ? সে বলল, ঘোড়ার ডাক যোগে আনা হয়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, এগুলি বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দাও। সে ব্যক্তি খেজুরের ঝুড়ি নিয়ে বাজারে আসলে একজন উমাইয়া বংশীয় লোক সে খেজুরের ঝুড়ি ক্রয় করে অবিকল সেরূপেই খলিফার নিকট হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিল। খলিফা তা দেখে বললেন, এটা যে সেই খেজুরই! অতঃপর সে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি তা তার খাদেমদেরকে খেতে দিলেন এবং অবশিষ্ট যা ছিল, তিনি তা তাঁর কোন এক স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এবং নিজে তার মূল্য বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন।

এরূপ একটি ঘটনা আরো একবার ঘটেছিল। একবার তিনি বললেন, লেবানন বা সীজের মধু হলে খুব ভাল হত। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা তার এ আকাংখার কথা জানতে পেরে তার খাদেমকে পাঠিয়ে লেবাননের গর্ভণর ইবনে মাদিকারাবকে এ সম্পর্কে জানালেন। ইবনে মাদিকারাব প্রচুর মধু পাঠিয়ে দিলেন। এ মধু ফাতিমার নিকট এসে পৌছলে তিনি তা খলিফার সামনে হাজির করলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সমস্ত বিষয় জানতে পেরে সমস্ত মধু বাজারে পাঠিয়ে বিক্রি করে দিলেন এবং তার মূল্য

বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। তারপর তিনি ইবনে মাদিকারাবকে লিখলেন যে, যদি ফাতেমার কথায় আর কখনও মধু পাঠাও তবে আমি আর কখনও তোমার মুখ দেখব না এবং তোমার দ্বারা কোন খেদমতও গ্রহণ করব না।

এ ধরনের আরও একটি ঘটনার কথা জানা যায়, একদিন তিনি তার স্ত্রীর নিকট মধু খেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার স্ত্রীর নিকট মধু ছিল না। কিছুক্ষণ পর তিনি খলিফার নিকট মধু পাঠিয়ে দিলেন তিনি মধু খেয়ে খুবই তৃপ্ত হলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এ মধু কোথা হতে এনেছ?

তার স্ত্রী বললেন, আমার নিকট দু'টি দেরহাম ছিল তা দিয়ে সরকারী বাহনে একটি খাদেমকে পাঠিয়ে এ মধু বাজার থেকে ক্রয় করে এনেছি। তিনি মধুর বাসনটি আনালেন এবং স্ত্রীকে মধুর মূল্য দিয়ে বললেন, ওমরের প্রবৃত্তি দমনের জন্য সরকারী ঘোড়া ব্যবহার করা তোমার উচিত হয়নি। তখন সে মধু বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিলেন।

একবার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর আপেল আসল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ গরীবদের মধ্যে সে আপেল বিতরণ করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর একটি ছোট ছেলে এসে আপেলের স্তুপ থেকে একটি আপেল নিয়ে খেতে লাগল। তিনি এটা দেখে তার হাত থেকে আপেলটি কেড়ে নিলেন। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের নিকট চলে গেল। তার মা বাজার থেকে আপেল খরিদ করিয়ে এনে তাকে শান্তনা দিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ঘরে এসে আপেলের ঘ্রাণ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বায়তুলমালের আপেলের অংশ পেয়েছ? তার স্ত্রী বললেন না, ছেলে কাঁদতেছিল দেখে আমি বাজার থেকে ক্রয় করে এনেছি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমি ছেলের হাত থেকে আপেলটি কেড়ে নিলাম, তখন মনে হলো, যেন আমার কলিজাটি চিড়ে ফেললাম। কিন্তু আল্লাহর সামনে মুসলমানদের একটি আপেলের জন্য অপমানিত হওয়াটা আমার কাছে খুবই খারাপ মনে হল।

বাস্তবিক পক্ষে যে কোন মুল্যের বিনিময়ে তিনি এ অপদস্ততা পছন্দ করতেন না। ইবনুল জাওযি বলেন, তিনি বায়তুল মালের সম্পদের ব্যাপারে এতই কঠোরতা অবলম্বন করতেন যে, একদিন প্রচণ্ড শীতের সময় জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করার জন্য খাদেমগণকে পানি গরম করতে বললেন। খাদেমগণ বলল যে, জ্বালানী নেই, কি দিয়ে পানি গরম করব? তারপর তারা সরকারী রন্ধনশালা থেকে পানি গরম করে আনল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলেছিলে জ্বালানী নেই তবে এখন কিভাবে পানি গরম করেছো? খাদেমগণ পানি গরম করার ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রন্ধন শালার প্রধানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি তোমাকে বলেছিল এটা খলিফার পানির পাত্র, গরম করে দাও। রন্ধন শালার প্রধান বলল, আল্লাহর শপথ! এ পানি গরম করতে আমি এক টুকরো জ্বালানী ব্যবহার করিনি। খাদ্য পাকাবার পর চুল্লিতে অঙ্গর জ্বলছিল যদি তা ছেড়ে দিতাম তবুও নিভে যেত এবং ভষ্ম হত।

এরূপ কারণ দর্শাবার পরও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, জ্বালানীর মূল্য কত ছিল? সে জ্বালানীর মূল্য বলল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে জ্বালানীর মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র আলেম, ফাজেল ও অন্যান্য গরীব লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন মেহমানগণ দস্তরখানে বসে খাদ্য খেতে অস্বীকার করলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন, তারা বলল, আপনি আমাদের সাথে না খেলে আমরা খাব না। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদের সাথে খাদ্য খেতে বাধ্য হলেন এবং তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে দৈনিক দু দেরহাম বায়তুল মালে জমা করে দিতে আদেশ দিলেন। তারপর হতে তিনি প্রত্যেক দিন মেহমানদের সাথে মিলে খাদ্য খেতেন।

হযরত ওমর লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁর পরিবারের লোকগণকে সর্তক করে দিয়ে বললেন, সাবধান! কেউ যেন কখনও লঙ্গরখানা হতে কোন জিনিস চেয়ে না আনে। কারণ এ সমস্ত গরীব মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।

ইবনে সাদ বলেন, একদিন হযরত ওমর বললেন, তাঁর দাসীকে একটি আবৃত দুধের পাত্র উঠাতে দেখে বললেন, এটা কার জন্য এবং কোথা হতে এনেছ? দাসী বলল, আপনার এক বেগম অন্তঃসত্ত্বা, তিনি দুধ খেতে চেয়েছিলেন, আর গর্ভবতী রমণী কোন কিছু খেতে চাইলে তার আশা পূর্ণ করতে হয়, অন্যথায় গর্ভস্থিত সন্তান নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই আমি এক পিয়ালা দুধ দারুল ফুকরা হতে চেয়ে এনেছি। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ দাসীকে হাত ধরে টেনে নিতে লাগলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, যদি গরীব মিসকিনদের জন্য নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী না খেলে তার গর্ভ ঠিক না থাকে, তবে আল্লাহ যেন তা নষ্টই করে দেন। একথা বলতে বলতে তিনি দাসীকে টেনে স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, এ দাসী বলে যে, তুমি নাকি গরীব-মিসকীনদের জন্য রক্ষিত খাদ্য না খেলে তোমার গর্ভ ঠিক থাকবে না, আমি দোয়া করি, যদি এরূপই হয় তবে এ গর্ভ যেন নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের স্ত্রী তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে দাসীকে তিরস্কার করলেন এবং দুধপাত্রটি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ইবনে সাদ আরও বলেন, রন্ধন শালায় দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত তাঁর জন্য অজুর পানি গরম করা হচ্ছিল কিন্তু তিনি তা জানতে পারেননি। তারপর যখন তিনি তা জানতে পারলেন, তখন খাদেমদের বললেন, তোমরা কত দিন যাবত এখানে পানি গরম করছ? খাদেমগণ বলল, এক মাস যাবত পানি গরম করছি। তখন তিনি সে পরিমাণ জ্বালানী কাঠ রন্ধন শালায় পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

উবাইদ ইবনে ওয়ালিদ বলেন, যদি ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাতে সরকারী কাজ করতেন তখন তিনি বায়তুল মালের বাতি ব্যবহার করতেন আর যদি ব্যক্তিগত কাজ করতেন তখন ব্যক্তিগত বাতি ব্যবহার করতেন।

এ বর্ণনাকারীই বলেন যে, একবার কাজ করতে করতে বাতির তৈল শেষ হয়ে গেল। তিনি বাতির তৈল ভরতে উঠলেন। তার নিকট উপবিষ্ট লোকেরা বলল, আমরাও তো এ কাজটুকু করে দিতে পারি! কিন্তু ওমর রাজি হলেন না নিজেই বাতির তৈল ভরে এনে বললেন, আমি পূর্বেও যে ওমর ছিলাম এখনও সেই ওমরই আছি।

তিনি বায়তুল মালের সম্পদের এতই গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি যখন কোন সরকারী কাগজে সরকারী ফরমান লিখতেন তখনও তিনি সরু কলম দ্বারা ছোট অক্ষর দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে ফরমান লিখতেন।

ইবনে সাদের ভাষ্যটি এই– তাঁর লিখা চিঠিপত্র খুবই সংক্ষিপ্ত হত তার চিঠিপত্র মাত্র চারটি লাইন থাকত।

হযরত ওমর বায়তুলমাল অথবা লঙ্গরখানার কোন আসবাব দ্বারা নিজে উপকৃত হতে খুবই ঘৃণা বোধ করতেন। যদি খাদেমগণ কোন সময় তাড়াহুড়ার দরুন লঙ্গরখানার চুলায় তাঁর কোন খাদ্য পাকিয়ে আনত হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তা খেতেন না।

ইবনুল জওযি, আল হাকাম ইবনে ওমরের একটি ভাষ্য বর্ণনা করেছেন। ভাষ্যকার বলেন যে, একবার আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাঁর এক খাদেমকে গোশত ভেজে আনতে নির্দেশ দিলেন। উক্ত খাদেম খুব তাড়াতাড়িই গোশত ভেজে নিয়ে আসল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার দ্রুতগতি দেখে বললেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছ। সে বলল, জি হা, বাবুর্চিখানা হতে ভেজে এনেছি। তিনি খাদেমকে বললেন, তবে এখন তুমিই এটা খেয়ে ফেল। তোমার জন্যই তুমি এ খাদ্য তৈরি করেছ আমার জন্য নয়।

তিনি বাড়ীতে বসবাস করার সময় যেরূপ সর্তকতা অবলম্বন করতেন প্রবাসেও ঠিক সেরূপই করতেন। তিনি যখন কোন সরকারী সফরে বের হতেন তখন সরকারী অর্থে নির্মিত কোন ঘরে অর্থাৎ কোন সরাইখানা বা কোন বাংলোতে অবস্থান করতেন না, বরং তিনি স্বীয় তাবুতে থাকতেন নিজের খাদ্য খেতেন কোন লোকের দাওয়াত বা কারও প্রেরিত খাদ্য খেতেন না। তিনি কারও কোন হাদীয়া গ্রহণ করতেন না। তাঁর মনে এসমস্ত ঘুষ বা উৎকোচ হিসেবে বিবেচিত হত।

হাদীয়া বা উপঢৌকন সম্পর্কে ইবনুল জওযি মুহারিবের বরাত দিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত ওমর ইবনে আজিজ আপেল খেতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তাঁর বংশের একটি লোক এটা

জানতে পেরে তাঁর জন্য কিছু আপেল ক্রয় করে হাদীয় পাঠিয়ে দিলেন। এই আপেল যখন তাঁর নিকট উপস্থিত করা হল তখন তিনি আপেল হাতে নিয়ে বললেন, কত সুন্দর! কত সুগন্ধি! এটা দাতার নিকট নিয়ে গিয়ে তাকে আমার সালাম দিয়ে বল, তোমার হাদীয়া আমার অন্তরের সেই স্থানই দখল করেছে, যা তুমি কামনা করছ।

মুহারিব বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমিরুল মুমেনিন! সেত আপনারই চাচাত ভাই, আপনার বংশের লোক! এছাড়া আপনি অবশ্যই জানেন যে, মহানবী (সাঃ) হাদীয়ার বস্তু খেতেন, যদিও তিনি ছাদকা গ্রহণ করতেন না।

হযরত ওমর ইবনে আজিজ বললেন, তোমার জন্য আফসুস হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য হাদীয়া প্রকৃতই হাদীয়া ছিল, কিন্তু এখনকার সময়ে এটা আমাদের জন্য সরাসরি উৎকোচ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এতো হল তাঁর চাচাত ভাইয়ের ঘটনা। এরূপ ঘটনা তার এক সফরের সময়ও ঘটেছিল। তিনি এক সফরে ছিলেন তাঁর সঙ্গে ফুরাত ইবনে মুসলিমও ছিল। এ সময়ও তিনি আপেল খেতে আকাঙখা প্রকাশ করলেন। তাঁর বাহন অগ্রসর হতে লাগল, দেখা গেল যে, কিছু লোক আপেলের ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে। হযরত ওমর ইবনে আজিজ তাঁর সওয়ারীকে আপেল বহনকারীদের একজনের নিকটবর্তী করে একটি আপেল তুলে নিলেন এবং তা ঘ্রাণ শুকে সেটা যথাস্থানে রেখেদিলেন এবং বললেন, তোমরা স্বগৃহে চলে যাও। সাবধান, তোমাদের কেহ যেন আমার কোন লোককে কোন বস্তু হাদীয়া না দেয়।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার খচ্চরকে তাড়া করে হযরত ওমর ইবনে আজিজের নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম, হযরত! আপনি আপেল খেতে চেয়েছেন, আমরা তা তালাশ করেছি কিন্তু পাইনি। এ আপেল আপনার নিকট হাদীয়া হিসেবে এসেছে, আর আপনি তা এভাবে ফিরিয়ে দিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) ওমর ফারুক (রাঃ) জন্য হাদীয়া হাদীয়াই হত কিন্তু তাদের পরবর্তী শাসকদের জন্য তা হাদীয়া নয় বরং সরাসরি উৎকোচ।

হযরত ওমর ইবনে আজিজ (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) জন্য যে সব লোক হাদীয়া পাঠাতেন তাদের অন্তরে লোভ লালসার লেশমাত্রও থাকত না এবং হাদীয়া সেসব পবিত্রাত্মা মনীষীদের উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করত না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের যুগে সাধারণ মানুষের নৈতিকমান এতই নীচে নেমে এসেছিল যে কর্মচারীগণ কথায় কথায় ঘুষ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করত না। বিশেষতঃ খলিফা ও তার ঘরে হাদীয়া উপঢৌকনের পাহাড় জমে উঠত। ঈদ উৎসব নববর্ষ ইত্যাদি দিবসে খলিফাগণ লাখ লাখ টাকা সালামী বা নযর নিয়াজ পেতেন।

আল-ইয়াকুবীর বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রাচীনকালে প্রজাগণ নওরোজ ও মেহেরজান দিবসে রাজার জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন প্রেরণ করত, বনু উমাইয়ার খলিফাদের যুগ হতে তা পুনরায় চালু হয় এবং এ কুসংস্কারটি খলিফা সুলায়মানের যুগ পর্যন্ত চালু ছিল। হযরত ওমর ইবনে আজিজ খলিফা হয়েই এ কুসংস্কার বন্ধ করে দিলেন এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে কোন প্রকার উপঢৌকন নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে এতই কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, সমস্ত কর্মচারীই সতর্ক হয়ে গেল। বায়তুলমাল হতে এক পয়সাও বেশী গ্রহণ করার মত সাহস কারও ছিল না। সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্যও হযরত ওমর ইবনে আজিজের নিকট তাদের আবেদন করে মঞ্জুরী গ্রহণ করতে হত। তাঁর অনুমতি ব্যতীত বায়তুল মাল হতে কেউ এক পয়সা খরচ করতে পারত না।

ইবনে হাজম হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে মদীনার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেছিলেন। ইবনে হাজম হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট আবেদন করলেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী শাসকগণ সরকারী খরচেই বাতি ব্যবহার করতেন, কাজেই আমাকেও সে ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হোক। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তার উত্তরে লিখলেন, ইবনে হাজম! আল্লাহর কসম! আমি তোমার সেই দিনও দেখেছি যখন শীতের গভীর অন্ধকার রাতে তুমি প্রদীপ ছাড়া বাইরে যাতায়াত

করতে। এখন তোমার অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল। তোমার ঘরে যে প্রদীপ আছে তাই যথেষ্ট, অন্য কোন প্রদীপের তোমার প্রয়োজন নেই।

এ ছাড়াও ইবনে হাজম একবার আবেদন করেছিলেন যে, তার পূর্ববর্তী শাসকগণ সরকারী তহবীল হতেই কাগজ-কলম ও কালির খরচ পেতেন, কাজেই তাকেও সরকারী পর্যায়ে এ সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক। এর উত্তরে তিনি লিখলেন যে, আমার এ চিঠি পাওয়া মাত্রই তোমার কলমের আগা সরু করে নিবে, শব্দ খুব ঘন করে লিখবে এবং অনেক কথা একই পত্রে লিখতে চেষ্টা করবে যাতে বায়তুল মালে কোন চাপ না পড়ে, কারণ এরূপ লম্বা চিঠিপত্র লেখায় জনসাধারণের কোনও উপকারে আসবে না।

উদাহরণ স্বরূপ এ দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো এ জন্য যে, হযরত ওমর ইবনে আজিজ শুধু নিজেই বায়তুলমাল হতে কিছু নিতে অপছন্দ করতেন না তা নয়, বরং প্রশাসনিক কাজে অন্যান্য কর্মচারীদের অপ্রয়োজনীয় খরচও তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অপ্রয়োজনীয় খরচের বোঝা বায়তুল মালের উপর দেয়া কোন মতেই জায়েয নেই। তিনি বায়তুল মালকে একটি পবিত্র আমানতে পরিণত করে দিয়েছিলেন। যদি কোন কর্মচারী কখনও কোন অর্থ নষ্ট করত তখন তিনি তাকে সেজন্যে গ্রেফতার করতেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম একটি উদাহরণ পেশ করে বলছেন যে, ইয়ামেনের গভর্ণর ওয়াহ্হাব ইবনে মুনতিয়া হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে জানালেন যে, বায়তুল মালের কিছু দীনার হারানো গিয়েছে। এর উত্তরে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যে, নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বর্তমান যুগের জনসাধারণ এবং শাসকদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। তিনি ওয়াহ্হাবকে লিখলেন–

لَسْتُ اَتَّهِمُ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَلٰكِنْ اَتَّهِمُ تَضْيِيْعَكَ وَتَفْرِيْطَكَ الاَ اَنَا حَجِيْجُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَا لِهِمْ وَاِنَّمَا لاَشْحَمُ يَمِيْنِكَ فَاَحْلُفْ لَهُمْ وَالسَّلَامُ -

অর্থাৎ আমি তোমার সততা ও আমানতদারীর উপর অভিযোগ করি না, তবে তোমার বাহুল্য ও অনর্থক খরচের জন্য আমি তোমাকে অভিযুক্ত

করছি। কারণ আমি জনসাধারণের সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। কাজেই এ ব্যাপারে সমস্ত লোক জমা করে তাদের সামনে কসম কর যে, তুমি এ ব্যাপারে নির্দোষ। তুমি সুখে শান্তিতে থাক।

বায়তুল মাল সম্পর্কে তিনি কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন, নিম্নের ঘটনা দ্বারা তার কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। যে সমস্ত আতর ও সুগন্ধি দ্রব্য সুলায়মান ব্যবহার করতেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাশেদ একদিন সে সমস্ত আতর ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সামনে হাজির করল। তিনি তা দেখতে পেয়েই হাত দিয়ে নাক বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, "আতরের ঘ্রাণই গ্রহণ করা হয়"।

তার ব্যক্তিগত খাদেম মুজাহিম কাছেই ছিল। সে বলল, আমিরুল মুমিনীন! এর ঘ্রাণ শুধু বাতাসে মিশ্রিত হয়ে আপনার নাকে পৌছেছে। তিনি মুজাহিমকে তিরস্কার করে বললেন, হতভাগা! আতরের ঘ্রাণ গ্রহণ ছাড়া আর কোন উপকারী আছে কি?

বর্ণনাকারী বলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত সে আতর তাঁর কাছ থেকে দূর না করা হল ততক্ষণ তিনি নাক বন্ধ করে রাখলেন। এজন্য আবদুল আজিজ মাজশুন বলেছেন যে. "হযরত ওমর ইবনে আজিজের চেয়ে কঠোর নীতিপরায়ণ শাসনকর্তা আমি আর দেখিনি।"

একদিন ইবনে যাকারিয়া হযরত ওমর ইবনে আজিজকে বলল, আপনি আপনার কর্মচারীগণকে এক শত আবার কাউকে দুশত দীনার বেতন দিয়ে থাকেন, আর আপনি কোন ভাতা গ্রহণ করেন না। অথচ আপনিও প্রশাসনিক কাজ করেন, প্রশাসনে আপনারও অধিকার আছে। আপনার পরিবারেরও অভাব অভিযোগ আছে। সুতরাং উর্ধ্বতন কর্মচারীদের যে পরিমাণ বেতন ধার্য করা আছে আপনিও সে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করুন।

হযরত ওমর ইবনে আজিজ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কর্মচারীদের এ জন্যই অধিক বেশি দেই, যাতে তারা পরিবার-পরিজনের চিন্তা ভাবনা মুক্ত থেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

তারপর তিনি ইবনে যাকারিয়াকে বললেন, আমি তোমার সৎ ধারণা বুঝতে পেরেছি। আমার পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কথা জেনেই তুমি আমার নিকট এ ধরণের প্রস্তাব দিয়েছ।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বললেন, এ অস্থি মাংস আল্লাহর সম্পদে গড়া। আল্লাহর কসম! আমি এর কিছুই পরিবর্ধন হতে দিব না।

মুহাম্মদ ইবনে কায়েস বর্ণনা করেন যে, একবার মুজাহিম আমার কাছে এসে বলল, হযরত ওমর ইবনে আজিজের গৃহে খাওয়ার মত কিছুই নেই, তাঁর পারিবারিক খরচের অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু আমি জানি না যে, এ খরচের অর্থ কোথা হতে যোগাড় করব। তখন মুহম্মদ ইবনে কায়েস বললেন, যদি আমার নিকট বেশি দীনার থাকত তবে আমি আপনাকে দিতাম। মুজাহিম জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট কত দীনার আছে? আমি বললাম মাত্র পাচটি দীনার আছে। মুজাহিম বলল, পাঁচ দীনারতো অনেক বেশি। এটা দেন পরে আপনাকে ফেরত দেব।

উক্ত বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ইয়ামেনের জমির শষ্য আসল। একদিন মুজাহিম আমার নিকট এসে খুব সোল্লাসে বলল, আমাদের জমির ফসল এসেছে, আপনার প্রাপ্য টাকা তাড়াতাড়ি পরিশোধ করে দেব। এ কথা বলে সে হযরত ওমর ইবনে আজিজের নিকট গিয়েই আবার ফিরে আসল এবং মাথায় হাত রেখে বলতে লাগল আল্লাহ খলিফাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করুন। তার সাথে সাথে আমিও এ কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তারপর মুজাহিম বলল, খলিফা তার সমস্ত ফসল বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিয়েছেন।

এই সমস্ত বর্ণনায় এমন কোন সুস্পষ্ট তথ্য নেই যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর ব্যক্তিগত মাল বায়তুলমালে কেন জমা দিয়েছিলেন।

তবে ধারণা করা হয় যে, হয়ত তাঁর খাদেমগণ অথবা তার পরিবারের লোকেরা সাধারণ লঙ্গরখানা হতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল এবং হযরত ওমর ইবনে আজিজ তা এভাবে পরিশোধ করে দিয়েছেন।

অথবা এটাও সম্ভব যে, তখন বায়তুল মালে প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ছিল বলে তিনি তার সমস্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন।

যা হোক, হযরত ওমর ইবনে আজিজের মতে সাধারণ মানুষের সম্পদ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করা কোন মতেই উচিত নয়। যদি প্রয়োজনের তাগিদে তিনি কখনও বায়তুল মাল হতে কোন কিছু গ্রহণ করতেন তবে তা ফেরত দেয়া অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর মন্ত্রী ফুরযাত ইবনে মুসলেমার ভাষ্যটি উদ্ধৃত করা হল।

ইবনে মুসলেমা বলেন, প্রত্যেক জুমার দিন তার নিকট সমস্ত কাগজপত্র হাজির করা হত। সে রীতি অনুযায়ী আমি এক জুমার দিন তাঁর নিকট কাগজপত্র হাজির করলে তিনি তার কোন প্রয়োজনে চার অঙ্গুলী পরিমাণ এক টুকরো কাগজ নিয়ে রাখলেন। আমি মনে করলাম, তিনি এর কথা ভুলে গিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে কাগজপত্র নিয়ে আসতে ডেকে পাঠালেন। আমি কাগজ পত্র নিয়ে হাজির হলে তিনি আমাকে কাগজপত্র নিয়ে ভিতরে আসতে বললেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, এখন আমার খুবই ব্যস্ততা অবসর নেই। কাগজপত্র রেখে চলে যাও। আমি তোমাকে ডাকলে এসো। এরপর আমি কাগজ পত্র নিয়ে ফিরে গিয়ে খাতা পত্র খুলে দেখি যে, যে পরিমাণ কাগজ খলিফা নিয়েছিলেন সে পরিমাণ কাগজ দিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে সাদ হযরত ওমর ইবনে আজিজের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আজিজের ঘরে কাল রঙ্গের একটি পুরাতন জামা পরিধান করতেন।

মায়মুন কর্তৃক বর্ণিত আছে, আমি ছয় মাস পর্যন্ত হযরত ওমর ইবনে আজিজের নিকট ছিলাম। এ ছয় মাস তার গায়ে একটি চাদর ব্যতীত অন্য কোন কাপড় দেখিনি। এ চাদরটি তিনি জুমার দিন ধুয়ে দিতেন।

ইবনে মুআফফা বলেন, হযরত ওমর ইবনে আজিজ একবার অসুস্থ হলেন। মুসলেমা ইবনে আব্দুল মালেক তার নিকট আগমন করল এবং তার

ভগ্নি ফাতেমাকে বলল, খলিফার অবস্থা আজ কিছুটা সংকটাপন্ন, তাঁর গায়ের জামাটি খুব নোংরা দেখা যাচ্ছে। এটা বদলিয়ে দাও, যেন লোকজনকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি দেয়া যায়। ফাতেমা কিছু বললেন না। মুসলেমা তার কথাটির পুনরুক্তি করল যে, তাকে অন্য কোন জামা পরিধান করিয়ে দাও। ফাতেমা কসম করে বললেন, এটা ছাড়া তার অন্য কোন জামা নেই।

অপর এক বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খুব ছোট চাদর পরিধান করতেন। তা খুব বেশী হলে ছয় ফুট এক গিরা লম্বা এবং সাত গিরা প্রশস্ত থাকত।

ওমর ইবনে মায়মুন বলেন, হযরতের জামার মূল্য ছিল খুব বেশি হলে এক দীনার।

রেজা ইবনে হায়াত বলেন, যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন তার খাদেমগণ তাঁর জন্য যে পোষাক ক্রয় করেছিল তার মূল্য ছিল বার দেরহাম। এটা মিশরীয় কাপড় ছিল। তন্মধ্যে জামা, পাগড়ী, কুবা, মোজা ইত্যাদি সবকিছুই ছিল।

সায়ীদ ইবনে সুয়াইদ বলেন, একবার তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সাথে জুমার নামায পড়ার সময় দেখলেন যে, তার জামার সামনে ও পিছনে অসংখ্য তালি লাগানো আছে। অপর এক বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি হযরত ওমর ইবনে আজিজকে খানাফেরা নামক স্থানে ভাষণ দিতে দেখেছেন, তখন তার জামায় তালি লাগানো ছিল।

মারুফ ইবনে ওয়াছেল একবার তাকে মক্কা শরীফে আগমন করতে দেখলেন তখন তার পরিধানে মাত্র দু'টি চাদর ছিল। অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে শুধু একটি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি, তখনও তার পরিধানে কোন পায়জামাও ছিল না।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, একবার তিনি জুমার নামাযে আসতে দেরী করলেন, এতে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি জামা ধৌত করে তা শুকানোর জন্যে রোদ্রে দিয়েছিলাম কাজেই দেরী হয়েছে।

ফাতেমাও কসম করে একথাই বলেছিলেন যে, একটি মাত্র জামা ব্যতীত তাঁর আর কোন জামা নেই।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন যে, একবার তিনি তার কোন এক লোককে কাপড় ক্রয় করতে আশিটি দেরহাম দিলেন। তাঁর জন্য কাপড় ক্রয় করে আনলে তিনি তার উপর হাত রেখে বললেন, কত নরম! কত মুলায়েম! সে ব্যক্তি এ কথা শুনে হেসে দিল, তিনি তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আপনি খলিফা না হতে একবার আপনার জন্য আটশত দেরহাম দিয়ে একটি জামা ক্রয় করেছিলাম, আপনি তা দেখে বলেছিলেন, কত মোটা! কত শক্ত ও অমসৃণ? আর আজ আশি দেরহাম দিয়ে যে কাপড় ক্রয় করা হয়েছে, তা দেখে আপনি বলছেন, কত নরম ও মসৃণ। এতে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে হেসে দিলাম। আবদুল ফরিদে আছে যে, সে ব্যক্তির নাম ছিল রেবাহ।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত ওমর ইবনে আজিজের সম্পূর্ণ পোষাকের মূল্য ষাট দেরহাম ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জাওযি বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আজিজ নিজে তাঁর পূর্ণ পোষাক জামা চাদর ও পায়জামার মূল্য ১৪ দেরহাম ছিল বলেছেন। এক বর্ণনায়ই আছে যে হযরত ওমর ইবনে আজিজকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি জুমার নামাজে দেরী করে এসেছেন কেন? তখন তিনি বললেন, আমি কাপড় ধৌত করে তা শুকানোর জন্যে রোদ্রে দিয়েছিলাম। তখন বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, কি কি কাপড়? ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জবাবে বললেন, জামা, চাদর ও পায়জামা তার মূল্য ১৪ দেরহাম।

খলিফা নির্বাচিত হবার পর তিনি এ জাতীয় পোষাক পছন্দ করতেন। অথচ খেলাফতের পূর্বে তিনিও একজন অভিজাত শ্রেণীর শাহজাদার মত কাপড় ব্যবহার করতেন এবং তিনি সম-সাময়িক যুগে সর্বোত্তম পোষাক পরিধানকারী হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

খাদ্য ও পোষাকে তিনি যে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করেছিলেন, বাসস্থানের বেলায়ও ঠিক সেরূপই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর ধারনায় সরকারী অর্থ ব্যয়ে প্রাসাদ তৈরি করা একটি জঘন্য অপরাধ বলে মনে করতেন। তিনি তার কয়েক বৎসরের শাসনামলে কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাগণ যেরূপ সরকারী অর্থে শাহী প্রাসাদ ও

অন্যান্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তা দেখে তিনি কসম করেছিলেন যে কোন দিন তিনি ক্ষমতা লাভ করলে সরকারী অর্থ ব্যয় করে কোন প্রাসাদ নির্মাণ করবেন না।

ইবনে জাওযি তাঁর এক খাদেমের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন, ভাষ্যটি হলো, হযরত ওমর ইবনে আজিজের জন্য একটি চোবতরা নির্মাণ করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে তার সিঁড়ির ইট খসে পড়ছিল। তিনি যখন তাতে উঠা নামা করতেন তখন তার ইট নড়া চড়া করত। তার এক খাদেম কাদা দিয়ে সেই খসা ইটগুলো লাগিয়ে দিল। একদিন সিড়ি দিয়ে নামার সময় সে ইট আর নড়াচড়া করল না। তখন তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। খাদেম বলল, আমি কাদা দিয়ে ঠিক করে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিলাম, যদি আমি ক্ষমতা লাভ করি, তবে পাকা বা কাঁচা ইট দিয়ে কোন কিছু নির্মাণ করব না।

হযরত ওমর ইবনে আজিজ খেলাফত লাভ করে শুধু থাকা- খাওয়া ও পোষাক পরিচ্ছদেই আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করেননি, ইবনে কাছীরের ভাষ্য অনুযায়ী সর্বপ্রকার আরাম আয়েশ এবং বিলাস সামগ্রী বর্জন করেছিলেন।

ইবনে কাছীরের ভাষ্যটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল–

তিনি পোষাক পরিচ্ছদ, থাকা খাওয়াসহ সকল প্রকার ভোগ বিলাস ত্যাগ করেছিলেন। এমন কি তার অনিন্দ সুন্দরী স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের সম্ভোগ পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন।

ফাটা ও মোটা কাপড়ই ছিল তার সাধারণ পোষাক। তাঁর দরবারে যে প্রদীপটি জালানো হতো তাও বাঁশের তিনটি খুঁটির উপর রাখা হত এবং প্রদীপটি ছিল মাটির। তিনি তাঁর শাসনামলে কোন ঘর বা প্রাসাদ তৈরি করেননি। তিনি নিজেই কাজ সম্পাদন করতেন। তিনি খুব নিম্নমানের খাদ্য আহার করতেন এবং কোন প্রকার ভোগ বিলাস পছন্দ করতেন না। তিনি কখনও তাঁর কোন অনাবশ্যক বাসনা পূর্ণ করেননি।

ইবনে কাছীর বলেন, হযরত ওমর ইবনে আজিজ বায়তুল মাল হতে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। খেলাফত পূর্বে তার বার্ষিক আমদানী ছিল চল্লিশ

হাজার দেরহাম। তিনি এ সমস্তই বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন। নিজের জন্যে শুধু বার্ষিক দু'শত দেরহাম আমদানীর একটি সম্পত্তি রেখেছিলেন।

এ উঁচু স্তরের তাকওয়া ও পরহেজগারীর সাথে সাথে তিনি উঁচু স্তরে সহিষ্ণুতা, বিনয় নম্রতা অবলম্বন করেছিলেন এবং খাওয়া পরা ও বসবাসের অনাড়ম্বরতার সাথে সাথে আচার-আচরণেও ভদ্র ও মার্জিত ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী বাদশাদের মত লোকজনকে নিজের জন্য দাঁড় করে রাখতেন না এবং তাদের সাথে অভদ্র অমার্জিত আচরণও করতেন না। তারপরেও তিনি যে তাদের চেয়ে উত্তম এটা কোন প্রকারেই প্রকাশ করতেন না।

ইবনে জাওযি ও ইবনে কাছীর এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করে বলেছেন যে, একবার হযরত ওমর ইবনে আজিজ তার কোন এক দাসীকে পাখা করতে বললেন। দাসী পাখা করতে করতে ঘুমিয়ে গেল। তখন হযরত ওমর ইবনে আজিজ পাখা দিয়ে দাসীকে বাতাস করতে লাগলেন। অবশেষে দাসীর নিদ্রার ঘোর কেটে গেলে সে খলিফাকে বাতাস করতে দেখে চিৎকার করে উঠলো। খলিফা বললেন, অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমিও আমার মতই একজন মানুষ। আমার মতই তোমারও গরম লেগেছিল। আমার ইচ্ছা হলো তুমি যেরূপ আমাকে বাতাস করেছ আমিও তোমাকে সেরূপ বাতাস করি।

এ ধরণের অত্যাশ্চর্য উদাহরণ আম্বিয়া (আ) সাহাবায়ে কেরামগণও আওলিয়াগণ ছাড়া কোন সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

একদিন হযরত ওমর ইবনে আজিজ নামাযের পর দরবারে বসে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনছিলেন। এমন সময় হযরত উসামা ইবনে যায়েদের (রা) এক কন্যা তার সেবিকাসহ সেথায় এসে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর ইবনে আজিজ তাকে দেখে তার আসন ছেড়ে উসামা ইবনে সাদেরের কন্যার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে সসম্মানে নিজের আসনে বসতে দিলেন এবং তিনি তার সামনে বসে তার কথা শুনলেন এবং তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-এর আজাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ (রা)-এর পুত্র ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

ইন্তেকালের পর সিরিয়া অভিযানকারী সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা রসূলুল্লাহ (সা) এরই একজন আজাদকৃত গোলামের পৌত্রী ছিলেন।

রেজা ইবনে হায়াত, যিনি খলিফা সুলায়মানের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে আজিজের সাথে রাত্রি যাপন করেছিলাম। বাতির আলো তখন নিভু নিভু করছিল। তার পার্শ্বেই খাদেম শুয়েছিল। আমি বললাম খাদেমকে জাগিয়ে দিব কি? তিনি বললেন না, তাকে ঘুমাতে দাও। আমি বললাম, তবে আমি উঠি। তিনি বললেন, না, মেহমান দিয়ে কাজ করান অভদ্রতা ও মানবতা বিরোধী। তারপর তিনি চাদর রেখে উঠে তৈল পাত্রের নিকট গেলেন এবং বাতিতে তৈল ভরে তৈল পাত্রটি যথাস্থানে রাখলেন। তারপর বললেন, যখন আমি একাজ করতে উঠলাম তখনও আমি হযরত ওমর ইবনে আজিজ আর এখনও আমি সেই হযরত ওমর ইবনে আজিজ।

সাধারণ মানুষের জীবনে এ ধরনের উদাহরণ প্রায়ই দেখা গেলেও রাজা বাদশাদের জীবনে বিশেষতঃ আব্দুল মালেক, ওয়ালিদ ও সুলায়মানের মত বিলাসী বাদশাদের জীবনে এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

আল হাকাম ইবনে ওমর আর রাবিনী বলেন, একবার প্রবল বৃষ্টির দিনে আমি হযরত ওমর ইবনে আজিজের সাথে এক জানাযায় শরীফ ছিলাম। এক অপরিচিত ব্যক্তির ছাতা ছিল না। সে তাঁর সামনে আসলে তিনি তাকে কাছে ডেকে এনে তার পাশে বসালেন এবং তার চাদর দিয়ে তাকে জড়িয়ে দিলেন।

এ ভাষ্যকারই বলেন, আমি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে দেখেছি যে, তিনি সাধারণ লোকদের এক মজলিস হতে উঠে অন্য মজলিসে গিয়ে বসেছেন। সাধারণতঃ কোন অপরিচিত লোক এসে তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করত, হযরত ওমর ইবনে আজিজ কোথায়? কারণ তার সাজসজ্জায় তাকে চিনার কোন উপায় ছিল না।

তারপর হয়তো কেউ ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিত আর তখন সে অবাক হয়ে তাঁকে সালাম করত।

তিনি জেনে বুঝেই এ সাধারণ বেস-ভুষা ব্যবহার করতেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নীতি অনুসরণ করে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসলেন।

তিনি কারও নিকট হতে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অথচ তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাগণ যে কোন ঔদ্ধত্ব প্রকাশকারীকে নির্মূল করে দিত।

খানাফেরার জনৈক লোক বলেন, একবার ফাতেমার গর্ভজাত এক পুত্র অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিল। অন্য এক বালক তাকে মেরে আহত করল। লোকেরা এটা দেখতে পেয়ে আহতকারী বালকসহ খলিফার বাড়ীর ভিতর ফাতেমার নিকট নিয়ে গেল। ক্রন্দন ধ্বনি শুনে হযরত ওমর ইবনে আজিজ ঘরের এক কামরা হতে বাইরে এসে দেখলেন যে, এক মহিলা চিৎকার করে বলছে এ আমার এতীম ছেলে। হযরত ওমর ইবনে আজিজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলে কি বায়তুল মাল হতে বৃত্তি পায়? মহিলা বলল, না। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বললেন, এখনই এ ছেলেকে বৃত্তি গ্রহণকারীদের তালিকায় নাম লিখে নাও। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা ক্ষোভে দুঃখে বললেন, এ ছেলে আপনার ছেলেকে আহত করেছে আর আপনি কি না তার বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। আল্লাহই তাকে এতীম করেছেন এটা তাঁরই কাজ। সে আপনার ছেলেকে আহত করেছে আবার হয়ত অন্য ছেলেকে আহত করবে। হযরত ওমর ইবনে আজিজ বললেন, তোমরা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। আর কেন?

পুত্র সন্তানের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য সকলেরই থাকে, বিশেষতঃ রাজা-বাদশাহদের ছেলে মেয়ে খুবই আদরের হয়ে থাকে। এ এতীম বালকটিই ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের পুত্র, ওয়ালিদ ও সুলায়মানের ভাগিনা এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ঔরষজাত সন্তানকে আহত করেছে আর তিনি স্বয়ং ছেলের পক্ষে ওকালতি করেছেন কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আজিজ এতীম বালকের ব্যাপারে কারও কথা শুনলেন না। তাকে একটু ধমক পর্যন্ত দিলেন না। বরং বায়তুল মাল হতে তার ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। একমাত্র হযরত ওমর ইবনে আজিজ ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন বাদশাহর জীবনে এরূপ আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ আছে বলে জানা যায়নি।

ইবনে জাওযি বলেন, একদিন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বৈঠক শেষ করে উঠেছেন এমন সময় একটি লোক কাগজপত্র নিয়ে উপস্থিত হল। লোকে মনে করল, সে হয়ত খলিফার নিকট কোন আবেদন করবে কিন্তু লোকটির ধারণা হল যে, হয়তো এসব লোক তাকে খলিফার নিকট যেতে বাধা দিবে। কাজেই সে কাগজের পুটলিটি খলিফার দিকে ছুড়ে মারল। খলিফা এ দিকেই মুখ ফিরালেন, সেটা গিয়ে খলিফার মুখ মন্ডলে লাগল এবং তাকে আঁহত করে দিল। তাঁর মুখমন্ডল হতে রক্ত বের হতে লাগল। কিন্তু তিনি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সে সমস্ত কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। কাগজপত্র পাঠ শেষে তিনি তার পক্ষে যা ভাল সেরূপ নির্দেশ দিলেন। আর তাকে কিছুই বললেন না। বিনয় নম্রতার এরূপ উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যাবে না।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাধারণ জীবন

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ নিজেই নিজের হিসেব করে আড়ম্বরহীন দুঃখ-দৈন্যের জীবন অবলম্বন করেছিলেন। সরকারী কোষাগারের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি না করে অতি সাধারণ মোটা ও ফাটা কাপড় পরিধান করতেন। পরহেজগারী ও ফকিরী, দরবেশীর উদ্দেশ্যে ছিল না। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তার মনের কামনা বাসনারও মৃত্যু হয়নি। তাঁর অন্তরের শিরা উপশিরাও বন্ধ হয়ে যায়নি। তারপরও তার আশা আকাঙ্খার রজ্জু ও ছিন্ন হয়ে যায়নি।

এ সমস্ত হিসাব-নিকাশ, এ সকল আড়ম্বরহীনতা, বায়তুল মাল ও ব্যক্তিগত বিত্ত বৈভব হতে সংযমশীলতা তিনি শুধু এ জন্যই অবলম্বন করেছিলেন যে, ইসলাম বায়তুল মালের সম্পদের অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্ধারণ করেনি। এটা কোন খলিফার কোন বাদশার বা কোন শাহজাদার ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল না। এটা শুধু জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটা আবু সুফিয়ান ও উমাইয়ার পুত্র-সন্তানদের ভোগ বিলাসের জন্য ছিল না। হযরত আলী (রা) হযরত ফাতেমা (রা)-এর পুত্র সন্তানদের ভোগের জন্য ছিল না। এটা মারওয়ানের পুত্র আব্দুল

মালেকের জন্য ছিল না, ছিল না আব্দুল আজিজ, ওয়ালীদ, সুলায়মান অথবা ইয়াযিদ প্রমুখের ভোগ বিলাসের জন্য। ইয়াযিদ, আব্দুল মালেক, ওয়ালীদ ও সুলায়মান এবং অন্যান্যরা এতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল। কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে তারা বিনাদিধায় জনসাধারণের সম্পদ খরচ করেছিল। সাধারণ মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। যদি বায়তুল মাল কারো ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হতো তবে এটা তা হত– মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা), তার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) এবং তার পুত্র হযরত হাছান ও হুছাইন (রা)-এর জন্য। এটা হতো হযরত আবু বকর (রা), তার কন্যা হযরত আয়েশা (রা), আসমা ও তার পুত্র মুহাম্মদ এবং আবদুর রহমানের জন্য। এটা হতো হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং তার পুত্র আছেম ও আবদুল্লাহর জন্য। এটা তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ, মাআয ইবনে জাবাল, সা'দ ইবনে মাআয, আবু আয়্যুব আনসারী, বিলাল হাবশী ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী (রা) দের জন্য যারা তাদের প্রাণের বিনিময়ে ইসলামের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যারা আবু জেহল, আবু লাহাব, প্রমুখের অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন, যারা ইসলামী শাসনের চারা বৃক্ষকে তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে লালন করে বলবান বৃক্ষে পরিণত করেছিলেন।

ইয়াযিদ, মারওয়ান, আব্দুল মালেক, ওয়ালিদ ও সুলায়মান ও অন্যান্য উমাইয়া খলিফাগণ শুধু পাকা শষ্য ও পাকা ফল ভোগ করেছিল। এরা না ছিল ইসলামের স্থপতি না ছিল স্থপতিদের বংশধর।

তারপর এখানে স্থপিত বা স্থপতি পুত্রদের কোন প্রশ্নই উঠে না। এখানে স্থপতিদের কোন মূল্যই ছিল না, মূল্য ছিল শ্রমিকদের। এ নতুন সংগঠন যা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল, যে সংগঠন আবু সুফিয়ান, ও আবু লাহাবের হাতে নির্মমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়েছিল। দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবরোধ সহ্য করতে হয়েছিল, যে জামাত আত্মরক্ষা করতে মক্কা ত্যাগ করে সুদূর মদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাঁরা এমন এক বিপ্লবের আহবান করেছিল যাতে বংশ গোত্র বা গোষ্ঠীগত আভিজাত্যের কোন স্থান ছিল না।

এটা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা কারো রক্তের পবিত্রতার প্রবক্তা ছিল না। এ দল শুধু এ জন্যই সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিল যাতে তারা এমন এক সমাজ গঠন করবে, এমন এক শাসন পদ্ধতি কায়েম করবে, যাতে মালিক শ্রমিকের, প্রভু ও গোলামের, দুর্বল ও সবলের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। যে সমাজে কোন পীড়িত বা কোন পীড়নকারীও থাকবে না। এ দল বুকের রক্ত পানি করে এমন এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কাজে সচেষ্ট ছিল, যাতে কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার বা উঁচু নিচুর ভেদাভেদ থাকবে না। সকলেই সমভাবে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করার পূর্ণ সুযোগ পাবে।

তাঁরা এমনি এক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যে সমাজ ব্যবস্থা বঞ্চিত, দুঃস্থ দরিদ্রদের সাহায্য সহায়তার জন্য অকাতরে অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছিল। যে সমাজ ব্যবস্থায় আমদানী ব্যয় হতো বিধবা, এতীম, নিঃস্ব মুসাফির, অভাবক্লিষ্ট, আশ্রয়হীন, ঋণগ্রস্ত দুঃখী মানুষের জন্য। কিন্তু এ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)কেও যিনি আল্লাহর প্রিয়নবী ছিলেন, কিছু গ্রহণ করতে অনুমতি দেয়নি। তিনি তার সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জনের আরাম-আয়েশের জন্য এ সমাজ ব্যবস্থার আমদানীর কিছু মাত্রও ব্যয় করেননি।

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম কোন বিশেষ বংশ বা গোষ্ঠীর বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য দায়ী নয়। এটা উঁচু নিচু, ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের জন্য সমভাবে যিম্মাদার। তাঁর সামনে ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, ইসলামের শাসন পদ্ধতির প্রর্বতক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ বিরাজমান ছিল, যিনি কয়দিন অনাহারে দিন কাটিয়েছেন, যিনি জীবনে কখনও উদর ভর্তি করে আহার করেননি, যাঁর কন্যার জন্য কোন উন্নত মানের কোন পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল না, উন্নত মানের খাদ্যের সংস্থান করেননি, যার প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) ক্ষুধার তাড়নায় দীর্ঘ সময় ক্রন্দন করতেন।

তাঁর সামনে খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রা)-এর মহান আদর্শ বিরাজমান ছিল, যিনি মুসলমানদের নির্বাচিত খলিফা হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কোষাগার হতে শুধু মাত্র প্রাথমিক প্রয়োজনাদি পূরণ করতে সামান্য পরিমাণ

অর্থ গ্রহণ করতেন। তিনি খলিফা নির্বাচিত হবার পর কোষাগার হতে দুধ পান করার জন্য একটি মাটির পেয়ালা, আটা পিষার জন্য একটি যাতা, দুধের জন্য একটি উটনী এবং ব্যক্তিগত কাজ-কর্ম করার জন্য একজন খাদেম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিচ্ছদ ও আহার্য ছিল অত্যন্ত সাধারণ।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সামনে ইসলামের মহান খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মহান আদর্শ বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতার মানব ইতিহাসে যিনি এক অতুলনীয় উদাহরণ সৃষ্টি করে ছিলেন। যিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং সবচেয়ে প্রজ্ঞাশীল শাসক হিসেবে খ্যাত ছিলেন কিন্তু তিনিও শুষ্ক রুটি আহার করতেন, মোটা কম্বল পরিধান করতেন, যার সমগ্র পশ্চাতে আঠারটি তালি লাগানো থাকতো। তিনিও সরকারী কোষাগার হতে কোন ভাল পোষাক বা খাদ্যের সংস্থান করেননি।

কিন্তু তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে সকল অভাবী মানুষের অভাব অনটন দূর হলো। তাঁদের সাধনার ফলে সকল মুসলমানের দুঃখ দৈন্যের অবসান ঘটল, সাধারণ সমাজের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। তাদের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটি মুসলমান উত্তম কাপড় পরিধান করার ও উত্তম খাদ্য আহার করার সুযোগ পেল এমনকি সদ্য প্রসূত সন্তানেরও সমস্ত অভাব পূরণ হল। তাঁরা একজন দরিদ্র হতে দরিদ্রতম মুসলমান শিশুর জন্য সে কাপড় ও খাদ্য ভাতার ব্যবস্থা করলেন যা হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট লোকদের সন্তানদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছেও সরকারী আমদানী হতে সেসব লোকই কিছু পাবার অধিকারী ছিল যাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন হকদার হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন। এ কারণেই তিনি নিজের পুত্র সন্তান, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনদের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতেন না। এ কারণেই তিনি আব্দুল মালেক, ওয়ালিদ ও সুলায়মান কর্তৃক বরাদ্দকৃত তাঁর ফুফুর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ফুফু ও পবিত্র কোরআন, আল্লাহর রাসূল খেলাফায়ে রাশেদীনের বিঘোষিত পদ্ধতি

অনুযায়ী সরকারী ভাতা পাবার অধিকারী ছিল না। তিনি দিন রাত মুসলমানদের জন্যই কাজ করতেন। কাজেই নীতিগতভাবে তাঁর পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে সরকারী কোষাগার গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল।

কিন্তু ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, বার্ষিক দু' শত দীনার আমদানীর একটি জায়গীর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আর যেহেতু এ জায়গীর তাঁর ছিল, কাজেই সরকারী কোষাগারের উপর তার নিজস্ব প্রয়োজনের চাপ প্রদান করতে তিনি কোন মতেই সঠিক মনে করেননি। একবার তার এক হিতাকাঙ্ক্ষী তার দুঃখ দুর্দশা দেখে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মত রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে প্রয়োজনীয় খরচ গ্রহণ করতে তাকে পরামর্শ দিলে তিনি তাকে এ কথাই বলেছিলেন।

হযরত ওমর (রা)-এর ধারণায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে প্রয়োজনীয় খরচ তিনি তখনই গ্রহণ করতে পারতেন যদি তিনি সম্পদহীন হতেন এবং ওমর ফারুক (রা)-এর মত তারও কোন কিছুই না থাকত।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয়ের খাত নির্ধারিত ছিল, তা কোন প্রকার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তার শাসনকর্তাদের নামে যেসব পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি সরকারী অর্থ ব্যয়ের কথা স্পস্ট ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তার পত্রের মর্ম ছিল- অতঃপর আল্লাহর রসূল (সা) নগদ মুদ্রা, ক্ষেতের ফসল, চতুস্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরয করে তাদের পরিমাণ ও ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে সকল প্রকার সাদকা ফকীর মিসকীন সরকারী কর্মচারী এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে হয় তাদের জন্য এবং দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে জিহাদ এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (সা) নিজের দুশমনদের সাথে একাধিকবার যুদ্ধ করেছেন, তার সৈন্য বাহিনীও অনেকবার দুশমনের মুকাবিলা করেছেন। যদি তিনি নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন, তবে প্রাপ্ত সমস্ত গনিমতের মাল প্রকাশ্যে বন্টন করে দিতেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি তথা প্রধান সেনাপতিই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন এবং পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশকে যথাযথ বাস্তবায়িত করতেন।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ ... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আরও জেনে রেখ যে, তোমরা যুদ্ধে কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু গনীমত হিসাবে পাবে তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের জন্য। তার নিকটাত্মীয় স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় মুসাফিরদের জন্য যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। কিয়ামতের দিনে যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"

তারপর আল্লাহপাক তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) কে যে সমস্ত জনপদ ও সম্পদের উপর বিজয়ী করেছেন, যাতে তিনি এরপরও যে সমস্ত জনপদ বিজিত হবে তাতে একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে যায়, আর পবিত্র কুরআন সে পদ্ধতিটি এ রূপে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

"জনপদবাসীদের কাছ থেকে তার রাসূল (সা)কে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর রাসূলের আত্মীয় স্বজনের এতিম-মিসকিন, পথিকদের জন্যে যাতে এটা তোমাদের ধনীদের সম্পদে পরিণত না হয়। আল্লাহর রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহপাক কঠোর শাস্তিদাতা।"

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

অর্থঃ এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের কামনায় এবং আল্লাহ, তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তারাই সত্যবাদী।

(সূরা হাশরঃ ৮)

যে সমস্ত লোক মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াত অবতীর্ণ। আনসারগণ তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন না। তারপর এ আয়াত লিখলেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ .... اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থঃ যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারা সফলকাম। (সূরা হাশরঃ ৯)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী মদীনার আনসারদের অধিকার স্বীকৃত হল কারণ আল্লাহর রাসূল (সা) হিজরত করে তাদের নিকট এসেছিলেন। অতঃপর তৃতীয় আয়াত দ্বারা এই দলের পর অবশিষ্ট মুসলমানদের অধিকার সাব্যস্ত হল।

তারপর তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ الخ

অর্থঃ আর এই সম্পদ তাদের জন্যে যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর।

এই আয়াত সমস্ত মুসলমানদের শামিল করেছে। আর এর অর্থ প্রথম হিজরত থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানকে শামিল করেছে।

অপর এক চিঠিতে, যা প্রথমটির মতই ব্যাপক ছিল, হযরত ওমর (রা) এতে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। ইবনে আবদুল হাকাম বলেন, তিনি লিখলেন–

হিজরত আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রশস্ত– অতএব যদি কোন আরাবী স্বীয় পশু বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দারুল হিজরতে আগমন করে এবং আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে– তবে সে মুহাজির। সেও প্রথম যুগের মুহাজিরদের মত পুরস্কার পাবে এবং তার সঙ্গে মুহাজিরদের মত আচরণ করা হবে।

মুহাজিরগণ বেতন ভাতা ছাড়াই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয়ের মাধ্যমে সাফল্য দান করলেন। এ সমস্ত বিজয়ের সুফল সেসব লোকেরাও পাবে, যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মত কাজ করবে এবং যারা তাদের ভাইদেরকে ভালবাসবে তাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ সুদীর্ঘ চিঠি আমরা এ উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করলাম, যাতে এ কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সরকারী অর্থ ব্যয়ের ঐসমস্ত খাতকেই বৈধ খাত বলে মনে করতেন, যা আল্লাহর রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে নির্ধারিত করেছিলেন এবং যেগুলোকে খোলাফায়ে রাশেদীন সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা করা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সরকারী আয় বলতে যাকাত, মালে গনিমত এবং বিজিত ভূমির শস্য ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। আর এই সমস্ত আমদানীও যেহেতু নির্ধারিত ছিলনা এ জন্যই যখন বাহির হতে কোন সম্পদ মদীনায় আসত তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

তারপর যখন হযরত আবুবকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন বাহির হতে কোন অর্থ মদীনায় আসলে তিনিও তা মদীনা ও পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর তিনি এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় সরকারী কোষাগারে একটি দেরহাম ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। দু' বৎসরের সমস্ত আমদানী তিনি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা) খলিফা হওয়ার পর যখন তিনি বায়তুলমালের হিসাব করলেন, তখন তিনি একটি মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। এতে তিনি ক্রন্দন করে বলেছিলেন, যদি এ দেরহামটিও আবু বকরের দৃষ্টি পড়ত তবে এটাও তিনি বিতরণ করে দিতেন।

হযরত আবু বকর (রা) যুগে সরকারী আয় খুবই নগণ্য ছিল। সমস্ত মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের মত সরকারী সম্পদ ছিল না। এ জন্যই তিনি

ব্যয়ের খাতগুলি নির্ধারণ করেননি, বরং যখন যে খাত বেশি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হত তাতেই ব্যয় করতেন।

হযরত ওমর (রা) জনসাধারণকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করলেন। পবিত্র কুরআনের আলোকে তিনি মুহাজির, আনসার ও সাধারণ মুসলমানদের স্তর নির্ধারণ করলেন এবং প্রত্যেক স্তরের জনগণকে নিয়মিত ভাবে বার্ষিক ভাতা প্রদান করতে লাগলেন। হযরত ওমর (রা) ভাতার যে সমস্ত ক্রম নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়াকেই তিনি মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সৈনিকদের মধ্যে সাধারণ সৈনিক, বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণকারীদের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করলেন।

এ পর্যায় ও ক্রম নির্ধারণের পরও তিনি প্রথম স্তরের জন্য এরূপ ভাতার ব্যবস্থা করেননি যাতে অন্যান্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে বা তাদের মৌলিক প্রয়োজন পুরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি স্বাধীন, গোলাম, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মুসলমানের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলেন এবং প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে সরকারী কোষগার হতে তা প্রদান করার ব্যবস্থা করলেন। এছাড়াও বার্ষিক পনর দেরহাম হতে দু'শত দেরহাম বিবিধ কাজে খরচের জন্য প্রদান করা হল।

ঐতিহাসিক ইবনে উবাইদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য তিনি বার্ষিক দু' হাজার দেরহাম ভাতার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তিনি তার এ বাসনা পূর্ণ হবার পূর্বেই ইন্তেকাল করলেন। এর বাস্তবায়নের জন্য আর সুযোগ পেলেন না।

হযরত ওমর (রা) কর্তৃক রাষ্ট্রের আমদানীকৃত অর্থ নির্ধারিত ব্যয়ের খাতগুলি হযরত আলী (রা) এর যুগ পর্যন্ত চালু ছিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর উত্তরাধীকারীদের যুগে এ পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটল। আমদানীর ব্যয়খাতগুলি সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজও সে সমস্ত ব্যয়খাতগুলি নির্ধারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তার মতে হযরত

ওমর (রা)-এর নীতিই সুষ্ঠ ইসলামী নীতি বলে পরিগণিত ছিল। তাঁর মতে হযরত ওমর ফারুক (রা) ন্যায়পরায়ণ খলিফা ছিলেন। তিনিও তাঁর অনুসৃত নীতি সমূহই অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেন। বেতন ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কে তিনি রাজ্যের গভর্ণরদের নিকট লিখিত তাঁর এক পত্রে এ পদ্ধতির উল্লেখ করে লিখেছিলেন−

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বিজিত সম্পদ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, মুসলমানগণ তার সিদ্ধান্ত বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছিল। তিনি সমস্ত মুসলমানদের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণ করলেন- যা প্রতি বছর তারা পেতে থাকে। সুতরাং এ ন্যায়পরায়ণ খলিফার অনুসরণ করা তোমাদের কর্তব্য।

ইবনে আব্দুল হাকাম এবং ইবনে সাদ বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ নিজেও এ ন্যায়পরায়ণ খলিফার অনুসরণ অপরিহার্য্য মনে করতেন। তিনিও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মত রাজ্য ভান্ডার হতে জনসাধারণকে বেতন ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে তার যুগে রাষ্ট্রে আমদানী যেহেতু হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর যুগের তুলনায় খুবই হ্রাস পেয়েছিল এবং লোকও সে পর্যায়ে ছিল না। কাজেই তিনি বেতন ভাতার ক্রম বিভক্তি বাতিল করে এক সাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন, আর হযরত ওমর ফারুক (রা) এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেই চেয়েছিলেন। অবশ্য বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

ইবনে জাওযি ও ইবনে আব্দুল হাকামের বর্ণনা মতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কর্মচারীদের একশত হতে তিনশত দীনার বার্ষিক বেতন ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন।

কর্মচারী ব্যতীত সাধারণ লোকদের জন্য তিনি এক রকম বেতন ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে সাদের নিম্ন লিখিত ভাষ্যটি প্রণিধানযোগ্য−

ওসমান ইবনে হানী বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে দুই স্থানে বেতন প্রদান করতে দেখেছি। তিনি সমস্ত লোককেই একই রকম বেতন দিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে হেলাল বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত লোকদের ভাতা নির্ধারণ করে দিতে আবুবকর ইবনে হাজামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় ব্যবসায়ীদের ভাতা বরাদ্দ না করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। রবিয়া ইবনে আতা বলেন, একবার আমি বিশিষ্ট পন্ডিত ও আলেম সুলাইমান ইবনে ইয়াসারের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তার সামনে আবুবকর ইবনে হাজামের নিকট হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের লিখিত চিঠির কথা আলোচিত হল যাতে তিনি ব্যবসায়ীদের জন্য ভাতা বরাদ্দ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বললেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের চিন্তাধারা খুবই যথার্থ। কারণ ব্যবসায়ীগণ মুসলমান জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তা ব্যতীতই নিজ নিজ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকে।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সর্বোচ্চ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন দু' হাজার দীনার।

অন্য একটি বর্ণনায় সরকারী কোষাগার হতে মদীনাবাসীদের ভাতার কথা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ২৮ মাস ২৫ দিনে মদীনাবাসীদের জন্য তিনটি ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফতের যুগও এ সামান্য সময়ই ছিল। এই বৎসরের ভাতা জনসাধারণের প্রাপ্য ছিল এবং তিনি অসুস্থ অবস্থায় তৃতীয় ভাতা প্রদানের নির্দেশ এ জন্যই দিয়েছিলেন যাতে জনসাধারণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

শুধু মদীনাবাসীই তাঁর এরূপ দয়ার দানে ধন্য হয়নি, বরং প্রতিটি মুসলমানই তাঁর দান লাভে ধন্য হয়েছিল। তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমার মাধ্যমে আমার বংশের লোকদেরকে তিনটি ভাতা প্রদান করলেন অথচ সাধারণ লোকেরা দু'টি ভাতা পেয়েছিল।

অপর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাজ্যের মুসলমানদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে ঘোষণা করে দিলেন যে,

যাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করা হয়নি, তারা যেন তাকে সে বিষয়ে জ্ঞাত করেন, যাতে তিনি তাদের ভাতা বরাদ্দ করে দিতে পারেন।

মুহাম্মদ ইবনে ওমর বলেন– আমার চাচা আমাকে বলেছেন যে, আমি ৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বয়স যখন তিন বৎসর তখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা নির্বাচিত হলেন এবং আমিও সাধারণ ভাতা হিসেবে তিন শত দীনার পেতে লাগলাম।

নগদ ভাতা ছাড়াও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সমস্ত লোককেই শস্য প্রদান করতেন এবং সকলকেই খাদ্য শস্য প্রদানের সাম্যের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেককেই প্রায় ১০ (দশ) মন খাদ্য প্রদান করা হত।

সাধারণ মানুষের ভাতা আদায়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমন কি কয়েদীদের ভাতা নিয়মিত আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।

ইবনে হাজাম বলেন, আমরা কয়েদীদের রেজিষ্টার বের করে রাখতাম, যাতে খলিফার নির্দেশ মত তারা তাদের ভাতা গ্রহণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমাকে লিখলেন যে, ভাতা প্রাপ্তদের কেহ যদি উপস্থিত না থাকে বা আশপাশে কোথাও গিয়ে থাকে তবে তার ভাতার অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট রেখে দিও যাতে সে এসে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধায় না পড়ে, আর যদি কেউ দূরে চলে গিয়ে থাকে তবে তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার ভাতা বন্ধ রাখ। যে দিন সে আসবে বা তার মৃত্যুর সংবাদ পাবে অথবা তার কোন প্রতিনিধি তার জীবিত থাকার প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হবে তখন তাকে তা দিয়ে দিবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ প্রথম বছর হতেই চৌদ্দ বৎসরের বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন অবশ্য তাদের ভাতা সৈনিকদের ভাতার চেয়ে কম ছিল। তিনি শুধু পনের বছর বয়সের কম বয়সের সৈনিককেও সৈনিক ভাতা দিতেন না। এ ব্যাপারে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একটি ফরমান জারী করেছিলেন যে, পনের বছর বয়সের কম সৈন্যদেরকে সাধারণ সৈনিকভাতা প্রদান করা হবে না। শুধু পনের বৎসর বয়স্কদের জন্য সৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে।

সামরিক বাহিনীর বেতনেও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। পদস্থ ও দক্ষ সৈনিকদের বেতন ছিল বার্ষিক তিন শত দীনার। এ সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট আদেশ ছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন সৈনিকদের একশত দীনার বেতন দাও, তখন লক্ষ্য করে দেখবে তার ঘোড়া আরবী কিনা, তাঁর বর্ম, তরবারী, তীর ধনুক ও বর্শা সহ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা।

যে সমস্ত সৈনিক ডাক বা এ জাতীয় কোন কাজে নিযুক্ত থাকত তাদের সৈনিকদের ভাতা প্রদান করা হত। সকল শ্রেণীর বেতন ভাতা আদায় করার জন্য তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন। বছরের শুরুতেই কোষাগারের দরজা খুলে দিতেন।

ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, ইরাকের শাসনকর্তা আব্দুল হামিদের গোলাম বলেছে যে, আব্দুল হামিদ সর্বপ্রথম ওমর ইবনে আবদুল আজিজের যে পত্র পেলেন, তাতে লিখা ছিল শয়তানের ধোকা এবং বাদশার জুলুমের পর মানুষের জীনের কোন মূল্যই থাকে না। আমার এ পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দিবে।

আবু বকর ইবনে মরিয়াম, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আরব, অনারব, স্বাধীন. গোলাম নির্বিশেষে সকল মুসলমানের খাদ্য, পোষাক এবং বেতন সমান সমান করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন পঁচিশ দীনার।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ ব্যাপারে একটি অদ্ভূত কাণ্ডও করেছিলেন। তিনি মদীনার হাসেম বংশীয়কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়তার মর্যাদা দান করে বার্ষিক দশ হাজার দীনার ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন–

دَعَانِىْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ خُذْ هٰذَا الْمَالَ الْاَرْبَعَةَ الاَفٍ اَوْ خَمْسَةَ الاَفٍ دِيْنَارٍ فَاقَدِّمْ بِهَا عَلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزَمٍ فَقُلْ لَّهُ فَيَصِمَّ اِلَيْهِ خَمْسَةَ الاَفِ دِيْنَارٍ اَوْ سِتَّةِ الاَفِ دِيْنَارٍ حَتّٰى يَكُوْنَ عَشَرَةَ الاَفِ دِيْنَارٍ ثُمَّ تَقْسِمُ ذَالِكَ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَتُسَوِّىْ بَيْنَهُمْ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ سَوَاءً۔

قَالَ وَفَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ هٰذَا فَعَقَّبَ زَيْدُ بْنُ حَسَنٍ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ قَوْلًا قَالَ فِيْهِ مِنْ عُمَرَ وَكَانَ فِيْمَا قَالَ يُسَوِّىْ بَيْنَنِيْ وَبَيْنَ صِبْيَانٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَاتَبْلُغُ هٰذَا الْمَقَالَةُ مِنْكَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيُغْضِبُهُ ذَالِكَ وَهُوَ حَسَنُ الرَّأْىِ فِيْكُمْ - قَالَ زَيْدٌ فَاَسْئَلُكَ بِاللّٰهِ اِنْ كَتَبْتَ اِلَيْهِ مُصْبِرُهُ بِذَالِكَ فَكَتَبَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى عُمَرَ لَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ حَسَنٍ قَالَ مَقَالَةً فِيْهَا غَلْطَةً وَخَبَرَهُ بِالَّذِىْ قَالَ قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ لَهُ قَرَابَةً وَرَحْمًا - فَلَمْ يُبَالْ عُمَرُ وَ تَرَكَهُ -

একদিন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন যে, বায়তুলমাল হতে চার অথবা পাঁচ হাজার দীনার নাও এবং আবু বকর ইবনে হাজামের নিকট গিয়ে তাকে বলবে, সে যেন এতে আরও পাঁচ কি ছয় হাজার দীনার মিলিয়ে দশ হাজার করে নেয় এবং এটা হাসেম বংশীয়দের নিকট বিতরণ করে দেয়। তাকে এটাও বলবে যে, স্ত্রী পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলকেই যেন সমান-সমান অংশ দেয় কোন পার্থক্য যেন না করে।

ভাষ্যকার বলেন, আবু বকর ইবনে হাজাম এরূপই করলেন, ফলে যায়েদ ইবনে হাছান অসন্তুষ্ট হয়ে খলিফা সম্পর্কে দুই চার কথা ভালমন্দ বলে ফেললেন এবং অভিযোগ করলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাদেরকে ছেলেদের সাথে মিলিত করে দিয়েছে। আবু বকর ইবনে হাজাম তাকে বললেন, খলিফা আপনাদের প্রতি ভাল মনোভাব পোষণ করেন। তিনি যদি আপনার এসব কথা শুনেন তবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। যায়েদ তার নিকট বললেন, খলিফাকে অবশ্যই এটা অবহিত করতে হবে। আবু বকর ইবনে হাজাম খলিফার নিকট তার লিখিত এক পত্রে এ কথাও উল্লেখ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি খলিফাকে বললাম, যায়েদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরম আত্মীয়। কাজেই খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যায়েদের কথায় মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না।

হযরত হুসাইন (রা) এর কন্যা ফাতেমা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে এক পত্র লিখে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন যে, তিনি

একটি ভাল কাজই করেছেন। যার কোন খাদেম ছিল না, তিনি তাকে খাদেম প্রদান করেছেন, যার পরিধানের কাপড় ছিল না তাকে কাপড় প্রদান করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ফাতেমার এই পত্র পেয়ে খুব খুশি হলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একটি বিরাট কর্তব্য পালন করেছিলেন। দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ বায়তুলমালের আমদানীকৃত অর্থ হতে যাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তিনি তাদেরকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। এটা তার একটি দায়িত্বও ছিল। ফাতেমার এ পত্র খলিফাকে খুবই খুশী করল। যেহেতু এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতনীর পবিত্র পত্র, এটা হযরত আলীর (রা) দৌহিত্রীর লিখিত পত্র, এটা শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন (রা)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যার পত্র। তিনি এ পত্র চোখে মুখে লাগালেন এবং পত্র বাহককে পাঁচশত দীনার পুরস্কারসহ হযরত ফাতেমাকে ধন্যবাদ জানাতে মদীনায় পাঠালেন ও তার জন্য দোয়া করতে বললেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার চিঠির জবাবে যে উত্তর লিখেছিলেন তাতে তিনি তাঁর মর্যাদা এবং আল্লাহপাক তাদের যে সমস্ত অধিকার প্রদান করেছেন তাও স্বীকার করেছিলেন।

ফাতেমা ব্যতীত অন্যান্য হাশেম বংশীয়গণও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এই কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ইবনে সাদ বলেন, একদিন বনি হাশেমের কিছু লোক সমবেত হয়ে একটি পত্র লিখলেন এবং একজন বাহক মারফত তা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আত্মীয়তার মর্যাদা দান করে যা করেছেন তাতে তাঁরা তাকে ধন্যবাদ প্রদান করলেন ।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উক্ত পত্রের উত্তরে তাদেরকে লিখলেন যে, পূর্ব হতেই আমার এরূপ অভিপ্রায় ছিল এবং আমি ওয়ালিদ ও সুলায়মান উভয়কেই এই পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার কথা বুঝতেও পারেনি। এখন যেহেতু আমিই দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করেছি কাজেই আমি আমার পূর্ব ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে যাচ্ছি।

অপর এক বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সর্বপ্রথম সে সমস্ত অর্থই বিতরণ করলেন যা তিনি সিরিয়া হতে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। তা হতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই সমান অংশ পেয়েছিল।

অতঃপর আহলে বাইতের একজন বললেন যে, আমরা আহলে বাইতের সদস্যগণ প্রত্যেকেই তিন হাজার দীনার ভাতা পেয়েছি তদুপরি তিনি লিখেছেন যে, আমি জীবিত থাকলে আপনাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করব।

পবিত্র কুরআনে বায়তুল মালের সম্পদ ব্যয়ের যে সমস্ত খাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সে সমস্ত খাতেই বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করতেন। এমন কি তিনি ঋণগ্রস্ত লোকের ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

ইবনে সাদ বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এক ঋণগ্রস্ত লোকের পঁচাত্তর দীনার ঋণ পরিশোধ করলেন। আর এটা ঋণগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত অংশ হতেই প্রদান করেছিলেন।

একবার আছেম, কাতাদা ও বশির ইবনে মুহাম্মদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট এসে হানাজেরায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার নিকট তাদের উভয়ের ঋণের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের পক্ষ হতে চার শত দীনার ঋণ আদায় করে দিলেন। এ সম্পর্কে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে কালব বংশের সাদকা হতে এই অর্থ প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা দীর্ঘদিন যাবৎ বায়তুলমালে জমা পড়েছিল।

অপর এক বর্ণনাকারী বলেন, একবার কাশেম ইবনে মুখাইমা তাঁর নিকট এসে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার আবেদন করল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঋণের পরিমাণ কত? সে বলল, ৯০ দীনার। তিনি বললেন ঠিক আছে, এটা ঋণ গ্রস্তদের অংশ হতেই আদায় করে দেওয়া হবে।

ইবনে আবি হাইছামা বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা থাকা অবস্থায় আমার আড়াই শত দীনার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

মূল কথা, পবিত্র কুরআন ও আল্লাহর রাসূল (সা) যে সমস্ত খাতে বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যতদিন মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা ছিলেন, ততদিন তিনি সে সমস্ত খাতেই বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি হকদারদের হক আদায় করতে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হকদারদেরকে বায়তুলমাল হতে নির্ধারিত অংশ প্রদান করতে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন এবং এ চিন্তায় কোন কোন সময় ক্রন্দনও করতেন।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বলেন, খলিফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) সেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সদাসর্বদা তাঁদের জন্য চিন্তা করতেন। যদি কোন দিন দিনের বেলায় সরকারী কাজকর্ম শেষ না হত সারা রাত্রই তিনি সেই কাজ করতেন। যখন তিনি রাষ্ট্রীয় কাজ হতে অবসর হতেন তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রদীপ আনিয়ে নিতেন এবং দু' রাকাত নামায পড়ে হাতের উপর মাথা রেখে বসে পড়তেন, আর অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গন্ডদ্বয় ভেসে যেত। তারপর এমন জোরে জোরে কাঁদতেন, শুনে মনে হত যেন, কাঁদতে কাঁদতে তার অন্তর ফেটে যাবে-তিনি ইন্তেকাল করবেন। তারপর সকাল হতে তিনি রোযা রাখতেন।

তার স্ত্রী ফাতেমা বলেন, আমি কখনও কখনও তাঁর নিকট এসে বলতাম, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার উপর কি আমার কোন অধিকার নেই? পূর্বে যা ছিল তাও কি এখন শেষ হয়ে গিয়েছে? তিনি বলতেন আমাকে আমার কাজে ছেড়ে তুমি তোমার মত থাক। আমি বলতাম, আমাকে কিছু বলেন। তখন তিনি বলতেন, আমি এ রাষ্ট্রের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। তাদের ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব, অসহায়, মুসাফির, অপারগ, বন্দী, সামান্য পুজির মালিক, বহু সন্তানের দরিদ্র পিতা যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে শহরে বন্দরে বসবাস করছে, তাদের কথা আমার স্মরণ হয়। আমি জানি এ সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আল্লাহর রাসূলও (সা) জিজ্ঞাসা করবেন। আমার ভয় হয়, যদি আল্লাহ আমার ওযর আপত্তি গ্রহণ না করেন, আল্লাহপাক আমার কোন দলীল না মানেন, তখন আমার কি উপায় হবে?

ইবনে আব্দুল হাকাম বর্ণনা করেন–

وَقَدِمَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنَ الْعِرَاقِ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَدْ خَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلٰى فَاطِمَةَ - وَهِيَ جَالِسَةٌ فِىْ بَيْتِهَا وَفِىْ يَدِهَا قُطْنٌ تُعَالِجُهُ فَسَلَّمَتْ فَرَدَّتْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَقَالَتْ لَهَا اُدْخُلِىْ فَلَمَّا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ رَفَعَتْ بَصَرَهَا فَلَمْ تَرَفِى الْبَيْتِ شَيْئًا لَهُ بَالٌ - فَقَالَتْ لِفَاطِمَةَ اِنَّمَا جِئْتُ لِاَمْرِ بَيْتِىْ مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ الْخَرَابِ فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ اِنَّمَا خَرَبَ هٰذَا الْبَيْتِ مِنْ عِمَارَةِ بُيُوْتِ اَمْثَالِكِ فَاَقْبَلَ عُمَرُ دَخَلَ الدَّارَ فَمَالَ اِلٰى بِئْرٍ فِىْ نَاحِيَةِ الدَّارِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا وَلَاءَ صَبَّهَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَكْثُرُ النَّظْرَ اِلٰى فَاطِمَةَ نَقَالَتْ لَهَا الْمَرْأَةُ اسْتَتَرِىْ مِنْ هٰذَا الطِّيَانِ فَاِنِّى اَرَاهُ يُدِيْمُ النَّظْرَ اِلَيْكِ فَقَالَتْ لَيْسَ هُوَ طِيَانٌ - هُوَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّ اَقْبَلَ عُمَرُ فَسَلَّمَ وَدَخَلَ بَيْتَهِ فَقَامَ اِلٰى مُصَلًّى كَانَ فِى الْبَيْتِ يُصَلِّىْ فِيْهِ فَسَالَ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ هِيَ هٰذِهٖ فَاَخَذَ مِكْتَلًا لَهُ فِيْهِ شَيْئٌ مِّنْ عِنَبٍ فَجَعَلَ يَتَخَيَّرُ لَهُ خَيْرُهُ يُنَاوِلُهَا اِيَّاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا حَاجَتُكِ فَقَالَتِ الْاِمْرَأَةُ لِىْ خَمْسَةُ بَنَاتٍ كُسَلٍ فَجِئْتُكَ اَبْتَغِىْ حُسْنَ نَظْرِكَ لَهُنَّ فَهِيَ يَقُوْلُ كُسَلٌ كُسَلٌ وَيَبْكِىْ فَاَخَذَ الدَّوَاةَ وَالْقِرْطَاسَ وَكَتَبَ اِلٰى وَاَلِىِّ الْعِرَاقِ الْخ -

একবার ইরাকের এক মহিলা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর গৃহে আগমন করল। এ মহিলা ফাতেমার নিকট গিয়ে উপস্থিত হল, তখন ফাতেমা গৃহে বসে সেলাইর কাজ করছিলেন, সে মহিলা তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের জওয়াব দিয়ে তাকে ঘরে এসে বসতে বললেন। তারপর ঘরে প্রবেশ করে উপবেশন করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল যে, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। এতে সে বলল, আমি এসেছি কি, এ খালি ঘরের ওসিলায় আমার ঘর পূর্ণ

করতে? ফাতেমা জওয়াব দিলেন, তোমার মত লোকদের ঘর ঠিক করতে গিয়ে এ ঘর বিরান হয়েছে।

তারপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘরের কাছেই একটি কূপ ছিল, তা হতে পানি উঠিয়ে প্রাঙ্গনস্থিত মাটিতে ঢাললেন। এ সময় তিনি বারবার ফাতেমাকে দেখছিলেন। সেই মহিলা ফাতেমাকে বলল, আপনি এই বেগানা লোকটি হতে কেন পর্দা করেন না? এ লোকটি বার বার আপনাকে দেখছে। ফাতেমা বললেন, ইনিইত আমিরুল মুমিনীন। তারপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম করলেন এবং তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তারপর জায়নামাযের দিকে যেতে যেতে মহিলার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ফাতেমা তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আঙ্গুরের ঝুড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে কয়েকটি ভাল আঙ্গুর সেই মহিলাকে দিলেন এবং তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। সে নিবেদন করল যে, আমি ইরাক হতে আগমন করেছি। আমার পাঁচটি কুমারী বালিকা আছে, আমি খুবই অভাবগ্রস্থ। এটা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর দোয়াত কলম নিয়ে ইরাকের শাসনকর্তাকে এক আদেশনামা লিখলেন এবং সে মহিলাকে বললেন, তোমার বড় মেয়ের নাম বল, সে বড় মেয়ের নাম বললে তিনি তার ভাতা ধার্য্য করলেন। মহিলা এতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বালিকার নাম জিজ্ঞেস করে তাদেরও ভাতা নির্ধারণ করলেন। মহিলা অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করল। পঞ্চম বালিকার জন্য তিনি কোন ভাতা বরাদ্দ না করে বললেন, এ চার জনের ভাতা দ্বারাই তারও খরচ বহন করতে পারবে।

সে মহিলা খলিফার আদেশনামা নিয়ে ইরাকে প্রত্যাবর্তন করল এবং যখন ইরাকের শাসনকর্তাকে সে আদেশ নামা দিল তখন তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন এবং আদেশনামা লেখকের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করল, তিনি কি ইন্তেকাল করেছেন? গভর্ণর বললেন, হ্যাঁ, এটা শুনে মহিলাও চিৎকার করে উঠল। গভর্ণর তাকে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার আশংকার কোন কারণ নেই। আমি কখনও এই মহামানবের চিঠির অমর্যাদা

করব না। অতঃপর তিনি তার কন্যাদের ভাতা নির্ধারণ করে তার সকল অভাব দূর করে দিলেন। কিন্তু তাদের এ ভাতার পরিমাণ কত ছিল, এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বনু উমাইয়াদের প্রত্যেকের জন্য দশ দীনার ভাতা দিয়েছিলেন। আর এটা ছিল সবচেয়ে কম ভাতা।

বর্ণনাকারীর ভাষ্যটি হলো, একবার আম্বা ইবনে সায়ীদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ-এর নিকট হতে বের হচ্ছিলেন, তখন বনু উমাইয়ার লোকেরা তাঁর দরজায় উপবিষ্ট ছিল। তাদের মধ্যে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকও ছিলেন। তিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত ছিলেন। লোকেরা আমার কাছে অভিযোগ করে বলল, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমাদেরকে মাত্র দশ দীনার ভাতা দিয়েছে। আমরা তার অসন্তুষ্টির ভয়ে ফিরিয়ে দেইনি। ইয়াযিদ বললেন, তাকে বল যে, আমি এ দশ দীনার ভাতা গ্রহন করব না। তিনি কি আমাকে তার পরবর্তী খলিফা মনে করেন না? আম্বা খলিফার কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনার পিতার বংশধরেরা আপনার দরজায় উপবিষ্ট। দশ দীনার করে ভাতা দেওয়াতে তারা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। ইয়াযিদ বলেন যে, আপনি কি মনে করেন? তিনি কি আপনার পরবর্তী খলিফা নন? হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আম্বাকে বললেন, তাদেরকে আমার সালাম দিয়ে বল যে, আমি গতরাত্রে সারারাত্র জেগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি এবং আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছি, যাতে সমস্ত মুসলমানগণকে বাদ দিয়ে তাদের কিছু না দেই। আল্লাহর কসম! আমি সমস্ত মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে একটি দেরহামও অতিরিক্ত প্রদান করব না, যদি দেই তবে তখনই দিব যখন সকলেই এই পরিমাণ পাবে।

এ ভাষ্য দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বনু উমাইয়ার লোকদের দশ দীনার ভাতা দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝা যায় যে, এ পরিমাণ তিনি প্রত্যেক মুসলমানকেই প্রদান করতেন।

আমরা সঠিক বলতে পারি না যে, তিনি কি তাদেরকে মাসিক দশ দীনার দিতেন, না এটা তাদের জন্য তার বিশেষ অনুদান ছিল। এ দশ দীনার

দিয়ে তিনি তার আত্মীয়দেরকে তার অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। কারণ ইবনে আব্দুল হাজামের অপর এক বর্ণনায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বায়তুল মালের কোন অর্থ হকদার ব্যতীত অন্য কাকেও বা কোন আমির-উমারাকেও প্রদান করতেন না।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, একবার আম্বা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট অর্থ চেয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, তোমার কাছে যে মাল আছে যদি তা হালাল হয়, তবে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর যদি হারাম হয় তবে সেটা বৃদ্ধি করো না। আমাকে বল, তুমি কি দরিদ্র? সে বলল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঋণগ্রস্থ? সে বলল না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, তবে আমার কাছে আল্লাহর দেয়া আমানত হতে বিনা প্রয়োজনে তোমাকে কিছু দিতে তুমি কেন আমাকে পরামর্শ দাও? যদি তুমি অভাবী হতে তবে তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারে সে পরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে দিতাম। তুমি যদি ঋণগ্রস্ত হতে তবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার নিকট যে সম্পদ আছে তাই খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।

এ সমস্ত হকদার ছাড়াও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বায়তুল মাল হতে ঐ সময় লোকদেরকে একশত হতে তিনশত দীনার পর্যন্ত ভাতা প্রদান করতেন– যারা জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বাদী হতেন অথবা তাঁর নিকট আবেদন পেশ করার জন্য দূর দূরান্ত হতে সফর করে আগমন করত।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার অধীনস্ত কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি কোন জুলুম প্রতিরোধ করতে অথবা ধর্মীয় সংস্কারমূলক কোন কাজ করার জন্যে আমাদের কাছে আগমন করবে তা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হোক বা সামাজিক ব্যাপারই হোক তাকে একশত হতে তিনশত দীনার প্রদান করবে। হয়ত আল্লাহ তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেবেন, আর না হয় তার মাধ্যমে কোন বাতিল শক্তি ধ্বংস করে দিবেন বা তার দ্বারা কোন মঙ্গল সাধিত হবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বায়তুলমাল হতে কুমারী মেয়েদের বিবাহ এবং যিম্মি সংস্কার উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কুফার শাসনকর্তা যায়িদ ইবনে আব্দুর রহমানকে তাঁর এক পত্রের উত্তরে লিখলেন, তুমি লিখেছ যে সৈন্য বাহিনীর বেতন ভাতা প্রদান করার পরও তোমার কাছে অর্থ উদ্বৃত রয়েছে। তবে তুমি অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে এখন ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করে দাও। যারা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেনি এবং যে সমস্ত লোক অর্থাভাবে বিবাহ করতে পারেনি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। যায়েদ তাঁর নির্দেশ যথাযথ কার্যকরী করার পরও তার নিকট অর্থ থেকে গেল। তিনি পুনরায় লিখলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ নির্দেশ দিলেন যে, এ অতিরিক্ত সম্পদ তুমি অমুসলিম কৃষকদের ও অন্যান্যদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিতরণ কর যেহেতু তাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দু' এক বছরের জন্য নয়।

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকের এ ঘটনা বর্ণনা করে সে নির্দেশনামার শেষ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন তা এই–

انْظُرْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ فَضَعُفَ عَنْ اَرْضِهِ فَاَسْلِفْ مَا يَقْوٰى بِهِ عَمَلَ اَرْضِهِ فَاِنَّا لَانُرِيْدُهُمْ لِعَامٍ وَلَا عَامَيْنِ -

অর্থাৎ যে সমস্ত লোক জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এর ফলে তার ক্ষেত বা অন্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাকে তার অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান কর। যাতে সে ভালরূপে কৃষিকাজ করতে পারে। কারণ আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক এক বা দু' বছরের নয়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গরীব মুসাফিরদের সফরের খরচও বায়তুল মাল হতে বহন করতেন, কারণ পবিত্র কোরআন ইবনুস সাবীল দ্বারা মুসাফরিগণকে সাদকার অধিকারী করেছে। মুসাফিরদের আরাম আয়েসের জন্য তিনি তার রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে সরাই খানা নির্মাণ করেছিলেন এবং কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এ সমস্ত সরাইখানায় যে সমস্ত মুসাফির অবস্থান করবে সরকারী মেহমান খানা হতে তাদেরকে একদিন ও এক রাতের খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং অসুস্থ মুসাফিরদের দু দিন ও দু রাতের খোরাকীর ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত মুসাফির দেশে ফিরে

যেতে চায় অথচ রাস্তা খরচের অভাবে দেশে যেতে পারেনা, তাদের দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিবে।

মূল কথা হলো, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা হবার পর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই বায়তুলমালের উপর ন্যস্ত করলেন। জনসাধারণের মধ্যে এমন কোন দরিদ্র-অভাবী হকদার ছিল না, বায়তুলমাল যার ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। এ কারণেই তার মাত্র দু' বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে সমগ্র জনসাধারণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গিয়েছিল-কোথাও কোন দরিদ্র ও অভাবী লোক ছিল না।

এ সম্পর্কে ইবনে আব্দুল হাকাম যায়েদ ইবনে খাত্তাবের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মাত্র আড়াই বছর মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন। এ সামান্য সময়ের মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এ দাঁড়াল যে, কোন কোন লোক বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে আমাদের কাছে এসে বলত, আমার এই সম্পদ গ্রহণ করুন এবং আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। তখন তার এ ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিয়ে বলা হত যে, আমাদের জানামতে এমন গরীব লোক নেই যাকে এই ধন-সম্পদ দেয়া যেতে পারে। কারণ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের প্রচেষ্টায় দেশের সমস্ত মানুষই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

এটা কোন বাহুল্য কথা নয়। রাষ্ট্রে সকল অভাবী ও দরিদ্র হকদারদের জন্য ওমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই দরিদ্র ও অভাবের কোন প্রশ্নই ছিল না। এসমস্ত দোষ শুধু সে সব স্থানেই প্রকাশ পায়, যেখানকার শাসকগণ স্বার্থপর ও লোভী, যেখানকার শাসকগণ বায়তুলমালের অর্থ নিজেরা আত্মসাত করে এবং যেখানে সাধারণভাবে মানুষের উপর জোর-জুলুম করা হয়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জোর জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবার সুযোগই ছিল না। তিনি বায়তুলমালকে একটি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করতেন। তার একটি কপর্দকও বৈধখাত ব্যতীত খরচ করতেন না।

শরিয়ত বিরোধী আইনের সংস্কার

শরিয়ত বিরোধী আইনের সংস্কারের মহান খেদমতের কারণে সমকালীন আলেম সমাজ ও ঐতিহাসিকগণ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে খুলাফায়ে রাশেদা যুগের হাদী প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তিনি এ মহান খেদমতের ফলেই দ্বিতীয় ওমর ও যুগের আবুবকর হিসেবে প্রশংসিত হতে পেরেছিলেন।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম দিনই রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের নিকট তিনি যে আদেশ নামা লিখেছিলেন– তাতে সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইসলামের কতকগুলি শরায়ে ও সুনাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ সবগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করে তার ঈমান পূর্ণ হয়েছে, আর যে ব্যক্তি সে অনুযায়ী কাজ করে না, তার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গেছে। যদি আমি জীবিত থাকি তবে তোমাদেরকে এ সমস্ত নমুনা বা পদ্ধতি শিক্ষা দেব। সে অনুযায়ী কাজ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করব। আর যদি মরে যাই তবে আমি তোমাদের মধ্যে থাকার জন্য লোভী নই।

ইবনে আবদুল হাকাম বলেন যে, তিনি সেদিন সাধারণ ভাষণে এ কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ وَ وِلَاةِ الْاَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا الْاَ خْذُ بِهَا اِعْتِصَامٌ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقُوَّةٌ عَلٰى دِيْنِ اللّٰهِ لَيْسَ لِاَخْذٍ تَبْدِيْلُهَا وَلَا تَغَيُّرُهَا وَلَا اُنْظُرُ فِىْ خَالِفُهَا فَمَنِ اهْتَدٰى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ وَمَنْ اِسْتَنْصَرَبِهَا فَهُوَ مَنْصُوْرٌ وَمَنْ تَرَكَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا وَاللّٰهِ مَا تَوَلّٰى وَاصِلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَائَتْ مَصِيْرًا -

আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তার মহান খলিফাগণ আমাদের জন্য একটি কর্ম পদ্ধতি রেখে গিয়েছেন। সে কর্ম পদ্ধতির অনুসরণ করেই আল্লাহর কিতাবের বাস্তবায়ন ও তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব-অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তিই তা পরিবর্তনের সাহস দেখাতে পারে না, এমনকি এ কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী কোন চিন্তাও করতে পারে না। যে এর দ্বারা পথের

সন্ধান করবে সে সুষ্ঠুপথের সন্ধান পাবে, যে এর সাহায্য কামনা করবে সে সফলকাম হবে, আর যে এটা বর্জন করে অন্য কোন পথে চলবে, তার পরিণাম হবে দুঃখময় জাহান্নাম।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের নবীর পর আর কোন নবী আসবেন না। তোমাদের নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এরপর আর কোন কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। অতএব আল্লাহ্ পাক তাঁর মাধ্যমে যা হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল থাকবে এবং যা হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হিসেবে গণ্য হবে। আমি এমন বিচারক নই যে, আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কিছুর মীমাংসা দান করব। আমি শুধু আল্লাহর নির্দেশসমূহকেই বাস্তবায়িত করব এর ব্যতিক্রম কিছুই করব না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে এ কথাও বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক কতকগুলো কাজ ফরয করে দিয়েছেন, কিছু কর্ম-পদ্ধতিও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে সফলতা লাভ করবে, আর যে তার বিরোধীতা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সাধারণ ভাষণে তিনি জনসাধারণকে আরো বলেছিলেন, সুন্নাতের বিপরীত জীবনে কোন শান্তি নেই। আর আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কোন সৃষ্ট জীবের অনুসরণ করা উচিত নয়।

ইবনে জাওযি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের প্রত্যেকটি চিঠিতে এ তিনটি বিষয়ের নির্দেশ অবশ্যই থাকত; সুন্নাতের সংস্কার, বেদআত প্রতিরোধ ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর প্রথম আদেশ নামাটির মর্মার্থ উল্লেখ করা হল।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও নবী এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিচ্ছি।

যে সমস্ত কাজ করতে হবে এবং যে সমস্ত কাজ করতে হবে না আল্লাহ পাক সে সমস্ত তার কিতাবে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর

কিতাবের নির্দেশ মত চল তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতি মেনে নাও। তিনি যে সমস্ত কাজের নির্দেশ দিয়েছেন সেটাও কর্তব্য বলে মনে কর। তার মুশাবিহাত গুলোর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের যা শিখাতে চান তা স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন।

তিনি যা হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল আর যা হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আল্লাহ তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নবীকে অবহিত করেছেন। নবী তা উত্তম রূপে উপলব্ধি করেছেন এবং সে পদ্ধতির অনুসরণেই তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আল্লাহ পাক তাঁর কিতাব ও তার নবীর মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়ার সকল বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন কোন কিছুই বাদ দেননি। এটা তোমাদের জন্য এক বিরাট নেয়ামত। এর জন্য তোমাদের আল্লাহর শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

আল্লাহর কিতাব ও নবীর পদ্ধতিতে তোমাদের কারো কোন প্রকার ছল চাতুরীর সুযোগ নেই। সে সমস্ত নির্দেশের সামনে তোমাদের কারো ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য নেই। তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল সে সমস্ত নির্দেশকে বাস্তবায়িত করা, তার জন্য চেষ্টা করা। অবশ্য যে সমস্ত বিষয়ে মীমাংসা করা শুধু শাসকেরই দায়িত্ব তাতে বাড়াবাড়ি করবে না এবং তার মতামত ব্যতীত কোন ফায়সালা করবে না।

আমি আমার চিঠির মাধ্যমে তোমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলাম। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের পূর্বে তোমরা ভ্রষ্ট ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে। তোমাদের জীবন ছিল বেকার। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের সে দুর্বলতাকে সম্মান, শান্তি ও সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অন্যের হস্তস্থিত যে সমস্ত সম্পদ তোমরা লাভ করতে সমর্থ ছিলেনা, আল্লাহ সেসব তোমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ পাক বিশ্বাসীদের সাথে এ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন।

আমি শুধু এ উদ্দেশ্যেই এ পত্র লিখছি, আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে যারা আজও অজ্ঞ, তারা যেন সাবধান হয়ে যায় এবং তারা যেন এটাও জেনে রাখে যে, আমি বাকপ্রিয় নই, তবে হ্যাঁ, যে সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের প্রয়োজন সেখানে ভিন্ন কথা।

স্মরণ রেখ, আমি আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত এবং আমার পূর্ববর্তীদের আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছি।

এ পবিত্র পত্রটি খুব দীর্ঘ। আমরা এর কিছু অংশ এ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম যেন সম্মানিত পাঠকবৃন্দ জানতে পারেন যে, এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হয়েও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কর্মচারীদের সামনে কোন ধরণের কর্মপদ্ধতি পেশ করেছিলেন।

এ পত্রে একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের যুক্তিও আছে, অপরদিকে একজন দৃঢ়চেতা শাসকের আত্মবিশ্বাসেরও অভিব্যক্তি রয়েছে।

এরপর তিনি অপর একটি পত্রে তার কর্মচারীদেরকে শুধু একজন দৃঢ়চেতা শাসক হিসেবে সম্বোধন করেছেন।

তিনি লিখেছিলেন, তোমরা এটা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর, যখন তোমরা কোন মজলিসে কথা বলবে বা নিজ বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলা মেশা করবে তখন আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই উল্লেখ করবে। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ হতে ফিরিয়ে রাখবে। মনে রেখ, সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্তমান, যেমন আলোকের বিরুদ্ধে অন্ধকার বর্তমান। জাতি সৎপথ স্বরূপ দৃষ্টিশক্তি লাভ করার পর তাকে ভ্রষ্টতা স্বরূপ অন্ধকার হতে বাঁচিয়ে রাখা তোমাদের মৌলিক দায়িত্ব।

আমি তোমাদের যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছি যথাযথ ভাবে তার অনুসরণ কর এবং যে সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছি তা হতে বিরত থাক। তোমাদের কেউ যেন আমার ইচ্ছা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। কারণ তোমাদের নিকট যে ধন-সম্পদ রয়েছে আমি তার আকাঙ্ক্ষী নই এবং আমার নিকট যা আছে তাতেও আমার খুব একটা আসক্তি নেই।

মনে রেখ, আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের সাথে যে কোন প্রকার বিরোধ সহ্য করা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল এবং আমার নির্দেশের বিরোধীতা করবে আমিও কখনও তাকে শাসন ক্ষমতায় থাকতে দিব না।

উপরের লাইন কয়টির উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ভালভাবেই জানতেন যে, তার কর্মচারীদের

কারও নিকট অগাধ ধন-সম্পদ রয়েছে। সে হয়ত তার ধন-সম্পদের জোরে তাঁর অন্তর জয় করতে চেষ্টা করবে। এ জন্যই তিনি প্রথম হতেই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের লেখা সমস্ত চিঠিসমূহ সামনে রাখলে ইবনে জাওযির বর্ণনাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর লেখা একটি চিঠির মর্মার্থ উল্লেখ করা হল।

যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, তুমি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছ এবং ভবিষ্যতে যেখানে পৌছাবে তার প্রতিও সদা লক্ষ্য রেখ। শত্রুর সাথে যেভাবে সংগ্রাম কর নিজ প্রবৃত্তির সাথে সে রূপেই সংগ্রাম কর। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ঘৃণিত কাজে ধৈর্য ধারণ কর। তিনি মুমিনদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর সেই সব প্রতিশ্রুতির প্রতি গভীর ভাবে বিশ্বাস রেখ।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার অধীনস্থ লোকদের প্রতি কড়াকড়ি করতে এবং সৈনিকদের কঠোর শাস্তি দিতে নিষেধ করে সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ চিঠিতে তিনি আরও লিখলেন, নিজের অধীনস্থদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। তাদের নগদ অর্থ বা অন্য কোন বস্তু সামগ্রীর ভেট গ্রহণ করবে না, এমনকি প্রশংসা এবং কাব্যের দ্বারাও না।

তোমার নিজের দ্বার রক্ষক সৈনিকের, প্রহরীদের এবং বাইরে যাতায়াতকারী কর্মচারীদের নিকট হতে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর যে, তারা কারো প্রতি জুলুম-অন্যায় করবে না, কাউকে কষ্ট দেবে না। সবসময় তাদের কঠোর হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবে! তাদের মধ্যে যে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ তাকে উত্তমরূপে পুরস্কার প্রদান করবে। আর যে অসৎ ও অলস তাকে চাকরী হতে বরখাস্ত করবে এবং তার পরিবর্তে সৎ কর্তব্য সচেতন ঈমানদার লোক নিয়োগ দিবে। আল্লাহ পাক তার নিকট তাঁর সৃষ্টি জীবের উপর আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের কাজ সহজ করে দেন, আমাদের অন্তরে সৎকর্মের প্রেরণা দান করেন, আমাদেরকে সংযমশীলতার তওফিক দান করেন এবং তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট তাই যেন করতে সুযোগ দান করেন তার অপছন্দনীয় কাজ হতে যেন আমাদেরকে বিরত রাখেন।

তিনি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট যখন এ দুটি পত্র প্রেরণ করেন, প্রায় সে সময়ই খাওয়ারেজদের কতিপয় দলপতির নিকটও একটি পত্র লিখেছিলেন। নিম্নে তার মর্মার্থ উল্লেখ করা হলো–

আল্লাহ পাক নগন্য বান্দা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট হতে তাদের নামে যারা দল ত্যাগ করে পৃথক হয়ে গিয়েছে আমি তোমাদের আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত অনুসরণের জন্য আহবান করছি। মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং সৎকর্মের আহবান করে, তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার আছে? এবং বলে আমি আত্মসমর্পণকারী। আমি তোমাদেরকে তোমাদের নেতাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কিসের ভিত্তিতে দ্বীন ত্যাগ করেছ, হারাম রক্তকে হালাল করেছ এবং হারাম মাল গ্রহণ করেছ?

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সেনাপতি মানসুর ইবনে সালেবকে যখন দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্বাচন করলেন এবং সৈন্য বাহিনীসহ তাকে বাহিরে প্রেরণ করলেন, তখনও তিনি তাকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ ছিল– প্রত্যেক কাজ ও কথায় আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ আল্লাহর ভয়ই সর্বপ্রকার সৎকর্মের উৎস। তারপর তাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার ও তোমার সঙ্গীদের আল্লাহ দ্রোহীতাকেই সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করবে এবং সবসময় তা হতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে।

এরূপ একটি সাধারণ পত্র তিনি তাঁর সেনাপতিদেরকেও লিখেছিলেন। তাদেরকেও এ কথাই বুঝিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে তার দ্বীন তার জীবন ও তার পরকাল সব কিছুতেই সীমাহীন সুখ-শান্তি লাভ করবে।

সামরিক বেসামরিক সমস্ত কর্মচারী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এর চেয়ে আরও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত ছিল।

আমি প্রত্যেক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করতে, আমানত রক্ষা করতে এবং আল্লাহর নির্দেশসমূহ বাস্তবায়িত

করতে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি। অপর একটি আদেশে তিনি সমস্ত কর্মচারীদের বলেছিলেন যে, স্মরণ রেখ, আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা)কে যে সত্য দ্বীন, যে আলো ও জীবন ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন তা প্রচলিত সমস্ত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার উপর জয়ী হবে, যদিও অংশীবাদীগণ তা অপছন্দ করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)কে যে কিতাবসহ দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য এবং তার নির্দেশ সমূহের অনুসরণ কর, আল্লাহর কিতাব যে কাজ হতে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক, তার নির্দেশ মত হুদুদ প্রতিষ্টিত কর, তাঁর নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়িত কর, তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে সেই সৎপথ প্রাপ্ত হয়; আর যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কুপথ ও অশুভ পরিণামের প্রতিই ধাবিত হয়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার সামরিক ও বেসামরিক কর্ম-কর্তাদেরকে শুধু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সময় সময় তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শরীয়তের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি তার এক পত্রে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, “প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আমার মতে সকল মুসলমানকেই তা হতে বিরত থাকতে হবে, সকলেই এর ব্যবহার নিজের জন্য হারাম মনে করবে। কেননা এটা সমস্ত অন্যায় কর্মের মূল উৎস। আমার ভয় হয়, যদি মুসলমানগণ এর ব্যবহার করে তবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

বাজারের জিনিস পত্রে মাপ ও পরিমাণ সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন, আমার মতে সমগ্র রাষ্ট্রে সর্বত্রই পরিমাপও বাটখারা একই হওয়া উচিত। এতে কোন বেশকম যেন না থাকে। ফলে মাপে কম দেয়ার আর সম্ভাবনা থাকবে না। তিনি লিখলেন উশর (উৎপন্ন শষ্যের দশমাংশ) শুধু কৃষকদের নিকট হতেই গ্রহণ করা যাবে। কৃষকগণই শুধু এর যোগ্য অন্য কেহ নয়।

জিযিয়া-কর দেওয়ার যোগ্য তিন ব্যক্তি। জমির মালিক, এমন শিল্পী যে উৎপাদন করতে সক্ষম এবং যে ব্যবসায়ী ব্যবসা বাণিজ্য করে তার সম্পদ বৃদ্ধি করে ও লাভবান হয়। এ তিন ব্যক্তির জিযিয়া-কর সমান সমান হবে।

তাদের সম্পদে মুসলমানদের সাদকা প্রাপ্য। বছরে তা একবার গ্রহণীয়। যখনই তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে, তার প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রমাণ দিতে হবে যে এ বৎসর তার নিকট হতে আর কোন কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। নগরশুল্ক, এটা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। মানুষের সম্পদ হতে নগরশুল্ক গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহর জমিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তারপর লিখলেন– আমার মতে কোন শাসনকর্তা বা কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিজ নিজ কর্মস্থলে কোন ব্যবসা করতে পারবে না।

তিনি তা বর্ণনা করে বলেছেন, এতে তারা অবৈধভাবে অতিরিক্ত লাভবান হবার সুযোগ পাবে। কারণ মানুষ অধিক মূল্যে তার জিনিষপত্র ক্রয় করবে, ফলে শাসক ও কর্মকর্তাদের মনে অধিক অর্থের লোভ সৃষ্টি হবে। তিনি আরও লিখলেন, জমির উত্তরাধিকার তার সত্বাধিকারীদের উত্তরাধিকারীদের জন্য অথবা যারা তাদের মত শুল্ক প্রদান করে, তাদের জন্য। তাদের নিকট হতে জিযিয়া-কর নেয়া যাবে না অবশ্য শাসক বৈধ খেরাজ গ্রহণ করার জন্য তাদের নিকট আদায়কারী পাঠাতে পারবেন এবং সে তার নিকট হতে বৈধ রাজস্ব আদায় করতে পারবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি জমির মালিক, কৃষককুল ও সাধারণ নাগরিকদের নিকট হতে সর্বপ্রকার অবৈধ কর যা কুরআন অথবা রাসূলল্লাহ (সা) প্রবর্তন করেননি, তার সবকিছুই বন্ধ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাজস্বের যে হার ধার্য করেছিলেন, তিনি সেই হারকেই বহাল বা পূনঃপ্রবর্তন করলেন। এমনকি জিযিয়া-কর ও রাজস্বের শরিয়ত নির্ধারিত হার পুণপ্রবর্তন করলেন। অমুসলিম ধনীদের নিকট হতে ৪৮ দেরহাম এবং দরিদ্রদের নিকট হতে ১২ দেরহাম ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর আদায় বৈধ মনে করতেন না। হযরত ওমর ফারুক (রা) জমির উৎপাদনের স্তর ভিত্তিক বিভিন্ন জমির যে কর ধার্য করেছিলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাই পুনঃপ্রবর্তন করলেন। ইবনে সাদ বলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ স্বীয় কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় তা আদায় কর আর যে না দেয় তাকে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও।

একবার তিনি তার কর্মচারীগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বললেন, জন সাধারণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সংস্কারের জন্য কমপক্ষে ততটুকু করবে, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ জোর-জুলুম করতে যতটুকু চেষ্টা করেছিল। একবার তিনি তার কর্মচারী আদী ইবনে আরতাতকে লিখলেন, আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, আকরাদের (স্থান বিশেষ) পথে চলন্ত পথিকদের নিকট হতে কতিপয় লোক উশর আদায় করছে। যদি আমি তা জানতে পারি যে তুমি তাদেরকে এরূপ কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছ অথবা জানার পর তুমি তা প্রতিরোধ করনি, তবে আমি কখনও তোমার চেহারা দেখব না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ শুধু অপছন্দনীয় কাজ-কর্মের জন্য তার কর্মচারীগণকে সতর্কই করতেন না, বরং তাদেরকে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত করার সময় সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদিও তাদেরকে প্রদান করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- তিনি মিশরের শাসনকর্তা আয়্যুব ইবনে মুরাহিলকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন, এতে তিনি বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজের কথা উল্লেখ করে তাদের হুরমত বা অবৈধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও উদ্ধৃত করলেন।

তিনি লিখলেন, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের তিনটি সূরায় মদ সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল করেছেন। প্রথম দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হবার পরও মানুষ মদ্যপান করত, তৃতীয় আয়াত দ্বারা মদ্যপান হারাম ঘোষণা করা হয় এবং স্থায়ীভাবে হারামের হুকুম বলবত করা হয়।

আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম বললেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

অর্থাৎ তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য ভীষণ গোনাহ তবে কিছু লাভও আছে। যেহেতু এই আয়াতে লাভের কথাও আছে, কাজেই এর পরও লোক মদ্যপান করত। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হল-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হইয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পার। তখনও লোক নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করত। তারপর আল্লাহ পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ হে বিশ্ববাসীগণ! মদ, জুয়া, জুয়ার কাঠিও শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব তোমরা এ সমস্ত কাজ হতে দূরে থাক, তা হলে তোমরা সফলতা লাভ করবে। এ মদের দ্বারা বহু লোক চরিত্র বিনষ্ট করে ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। অনেকে নেশার ঘোরে হারাম বস্তুকে হালাল করে নেয়। অন্যায় রক্তপাত, হারাম সম্পদ ভোগ এবং অবৈধ যৌন ক্রিয়াকে হালাল মনে করে। কোন কোন লোক বলেন যে, "আলা" (এক প্রকার হালকা মাদক দ্রব্য) পান করা যায়, কিন্তু আমার জীবনের শপথ, পানাহারে যে দ্রব্যই মদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তবে তা হতে নিরাপদ দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়।

কর্মচারীদের হিসাব-নিকাশ

বর্তমানে এটা যদিও অসম্ভব বলেই মনে হয় কিন্তু তবুও সত্য কথা হলো হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও যদি ঘটনাক্রমে কোন কর্মচারী শরিয়ত বিমুখ হয়ে যেত তখন তার কঠোর হিসাব নিকাশ গ্রহণ করতেন। তার কোন কর্মচারী বা শাসনকর্তা ন্যায়বিচার ও ইসলামী জীবন বিধানের বিপরীত কোন কাজ করলে তিনি এক মূহুর্তের জন্যও তা সহ্য করতেন না। তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন অথবা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতেন। তবে আশ্চার্যের কথা হলো, কোন অপরাধী কর্মচারীকেও তিনি শরীয়ত বিরোধী শাস্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ইবনে জাওযি বলেন– তার নিয়োজিত মদীনার শাসনকর্তা বায়তুল মালের সম্পদ আত্মসাত করেছে। কিন্তু তা এখনও তারা ফেরত দেয়নি। ইবনে হাজম এ অবস্থা সম্পর্কে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে অবহিত করিয়ে যে সমস্ত কর্মচারী এখনও লুণ্ঠিত অর্থ ফেরত দেয়নি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ চিঠি পাওয়ার পর ইবনে হাজমকে খুব কঠোর ভাষায় লিখলেন– অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, তুমি মনে করছ এ অনুমতিই তোমাকে আল্লাহর গজব হতে রক্ষা করবে। সাবধান! যার বিরুদ্ধে দৃঢ় সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তার নিকট হতে সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী লুণ্ঠিত অর্থ আদায় কর, আর যে নিজেই স্বীকার করে তার স্বীকারোক্তি মতই তার নিকট হতে আদায় কর। কিন্তু যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে কসম করতে বল, যদি সে কসম করে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। এ জাতীয় একটি চিঠি তার কর্মচারীকে শাস্তি দিতে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকেও কঠোর ভাষায় এরূপই লিখলেন এবং তাকেও কর্মচারীদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।

একবার ইরাকের শাসনকর্তা আব্দুল হামিদকেও এরূপ কর্মচারীদের শাস্তি বিধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় খলিফা তাকেও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে উক্ত কাজ করতে নিষেধ করলেন। তখন অপর দিক হতে উত্তর আসল এভাবে চলতে থাকলে বায়তুল মাল শুন্য হয়ে পড়বে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে লিখলেন, তাহলে তুমি তাতে ঘাস ভরে দাও। ইবনে জাওযি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এক আদেশ জারী করে কর্মচারীগণকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়ে বললেন।

নগরের অনাবিল শান্তি, প্রজাদের আন্তরিক ভালবাসা ও তাদের প্রশংসা লাভ করতেই শাসকদের সুখ ও আনন্দ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যেভাবে কর্মচারীদের হিসাব-নিকাশ করতেন যার ফলে তার কোন কর্মচারীই তার অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সাহস পেত না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এক কর্মচারী তাকে লিখলেন,

মানুষ আপনার খেলাফত লাভের খবর শুনেই দ্রুততার সাথে যাকাত আদায় করতে শুরু করেছে। এখন আমার নিকট প্রচুর সম্পদ জমা হয়েছে। আমি আপনার মতামত ব্যতীত কোন কিছু করতে পছন্দ করিনি। এর উত্তরে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খুব সংক্ষিপ্ত একটি চিঠি লিখলেন। আমার জীবনের কসম! তারা আমাকে ও তোমাকে তাদের আশানুরূপ পায়নি। তুমি তাদের সম্পদ কে আটকিয়ে রেখেছো? আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে। জারাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ খুরাসানের উপ-প্রশাসক ছিলেন। তিনি এর উমুবী শাহজাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আহতামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করলেন। লোকটি খুবই অযোগ্য ছিল। সে সাধারণ নাগরিকদের অধিকারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জারাহকে কঠোর ভাষায় লিখলেন, আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আহতামের কোন কাজেই যেন বরকত না দেন। তাকে এখনই বরখাস্ত কর। অথচ সে ছিল খলিফার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

তিনি আরো লিখলেন, আমি জানতে পারলাম যে, তুমি আম্বারাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করেছ। আম্বারার কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি তার জুলুম নির্যাতনকে পছন্দ করি না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের রক্ত দিয়ে তার হাত রঙ্গীন করে এমন লোকের আমার কোন প্রয়োজন নেই। এখনই তুমি তাকে বরখাস্ত কর। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তার কর্মচারী ও প্রজাদের খুঁটি নাটি বিষয়েরও খবর রাখতেন এবং অশোভন কাজ হতে তাদেরকে সতর্ক করতেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, একবার তিনি জানতে পারলেন বসরার কিছু অভিজাত শ্রেনীর আমীর এমন আছেন যে, খাওয়ার পর তাদের সেবকরা তাদের হাত ধৌত করিয়ে দেয় এবং তস্তরী পূর্ণ হবার পূর্বেই তা উঠিয়ে নেয়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ একে ইসলামী আদাবের পরিপন্থি বলে মনে করলেন। তিনি এ ব্যাপারে বাসরার শাসনকর্তার দৃষ্টি আর্কষণ করে লিখলেন,

আমি জানতে পারলাম, লোক হাত ধৌত করার সময় তস্তরী পূর্ণ হবার পূর্বে উঠিয়ে নেয়। এটা অনরাবদের নীতি। তুমি আমার এ পত্র পাওয়া মাত্রই এ নিয়ম বন্ধ কর। যতক্ষণ তস্তরী পূর্ণ না হয় বা শেষ ব্যক্তি হাত ধৌত না

করে ততক্ষণ যেন তস্তরী উঠান না হয়। কিছুদিন পূর্বে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ইন্তেকাল হয়, কিন্তু সে সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার চালু হয়ে যায়। এই জন্যই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন আদীকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, তখন তিনি তার নিকট ক্রমাগত পত্র লিখতে লাগলেন এবং প্রত্যেক পত্রেই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কার্যাবলী বর্জন করতে নির্দেশ দিতেন। তার একটি চিঠির মর্মার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল–

আমি তোমাকে বার বার পত্র লিখেছি, প্রত্যেক বারই আল্লাহর নিকট তোমার মঙ্গল কামনা করেছি এবং হাজ্জাজের কুপ্রথা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছি। সে নামাযে দেরী করত অথচ নামাযে দেরী করা উচিত নয়। সে মানুষের নিকট হতে অন্যায় অত্যাচার করে যাকাত আদায় করে সেটা অন্যায় পথেই খরচ করত। এ সব কাজ হতে বিরত থাক। আল্লাহ্পাক হাজ্জাজের মৃত্যুর মাধ্যমে দেশ ও জনগণকে তার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেছেন। হাজ্জাজের জুলুম অত্যাচার ও অন্যায় কাজ কর্মের ফলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। যে সমস্ত লোক হাজ্জাজকে সহযোগিতা প্রদান করত তিনি তাদের সকলকেই পদচ্যুত করলেন। এমন কি এক ব্যক্তি সামান্য কয়েকদিন মাত্র হাজ্জাজের অধীনে কাজ করেছিল, তিনি তাকেও পদচ্যুত করলেন। সে ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট এসে আবেদন করল যে, আমি অল্প কয়েকদিন মাত্র তার অধীনে কাজ করেছি। তার উত্তরে তিনি বললেন, অসৎ সংসর্গ একদিন নয়, সামান্য সময় হলেই যথেষ্ট।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ হাজ্জাজের সম্পূর্ণ বংশের প্রতিই অসন্তুষ্ট ছিলেন। হাজ্জাজের এক নিকটাত্মীয় মুসলিম ছাকাফী কোন তত্ত্বধায়কের ভুলক্রমে এক সামরিক অভিযানের সময় সামরিক বাহিনীর কোষাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত ছিল। সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হবার পর তিনি তা জানতে পারলেন। তখন সৈন্যবাহিনী বেশ দূরে চলে গিয়েছে। তিনি তার পিছনে সে লোকের নামে একটি পত্র দিয়ে একটি লোককে দ্রুত পাঠালেন। এখনই ফিরে আসবে, কারণ তুমি যে বাহিনীতে থাকবে সে বাহিনী কখনও জয়ী হতে পারবে না। তার কর্মচারীগণ যখনই তাকে কোন ভুল পরামর্শ দিত, তিনি তার জন্য তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন।

ইবনে জাওযি বলেন, একবার ইরাকের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছালেহ ইবনে আবদুর রহমান ও তাঁর এক সহকর্মী হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে লিখছেন যে, "লোকের স্বভাব গঠন এবং সংস্কারের জন্য তরবারী ব্যবহার অপরিহার্য। যতক্ষণ তাদের কিছু লোকের শিরচ্ছেদ করা না হয় ততক্ষণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়।" হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ পত্র পেয়ে তাদেরকে তিরস্কার করে লিখলেন, "দুজন অভদ্র ও নিচু লোক তাদের নীচতার কারণে আমাকে মুসলমানদের রক্তপাতের জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। মনে রেখ, অন্যান্য মুসলমানদের রক্তপাতের চেয়ে তোমাদের দুজনের রক্তপাত আমার নিকট খুব কঠিন কাজ নয়।"

তিনি কোন প্রকার অবৈধ আমদানীর পক্ষপাতি ছিলেন না। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, ফিলিস্তিনের নাগরিকদের নিকট হতে নগরশুল্ক আদায় করা হয়। তিনি তার কর্মচারী আবদুল্লাহ ইবনে অউফকে লিখলেন, "নগর শুল্ক অফিসে গিয়ে তা ধ্বংস করে দাও, যা থাকে তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও, যাতে ওর নিশানাও না থাকে।" তাঁর জনৈক কর্মচারী কিছুটা অলস প্রকৃতির ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এটা জানতে পেরে তাকে লিখলেন, "কোন কথা নয়, তোমার আলস্য শুধু এ শর্তেই ক্ষমা করা যেতে পারে যে, তুমি তোমার হস্তকে মুসলমানের রক্ত হতে পবিত্র রাখবে, তোমার পেটে তাদের কোন মাল ভরবেনা এবং তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করবে না।

সৎ ও সংস্কারমূলক কাজ করতে হয়রত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কর্মচারীগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। যদি কোন কর্মচারী সৎ কাজ করতে বারবার তাঁর পরামর্শ চেয়ে সময় নষ্ট করত, তখন তিনি তাকেও ক্ষমা করতেন না- কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করতেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ইয়ামেনের গভর্ণরকে লিখলেন, আমি তোমাকে মুসলমানদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে গৃহীত মাল তাদেরকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছি। তুমি বারবার এর ব্যাখ্যা চেয়েছ। অথচ আমার ও তোমার মধ্যেকার দূরত্ব সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অবগত আছ। তুমি এমন করার সময় নিশ্চয় মৃত্যুর কথা ভুলে যাও। আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, মুসলমানদের উপর জুলুম-করা হয়েছে- তা বন্ধ কর। এর পরও তুমি আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে আমার সাথে কথা বল। সাবধান! তোমার কর্তব্য

মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ রাখা। আমার নিকট বারবার জিজ্ঞেসা করবে না। নিজের কর্তব্য পালন কর।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কর্মকর্তাগণকে এরূপ বলগাহীন স্বাধীনতা দিতেন না যে, তারা যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবে। তাদের শুধু এ অধিকার ছিল যে, তারা অপরাধীদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি প্রদান করবে।

ইবনে জাওযি এ সম্পর্কে তার একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন যা তিনি সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। নিম্নে সে চিঠির মর্মার্থ উল্লেখ করা হলো।

"মানুষকে তার অপরাধ অনুসারে শাস্তি প্রদান কর। যদি তা একটি বেত্রাঘাতও হয়। আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে না।

অবশ্য যে সমস্ত লোক অপরাধী ছিল বা যারা পেশাদার অপরাধী ছিল তাদের শাস্তি প্রদান করতে তিনি কখনও কর্মচারীকে নিষেধ করেন নি।

এ ব্যাপারে ইয়াহইয়া আরকাসানী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আমাকে মুসলিম প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিলেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখি যে, এটা চোর-ডাকাতদের একটি কেন্দ্র দুনিয়ার আর কোন শহরে এরূপ দেখা যায় না। আমি তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং অন্যায় ধারণার উপর কাকে শাস্তি দিব, একে অন্যের উপর মিথ্যা অভিযোগ করলে শাস্তি প্রদান করব না সুন্নাত অনুযায়ী যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণের পর শাস্তি প্রদান করব? হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উত্তরে লিখলেন, সাক্ষ্য অনুযায়ী শাস্তি প্রদান কর, সুন্নাত অনুযায়ী চল। যদি সততা তাদের সংস্কার করতে সমর্থ হয় তাহলে মনে করো, আল্লাহ তাদের সংস্কার ও সংশোধন চান না।

ইয়াহইয়া বলেন, আমি তাঁর আদেশ অনুযায়ীই কাজ করলাম কিন্তু যখন আমি মোসুল ত্যাগ করি তখন চুরি ডাকাতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ দিক দিয়ে সেটা দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট শহর ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কর্মচারীদের কাজ-কর্মের হিসাবই শুধু গ্রহণ করতেন না। জনসাধারণের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতেন এবং ভাল মন্দের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ইয়ামেনের গভর্ণরকে সেখানে একটি বংশ সম্পর্কে অবহিত

করে লিখলেন, এ বংশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখ, তাদেরকে নিকটবর্তী হতে সুযোগ দিও না, কোন কাজেই তাদেরকে শরীক করো না, এরা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক।

ইবনে জওযি বলেন, এরা ছিল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট আত্মীয় ছাকাফীর বংশধর।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গভর্ণদেরকে তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়ি করতে এবং অনর্থক জিজ্ঞেসাবাদ করে হয়রানী করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি জাজিয়ার গভর্ণরকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে লিখলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যাদের উপর গভর্ণর নিয়োগ করেছেন, তাদের দোষ ক্রটির জন্য তাদেরকে উপদেশ দান কর, তাদের দুর্বলতা যথাসাধ্য এড়িয়ে যাও, তবে হ্যাঁ, যে সমস্ত দোষ-ক্রটি এড়ানো আল্লাহর নিকট জায়েয নেই সেগুলো ধরতে হবে। যখন তাদের কোন কাজে তোমার ক্রোধের সঞ্চার হয় তখন আত্মসংবরণ কর এবং যদি তাদের কোন কাজে সন্তুষ্ট হও তখনও নিজেকে সংবরণ কর। এ দুই অবস্থার মধ্যে তোমার ও তাদের মধ্যকার একটি উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে। তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করবে এবং বঞ্চিত করতে ও ন্যায় এবং সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে দিন ও সময় অতিবাহিত হয় এবং তা তুমি মানুষের হক আদায় করার যে সুযোগ পাও সেটাকেও সৌভাগ্যের মনে কর।

তিনি সাধারণ নাগরিকগণকে হয়রানী করা মোটেই পছন্দ করতেন না। তার গভর্ণরগণকে সাধারণ মানুষকে হয়রানী করতে নিষেধ করে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তোমরা মানুষের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছ। যদি এটা তোমাদেরকে তাদের উপর জোর জুলুম করতে উৎসাহিত করে তাহলে স্মরণ রেখো, তোমরা যেরূপ তাদেরকে উৎপীড়ন করতে ক্ষমতা লাভ করেছ, আল্লাহ পাক সেরূপ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

যদিও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কথায় কথায় কর্মচারীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তাদের খোঁজ খবর নিতেন। সময় সময় গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের কাজ কর্মের তদন্ত করতেন, কিন্তু তবুও তিনি তার কোন

দোষী কর্মচারীর রক্তে তাঁর পবিত্র হাত কলঙ্কিত করেননি। যদি কেহ তার পরীক্ষায় সফল হত তখন তাকে বহাল রাখতেন আর তা না হলে অযোগ্য ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতেন এবং এমন শক্ত শাস্তি দিতেন যাতে তাকে কোন ভাবেই জালেম বলা না যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর কোন কর্মকর্তার বা সাধারণ কর্মচারীকে রক্ত দিয়ে তাদের হাত রঙ্গীন করেননি। তিনি নিজেই বলেন, তাদের রক্তের রঙ্গীন হাত নিয়ে আমার আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির চেয়ে তাদের অন্যায়ের বোঝা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

পূর্বে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে দিন সুলায়মানের ইন্তেকাল হল সে দিন তিনি তাকে দাফন করার পর সর্বপ্রথম অত্যাচারী জালেম শাসকগণকে পদচ্যুত করেছিলেন।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মিশরের রাজস্ব সচিব উসামা ইবনে যায়েদ একজন জালেম ও অত্যাচারী ছিল। তিনি তাকে পদচ্যুত করলেন বটে তবে তাকে ফাঁসিও দেননি বা হত্যাও করেননি। তাকে প্রত্যেক ছাওনিতে এক বছর করে বন্দী করে রাখতে নির্দেশ দিলেন। প্রথম বছর তাকে মিশরে বন্দী করে রাখা হল। তারপর তাকে ফিলিস্তিনে এনে আরও এক বৎসর বন্দী করে রাখা হয়।

উসামার মত আফ্রিকার শাসনকর্তা ইয়াযিদ ইবনে আবু মুসলিমও খুব অত্যাচারী শাসক ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকেও পদচ্যুত করলেন, তবে সে উসামার মত জালিম ছিল না, কাজেই তাকে পদচ্যুত করাই তার যথেষ্ট শাস্তি হওয়া মনে করেছিলেন।

অবশ্য তিনি বসরার শাসনকর্তা ইয়াযিদ ইবনে মুহালিবকে বরখাস্ত করার সাথে সাথে তাকে বন্দীও করেছিলেন। ইয়াযিদ সুলায়মানের যুগে একজন প্রভাবশালী শাসক ছিলেন। সুলায়মানের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ছিল। এসব কারণেই সে অনেক কাজ-কর্মের সীমা লংঘন করত। তাবারী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে প্রথমেই পদচ্যুত করেননি। কিন্তু সুলায়মানের মৃত্যু এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফত লাভের সংবাদেই সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার ক্ষমতার সময় শেষ হয়ে গেছে। কারণ সে নিজেকেও জানত এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজকেও জানত।

ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, ইয়াযিদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে একজন রিয়াকর বা বাক্যাড়ম্বর প্রিয় বলে মনে করত। অবশ্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা হওয়ার পর তার এ মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল কিন্তু তার সম্পর্কে খলিফার মনোভাব অপরিবর্তিত রয়ে গেল। প্রথমে ও তাঁর যে মনোভাব ছিল শেষেও সেই মনোভাবই ছিল। তিনি তাকে এবং তার সম্পূর্ণ বংশকেই জালেমও অত্যাচারী মনে করতেন। তার পদচ্যুতির কারণ এটা ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খেলাফত লাভ করার কিছুদিন পর তিনি আদী ইবনে আরতাতকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন এবং ইয়াযিদকে গ্রেফতার করে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। ইয়াযিদ তখন ওয়াসেত নামক স্থানে অবস্থান করছিল। যখন সে পদচ্যুতি ও গ্রেফতারের নির্দেশ পেল, তখন মূসা ইবনে ওয়াজিহ তাকে গ্রেফতার করে দামেস্কে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট পাঠিয়ে দিল। তিনি তার সাথে কোন কঠোর ব্যবহার করলেন না। অবশ্য তিনি তার নিকট সরকারী অর্থের হিসাব চাইলেন এবং ইয়াযিদ স্বেচ্ছায় সুলায়মানের নিকট যে অর্থের কথা স্বীকার করেছিল তা ফেরত চাইলেন। ইয়াযিদ খলিফার নির্দেশ কার্যকরী করতে অস্বীকার করে একটি ব্যাখ্যা পেশ করল যে. সে স্বীকারোক্তি কেবল ঔদ্ধত্বের কারণে ছিল, কারণ আপনি অবশ্য অবগত আছেন যে, খলিফা সুলায়মান আমাকে যথেষ্ট খাতির করতেন, তাঁর নিকট আমার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি স্বীকার করলেও তিনি আমার কাছে সে অর্থ ফেরত চাবেন না। শুধু এ জন্যই আমি স্বীকার করেছিলাম।

কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন না, তিনি তাকে এ বলে চাপ দিলেন যে, সে সুলায়মানের কাছে যে অর্থের কথা লিখিতভাবে স্বীকার করেছে অবশ্যই তা তাকে ফেরত দিতে হবে। ইয়াযিদ এ অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করলে তিনি তাকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠিয়ে দিবেন।

ইয়াযিদকে পদচ্যুত করার আরও অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ সে ছিল অত্যন্ত যালেম ও অত্যাচারী শাসক। দ্বিতীয়তঃ সে যথেচ্ছাভাবে সরকারী অর্থ খরচ করত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মতে এটা খিয়ানত

হিসেবেই গণ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ইয়াযিদ ইবনে মুহালিবকে বন্দী করা ছাড়া অন্য কোন শাস্তি প্রদান করেননি।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি ইয়াযিদকে একটি পশমী জুব্বা পরিধান করিয়ে ওয়াহলাকের দিকে বিতাড়িত করেছিলেন। অবশ্য কিছুদিন পর তার এ শাস্তি বাতিল করে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট মনে করলেন।

খুরাসানের শাসনকর্তা জাবিহ ইবনে আব্দুল্লাহকে তিনি পদচ্যুত করলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি দেড় বৎসর খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনিই ইয়াযিদ ইবনে মুহালিবের পুত্র মুখাল্লার শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ সংস্থাপক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাকে দেখেই সাধারণতঃ লোক প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ত। তিনি খুরাসানে আগমন করে দেড় বৎসর পর্যন্ত হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি খুরাসানে এসেই সেখানকার লোকদের সম্পর্কে রিপোর্ট লিখলেন এবং অপরাধী লোকদের বেত্রাঘাত করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং তাকে লিখলেন– হে জারাহ মা'র পুত্র, তুমি সাধারণ মানুষের চেয়ে ফেতনা ফাসাদের দিকে ঝুকে পড়েছ। কোন মুসলমান বা কোন সংখ্যালঘুকেও সঙ্গত কারণ ব্যতীত একটি বেত্রাঘাত করতে পারবে না। তাদের মধ্যে কিসাস প্রতিষ্ঠার সময়ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে। মনে রেখো, তুমিও আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। আর আল্লাহ চোখের খিয়ানত এবং মনের গোপন ইচ্ছা সর্ম্পকেও বিশেষভাবে অবহিত আছেন।

কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এসব উপদেশ জারাহর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে হকদারদের অধিকারের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখেননি। যিম্মিদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছিলেন।

তারাবীর ভাষ্য হলো, জারাহর এ ঘনিষ্ট আত্মীয় খাওল নামক স্থানে একটি বিরাট বিজয় অর্জন করেছিল। জারাহ এ বিজয়ের সংবাদ দেয়ার জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। উক্ত দলের দু' ব্যক্তি জারাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি নীরব ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন এ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেসা করলেন, তখন সে জারাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলল–

১. সে বিশ হাজার মাওয়ালি দিয়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে কোন বেতন বা পুরস্কার দেয়নি।

২. সে একজন আরবকে একশত মাওয়ালির সমতুল্য মনে করে।

৩. সে বংশ- বিদ্বেষ প্রচার করে বেড়ায় ও তা শিক্ষা দেয়।

৪. যে সমস্ত যিম্মি ইসলাম গ্রহণ করে, সে তাদের নিকট হতেও কর আদায় করে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তার এ সকল অভিযোগে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং জারাহকে পদচ্যূত করে আদেশ লিখলেন। তবে তার পদচ্যুতি ব্যতীত তিনি তাকে আর অন্য কোন শাস্তি প্রদান করেননি।

তাবারীর ভাষ্যটি হলো, যখন জারাহ খুরাসান ত্যাগ করে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল অজিজের নিকট রওনা করলেন তখন তিনি কোষাগার হতে বিশ সহস্র দেরহাম নিয়ে লোকদেরকে বললেন, আমি এটা খলিফার নিকট আদায় করে দিব। তারপর তিনি যখন খলিফার নিকট আসলেন, খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কখন রওনা করেছিলে? তিনি বললেন, রমযান শেষ হবার কয়েকদিন পূর্বে। তারপর জারাহ নিবেদন করলেন যে, আমি ঋণগ্রস্ত, আপনি অনুগ্রহ করে আমার ঋণ শোধের ব্যবস্থা করুন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ উত্তরে বললেন, যদি তুমি রমযান পূর্ণ করে সেখান হতে আসতে তাহলে আমি তোমার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিতাম। তারপর তার বংশধরদের ভাতা হতে তার ঋণ পরিশোধ করা হল।

প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, তার সাধারণ একটি ভুলের কারণে হযরত ওমর ইবনে আজিজ তার এ ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। আসলে তা নয়। তিনি জারাহকে এ জন্যই এ শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি শরিয়তের সীমা ও উদ্দেশ্য বুঝতেন না। যেমন তিনি রমযান শেষ হওয়ার পূর্বেই সফর শুরু করে তার মনোকামনার অপর একটি প্রমাণ পেশ করেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আজিজ কর্মকর্তা নিয়োগে নিজের পক্ষ হতে পূর্ণ সতর্কতাও সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তবুও কোন কোন সময় অন্যান্য লোকদের প্রশংসার উপর ভিত্তি করে শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নাগরিকদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতেন। তাবারীর ভাষ্য হলো হযরত ওমর ইবনে আজিজ যখন আব্দুর রহমান ইবনে নায়ীমকে খুরাসানের দেশ রক্ষা সচিব এবং আব্দুল্লাহকে রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন সেখানকার লোকদেরকে লিখলেন, আমি আব্দুর রহমানকে তোমাদের দেশরক্ষা সচিব ও আব্দুল্লাহকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের পরিচয় জানিনা এবং তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করারও সুযোগ পাইনি। পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের যে পরিচয় পেয়েছি সে অনুযায়ীই তাদেরকে কাজে নিয়োগ করেছি। যদি তারা ভাল হয় তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ কর্ম করে তবে আল্লাহর প্রশংসা করো এবং তাঁর শোকর আদায় করবে। আর যদি এর বিপরীত প্রমাণিত হয় তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে অর্থাৎ আমাকে লিখে অবহিত করবে, আমি তাদেরকে বরখাস্ত করব।

তিনি তাদের দু'জনকে প্রেরণ করার সময় তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে বিশেষভাবে অবহিত করেন যে, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তারা যখন রাজধানীতে উপনীত হল তখনও তিনি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

তাবারী বলেন– তিনি আব্দুর রহমান ইবনে নায়ীমকে লিখলেন- আল্লাহর বান্দাদের উপদেশ দান করবে, আল্লাহর হক আদায় করতে এবং হদুদ (নির্ধারিত শাস্তি) প্রর্বতন করতে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবে না, বান্দার তুলনায় আল্লাহ তোমার নিকট উত্তম হওয়া বাঞ্জনীয়। মুসলমানদের প্রত্যেক কাজেই ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাদেরকে যে সব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতে সততা অবলম্বন করবে। সর্বদা সত্য বলবে কারণ, আল্লাহর নিকট কোন কথাই গোপন থাকে না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না।

আব্দুর রহমান ইবনে নায়ীম হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নির্দেশাবলী যথাযথ কার্যকরী করে একজন সৎ যোগ্য শাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার শাসনামলে যে সমস্ত প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন নিম্নে তাদের নামের তালিকা দেয়া হল।

১। মদীনা আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আজীজ হাজম। ইনি একজন বিশিষ্ট আলেম এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ফকীহ ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার মাধ্যমে বহু কাজ করেছেন। তিনি তাঁর নিকট নিয়মিত পত্র লিখতেন এবং প্রত্যেক জরুরী কাজে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করতেন। ইবনে সাদ বলেন, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজমের নিকট যখনই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কোন পত্র আসত, শরিয়ত বিরোধী কাজের প্রতিরোধ, বেতন-ভাতা নির্ধারণ এবং শরিয়তের হুকুম-আহকাম জারীর নির্দেশ অবশ্যই তাতে থাকত।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাঁর শাসনামলের শুরুতে ইবনে হাজমের নিকট যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ নামা লিখতেন, তার মধ্যে একটি ছিল যে, ঘরে বসে থাকবে না, মানুষের সাথে মিলামিশা করবে, তাদের নিকট বসবে, নিজের কাছে তাদেরকে ডেকে আনবে, যখন তারা তোমার নিকট আসে তখন সকলের সাথে সমভাবে বসবে। তাদের প্রতি একই রকম দৃষ্টি দিবে, তাদের কেউ যেন, সে যে কেউ হোক না কেন অধিক সম্মানিত ও প্রিয় না হয়। লোকে যেন না বলে যে, সে আমিরুল মুমিনিনের প্রিয় লোক। আজকের দিনে সকল নাগরিকই সমান। বরং তাদের মধ্যেও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যদি কোন ঝগড়া-বিবাদ লাগে তাহলে সাধারণ নাগরিককেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদি তুমি কখনও কোন কিছু মীমাংসা করতে অসুবিধা বোধ কর, তখন আমার নিকট পত্র লিখে অবগত করবে।

ইবনে হাজম স্বয়ং বলেন যে একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে লিখলেন। রেজিষ্ট্রার সমূহকে পবিত্র কর, তা ভুল ভ্রান্তি দূর কর। আমার পূর্বে যে সব মুসলমান বা যিম্মির প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হয়েছে তাদের হক নষ্ট করা হয়েছে, সে গুলির ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা কর। যদি

নির্যাতিত ব্যক্তি ইন্তেকাল করে থাকে তবে তাদের ওয়ারিশদের কাছে তাদের হক আদায় করে দাও।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কাছে একবার লিখেছিলেন– ব্যবসায়ী ব্যতীত সমস্ত সাধারণ লোকের ভাতা নির্ধারিত করে দাও।

এক পত্রে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ সমস্ত সাধারণ নাগরিকদের ভাতা প্রদান করতে তাকে নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন–

ভাতা গ্রহণকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত, যদি সে কাছেই থাকে কোষাধ্যক্ষের নিকটই তার ভাতার অর্থ জমা রেখে দাও। আর যদি দূরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে তার ভাতা তার মৃত্যুর সংবাদ না আসা পর্যন্ত সাময়িক মুলতবী রাখবে বা তার কোন প্রতিনিধি এসে যদি তার জীবিত থাকার প্রমাণ দিতে পারে তাহলে তার কাছে তার ভাতা প্রদান করবে।

ইবনে হাজম আরো বলেন, আমরা বন্দীদের ভাতার রেজিষ্ট্রার নিয়ে তাদের নিকট আগমন করতাম, বন্দীগণ তাদের ভাতা গ্রহণ করত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এক পত্রের মাধ্যমে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

তার নামে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একবার লিখেছিলেন– তুমি কাগজের কথা উল্লেখ করে লিখেছ যে, তোমার পূর্বের যে কাগজ পত্র জমা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আরও লিখেছ যে, এ ব্যাপারে তোমার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা পূর্বের তুলনায় কম। তবে তুমি কলম সরু করে নিবে এবং ঘন করে লিখবে আরও অনেক জরুরী কথা একই পত্রে লিখবে। কারণ, যে সব কাজে মুসলমানদের কোন লাভ নেই সে কাজে অর্থ ব্যয় করা খিয়ানত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার নিকট অপর এক পত্রে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ লিখেছিলেন, তুমি সুলায়মানের নিকট যে পত্র লিখেছিলে আমি তা পাঠ করেছি। তুমি লিখেছিলে যে তোমার পূর্বেকার মদীনার গভর্ণরদের জন্য প্রদীপের খরচ বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করা হতো তা দিয়েই তাদের বাসস্থানও আলোকিত করে রাখা হতো। তোমার এ চিঠির উত্তর আমাকে দিতে হল। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সে সময়ও দেখেছি যখন তুমি শীতের অন্ধকার রাতে প্রদীপ ছাড়াই ঘরের বাইরে যাতায়াত করতে। আল্লাহর কসম, আজ তোমার আর্থিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল। তোমার ঘরেও যথেষ্ট প্রদীপ আছে, সেইগুলোতেই কাজ চালিয়ে যাও।

ইবনে হাজমের নিকট তাঁর লিখিত পত্রের ভাষা প্রমাণ করে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও তার মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই ঘনিষ্টতা ছিল। এই জন্য তার প্রতি বিশেষ লৌকিকতার প্রয়োজন ছিল না। এত ঘনিষ্টতা সত্বেও তিনি ইবনে হাজমের এ দু'টি সাধারণ আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ মুসলমানদের বায়তুলমালের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি তিনি গোনাহর কাজ মনে করতেন।

ইবনে হাজমের নিকট তার লিখিত অপর একটি পত্রের মর্ম হলো- তোমার নিকট যদি কোন ঋণগ্রস্থ লোক আগমন করে এবং সে কোন অন্যায় কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে না থাকে, তাহলে তুমি বায়তুলমাল হতেই তার ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা করবে।

২। বসরা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকা- আদী ইবনে আরতাত, বসরা যদিও চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর প্রদেশ ছিল তবুও আদী ইবনে আরতাতকে তিনি সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তাঁর উপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তার নিকট লিখিত পত্র সমূহতেও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আদী ইবনে আরতাত অত্যন্ত নেক, অনুগত, বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি প্রত্যেক কাজেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মতামত চাইতেন। কোন কাজই তার মতামত ব্যতীত করতেন না। কিন্তু এতে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হত; কাজেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে লিখলেন, তুমি শীত গ্রীষ্ম সবসময়ই লোক পাঠিয়ে আমার·নিকট সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, এরূপে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর বটে, তবে ভবিষ্যতে তুমি হাসানের উপর নির্ভর করবে। আমার এ চিঠির পর তুমি হাসানকে সকল কথা জিজ্ঞেস করে কাজকর্ম করবে। আমার পক্ষে এবং সমস্ত মুসলমানের পক্ষে তোমাকে এ দায়িত্ব দেয়া হল। আল্লাহ হাসানের প্রতি রহম করুন। তিনি ইসলামের একটি প্রাসাদ সমতুল্য। হাসান বসরী তখন বসরায় অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ফকীহ।

আদী ইবনে আরতাতের নিকট লিখিত পত্রসমূহ পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইবনে সাদ তার লিখিত আরও

কয়েকটি পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম পত্রে তিনি শরিয়ত বিরুদ্ধ আমদানী বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আদী ইবনে আরতাতের কাছে অপর একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, তোমার পূর্ববর্তী অন্যায় অত্যাচারও অবিচার করতে যে প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, তোমরা ন্যায়, ইনসাফ ও সংস্কারের জন্য অন্ততঃ ততটুকু প্রচেষ্টা করতে পার।

আল্লাহ পাক যখন জান্নাতবাসীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ দিবেন তখন তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তিনিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। অতএব তুমিও তোমার প্রজাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করতে শিক্ষা দান কর।

আদী ইবনে আরতাতের কাছে লিখিত তার এ পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

যিম্মিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি তাদের কেউ বার্ধক্যে পৌছে যায় এবং তার কোন সহায়-সম্পদ না থাকে, তাহলে বায়তুল মাল হতে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। অথবা যদি তার কোন নিকটাত্মীয় থাকে তাহলে তাদেরকে তার ভরণপোষণ করতে আদেশ দিবে। তার রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। তুমি তাকে তোমার একজন সেবক মনে করবে যে সারা জীবন তোমার সেবা করেছে। এখন তার বার্ধক্যের সময় মৃত্যু পর্যন্ত বা রোগ মুক্তি পর্যন্ত তার সেবা-যত্ন করা তোমার কর্তব্য। আমি জানতে পারলাম যে, তুমি মাদকদ্রব্যের কর আদায় করে থাক এবং তা বায়তুল মালে জমা করেছ। সাবধান! হালাল মাল ব্যতীত বায়তুলমালে অন্য কিছুই জমা করবে না।

৩। কুফা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকাঃ আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খাত্তাব।

আব্দুল হামিদ ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মনঃপুত শাসকদের মধ্যে অন্যতম ও তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্তা। আর এ প্রদেশের জনসাধারণ ছিল সবচেয়ে চরিত্রহীন। বিশেষতঃ কুফার লোকেরা ছিল অত্যন্ত জালেম ও অসভ্য। তারা কোন শান্তিপ্রিয় শাসকের আনুগত্য স্বীকার করত না। একমাত্র উবায়দুলাহ ইবনে

যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত নিকৃষ্ট প্রকৃতির শাসকগণ তাদেরকে শাসন করতে পেরেছে। তার মতে হাজ্জাজ ছিল সর্বনিকৃষ্ট শাসক। আল্লাহর দুশমনদের নীতির সাথে হাজ্জাজের নীতির মিল ছিল। এ কারণেই তিনি কুফা ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসন ভার আব্দুল হামিদের উপর ন্যস্ত করলেন। আব্দুল হামিদ ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর ভ্রাতা জায়েদের পৌত্র। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে ব্যক্তিগতভাবেই চিনতেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম। প্রজ্ঞাশীল রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই তাঁকে জানতেন। মদীনায় অবস্থানকালে তিনি অনেক দিন তাঁর নিকট ছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফত লাভের পর ঘুরে ফিরে তাঁর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল।

হযরত ওমর ইবনে আজীজ তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে অন্য একজন বিশিষ্ট আলেম আবুজুনাদকে সচিব করে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন এবং যুগের ইমাম অতুলনীয় পান্ডিত্যের অধিকারী শুধু খলীফাদেরই উস্তাদ নন বরং দুনিয়ার আলেমদের উস্তাদ হযরত শাবীকে প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

ইবনে সা'দের ভাষ্য হলো, যখন আব্দুল হামিদ নিয়োগপত্র নিয়ে দামেশক হতে কুফায় আগমন করলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের যে পত্র পেলেন যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। তার মর্মার্থ হলো-

শয়তানের ধোকা ও অত্যাচারী শাসকের নির্যাতনে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দিবে।

প্রকৃতপক্ষে হকদারদের হক প্রদান করাই উত্তম শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ। এটাই আল্লাহর বিধান এবং ইসলামের চিরন্তন নিয়ম-পদ্ধতি।

এ পত্র পেয়েই আব্দুল হামিদ হাজ্জাজের উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। সে আল্লাহর বান্দাদের উপর যে জুলুম নির্যাতন করেছিল তারও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন এবং যে সমস্ত জুলুম নির্যাতন সংস্কারযোগ্য ছিল সেগুলোর দ্রুত সংস্কার করলেন। হাজ্জাজ যে সমস্ত লোককে অন্যায়ভাবে জরিমানা করে তাদের সহায় সম্পদ বায়তুলমালে জমা করেছিল আব্দুল হামিদ তাদেরকে ডেকে এনে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন এবং তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আর যে সব লোক ইন্তেকাল করেছিল তাদের সম্পর্কে তিনি খলিফার মতামত চেয়ে পত্র লিখলেন। খলিফা উত্তর দিলেন, তাদের সম্পত্তি ওয়ারিশদের কাছে বুঝিয়ে দাও। আব্দুল হামিদ খলিফার নির্দেশ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অবস্থা এ দাঁড়াল যে, বায়তুল মাল শুন্য হয়ে পড়ল। বায়তুল মালে নগদ কোন মূদ্রাই ছিল না, যা কিছু ছিল, তাও হাজ্জাজ লোকের নিকট হতে জোর-জুলুম করে আদায় করেছিল। যখন বায়তুল মাল শূন্য হয়ে গেল, তখন আব্দুল হামিদ খলিফাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। খলিফা কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল হতে অর্থ পাঠিয়ে তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, এই হল আল্লাহর বিধান এবং এর বাস্তবায়নই ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ।

ইবনে সা'দ আরো বলেন, যখন আব্দুল হামিদ হাজ্জাজের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করলেন, তখন দেখা গেল যে, তার আস্তাবলে এক হাজার বাহনের পশু আছে। আব্দুল হামিদ খলিফাকে একথা লিখে জানালেন। সে দিক হতে উত্তর আসল। সেসব বিক্রয় করে কুফাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। অতঃপর আব্দুল হামিদ তাই করলেন। আবদুল হামিদ হাজ্জাজের সম্পদ বিক্রি করে সমুদয় অর্থ জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পূর্ণ শাসনামলব্যাপী আব্দুল হামিদ, কুফার শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিশৃংখল শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশি ছিলেন। তাঁকে বার্ষিক দশ হাজার দেরহাম ভাতা প্রদান করতেন। সম্ভবতঃ এ ছিল গভর্ণরদের সর্বোচ্চ ভাতা। এই পরিমাণ ভাতা তিনি আর কোন গভর্ণরকেই দিতেন না।

৪। মিশর– হায়্যান ইবনে শুরাইঃ মিশর ছিল হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের প্রিয় স্থান। তার পিতা আব্দুল আজিজ দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। ভাই-ভগ্নি ও অন্যান্য আত্মীয়সহ তার বংশের সকলে সেখানে বসবাস করত। তিনি তাঁর কোন ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়কে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন না। হায়্যান ইবনে শুরাইহ একজন সরল-সোজা ও ভাল লোক ছিলেন। খলিফা তাকেই মিশরের শাসনকর্তার পদে নির্বাচন করলেন। হায়্যানের আগে অপর এক হাজ্জাজ

মিশরের শাসক ছিল। তাঁর নাম ছিল উসামা। এ নরাধম সেখানে অকথ্য নির্যাতন করে জনজীবনকে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল। সে বহু মানুষের হাত পা কর্তন করে পঙ্গু করে দিয়েছিল। বহু লোকের কাছ থেকে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ হায়্যানকে সেখানে পাঠাবার সময় তার কানে কানে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে, তোমাকে জনসাধারণের রাখাল ও তাদের সাহায্যকারী বন্ধু হিসেবে প্রেরণ করা হচ্ছে। তুমি তাদের দন্ড মুন্ডের হর্তাকর্তা নও। তাদের অন্যায়-অপরাধের জন্য তুমি তাদেরকে সতর্ক করতে পারবে বটে, তবে তাদেরকে শরিয়ত বিরোধী কোন শাস্তি দিতে পারবে না।

তিনি মিশরে পৌঁছার পর খলিফা তাঁকে লিখলেন, মানুষকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে না, কাউকেও ত্রিশটির বেশী বেত্রাঘাত করবে না। আল্লাহ্‌র হক অবশ্যই পালন করবে।

হায়্যান মিশরে শাসনকর্তা হিসেবে আগমন করে আল্লাহর নির্দেশকে যথাযথ বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এক সুখী জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি কারোও প্রতি জুলুম করেননি, প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছিলেন।

তিনি শুধু মুসলমান নয় অমুসলিম প্রজাদের অন্তরও জয় করেছিলেন। ফলে অমুসলিমগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। হায়্যান হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে লিখলেন, অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, ফলে কর আদায় কমে গেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে লিখলেন–

আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা)কে সত্যের আহবানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, কর আদায়কারী হিসেবে বা জরিমানা আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করেননি। আমার এ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দফতর বন্ধ করে এখানে চলে এস।

৫। ইয়ামেন-উরুয়া ইবনে আতিস, সা'দী।

৬। জাজিরা-আদী ইবনে আদীল কান্দী।

৭। আফ্রিকা- ইসমাইল ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবুল মুহাজির।

৮। দামেস্ক- মুহাম্মদ ইবনে সুয়াদুল ফাহদী। এ চারজন প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ঈমানদার ও সৎ লোক ছিলেন।

৯। খুরাসান- জারাহ ইবনে আব্দুল হিকমী।

তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তার পদচ্যুতির বর্ণনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হলো, তার কর্মকর্তাদের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তিনজন আলেমও ছিলেন। হযরত হাসান বসরী, মেহরান ও ইমাম শাবী (র)।

হযরত হাসান বসরী (র) ছিলেন বসরার প্রধান বিচারপতি। তিনি পরে যদিও পদত্যাগ করেছিলেন তবুও বসরার শাসনকর্তার প্রতি নির্দেশ ছিল, কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ই যেন তাঁর মতামত ব্যতীত মীমাংসা করা না হয়। হযরত মেহরানের সাথে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি ছিলেন তার প্রধান উপদেষ্টা। ইবনে সাদ বলেন, মেহরান ছাড়াও রেজা ইবনে হায়াত, আমর ইবনে কাযেক, আউন ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ বিশিষ্ট মনিষীগণ তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মেহরানকে জাজিরার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করা খুবই জটিল কাজ ছিল বিধায়, তিনি কয়েকবার পদত্যাগ করলেও খলিফা তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেননি। যখনই তিনি কাজ কর্মের চাপে অভিযোগ করতেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁকে শান্ত্বনা প্রদান করে পত্র লিখতেন।

প্রিয় মায়মুন! তুমি বলেছ যে, শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় করা খুব কঠিন কাজ। আমি তোমাকে বেশি কষ্ট দিতে রাজি নই। তোমার নিকট যে মাল আসে তার মধ্যে হালালটি শুধু গ্রহণ করবে, আর যে সব সমস্যা উপস্থিত হয় তাতে সততার প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি কোন বিষয়ে জটিলতার সম্মুখীন হও তখন আমাকে পত্র লিখবে।"

হযরত মেহরান ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকটও তিনি এরূপ নির্দেশ পাঠাতেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কর্মকর্তাদের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখতেন এর ফলে তার কর্মকর্তাগণ জনসাধারণের উপর কোন প্রকার নির্যাতন করতে সাহস পেত না। ফলে প্রজা সাধারণগণ কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহশীল, মাতা-পিতার স্নেহ ছায়ার মত বসবাস করেছে।

১. বনু হাশিম

২. মুক্ত দাস

৩. অমুসলিম সংখ্যালঘু / যিম্মি

৪. বন্দী

বনু হাশিম

বনু উমাইয়াগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার পর প্রাক ইসলাম যুগের আরবের সেই পারস্পারিক সংঘর্ষ সৃষ্টিকারী গোত্রীয় বিদ্বেষকে ঘৃতাহুতি দিয়ে আসছিল যা একজনকে অপর জনের বিরুদ্ধে লড়তে এবং একের রক্তে অন্যের হাত রঙ্গীন করতে তাদেরকে উৎসাহিত করত।

যদিও মহানবী (সা) বংশবিদ্বেষ ও আভিজাত্য গৌরবকে নেহায়েত নীচ স্বভাব হিসেবে অবহিত করেছিলেন। যদিও তিনি বনু উমাইয়াগণকে তাঁর নৈকট্যে আকর্ষণ করতেই আবু সুফিয়ানের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)কে তাঁর ওহী লেখক নিযুক্ত করেছিলেন, উমাইয়া বংশীয় কোন কোন লোকের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে হাশেমী ও উমুরী গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বংশবিদ্বেষের যে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, এতেই এ দুটি শিবির একে অপর হতে দূরে চলে গিয়েছিল। উমুরী খলিফাগণ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)কে গালিগালাজ করত। তাদের মজলিসে বনু হাশিমদের কোন স্থান ছিল না। বনু হাশিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ, আত্মীয় আহলে বাইত হওয়ার পরও তারা তাদেরকে নীচ ও অস্পৃশ্য বলে মনে করত। বায়তুল মাল হতে তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করা হত না। বিশেষতঃ খলীফা আব্দুল মালেক, ওয়ালীদ ও সুলায়মানের যুগে অসহায় বনু হাশিমগণ খুবই দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছিল।

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, এ মিল্লাতের উপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এটাই যে, তিনি বনু হাশিম এবং

উমাইয়াদের মধ্যকার বংশগত ঘৃণা-বিদ্বেষকে দূর করে পারস্পরিক সদ্ভাব সৃষ্টি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা) কে যে অশ্লীল কথা বলা হত, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ওকে আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং মিম্বরে আরোহন করে গালির পরিবর্তে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করতেন–

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -

"প্রতিপালক আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইগণকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন ক্ষমা কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।"

তিনি যেন প্রত্যেক শুক্রবার দিন মুসলমানগণকে এ কথাই বুঝিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা জায়েয নেই এবং তার পূর্বে তার বাপ-দাদাগণ যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল উহা সম্পূর্ণরূপেই ভুল ছিল।

এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত শাসনকর্তাগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন হযরত আলী (রা)-এর প্রতি গালি-গালাজের স্থলে উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, এরূপ গালিগালাজ করা মোটেই জায়েয নেই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এটুকু করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বনু হাশিমগণকে তার পার্শ্বে ডেকে এনে বিশেষ অনুগ্রহও প্রকাশ করতেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেন, তিনি যখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, যখন তিনি খলিফা হননি, তখন হতেই এ হিংসা বিদ্বেষ দূর করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধব সকলের নিকটই হযরত আলী (রা) এবং অপরাপর আহলে বাইতের প্রশংসা করতেন।

হযরত আলী (রা)-এর গোত্র

হযরত ফাতেমার কথাই এর সাক্ষ্য, তিনি বলেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফতের যুগে একদা আমি তাঁর নিকট গমন করেছিলাম। তিনি তাঁর কক্ষ হতে পরিষদ ও প্রহরী সকলকে বের করে দিলেন, শুধু তার কক্ষে তিনি ও আমি ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আলীর কন্যা! আল্লাহর কসম! দুনিয়ায় তোমার বংশের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কোন বংশ নেই, এমনকি তোমার পরিবার আমার পরিবার পরিজন হতেও আমার নিকট বেশি প্রিয়।

তিনি ফাতেমার নিকট মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কিছুই বলেননি। তাঁর নিকট এ বংশ বাস্তবিকই তাঁর বংশের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। খেলাফত লাভের পর তারা আরও অধিক প্রিয়তর হয়েছিল। তিনি তাঁদের সাথে সকল প্রকার যোগ-সূত্র রক্ষা করে তাঁদের সকল প্রকার অধিকার আদায় করে দিলেন। এমনকি ফাদাকের বাগানটিও তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন– যার আমদানী ছিল বার্ষিক দশ হাজার দীনার। আর সবসময় আহলে বাইতের সদস্যগণ এটা লাভ করতে আশান্বিত ছিলেন। এর জন্যই হযরত ফাতেমা (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে মনোমালিন্য হয়েছিল। অবশ্য হযরত আবু বকর (রা) এ বাগান তাদেরকে অর্পণ না করে তার কর্তৃত্বাধিনে রাখলেন এবং মহানবী (সা) যে প্রকারে এর আমদানী ব্যয় করতেন তিনি তাই করলেন।

হযরত ফাতেমা (রা)-এর পর আহলে বাইতগণ এ ফাদাক নামক বাগানটি তাদের অধিকার বলেই মনে করতেন।

বাইতুল মাল হতে ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলীফার পদে আসীন হয়েই দশ হাজার দীনার মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং মদীনার শাসনকর্তা ইবনে হাজমকে সমুদয় অর্থ হাশিম বংশীয়দের জন্য ব্যয় করতে নির্দেশ দিলেন।

পূর্বে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে বনু হাশিমের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ দশ হাজার দীনার হতে ৫০ দীনার করে পেয়েছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন তাঁদের প্রতি এরূপ দয়ার হাত প্রসারিত করলেন, তখন হযরত হুসাইন (রা)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা খলিফাকে লিখলেন, আপনি আল্লাহর রাসূলের পরিবার পরিজনকে সাহায্য করে এ উপকার করেছেন যে, তাদের যার খাদেম ছিল না, সে খাদেমের ব্যবস্থা করেছে, যার কাপড়ের ব্যবস্থা ছিল না সে কাপড় খরিদ করেছে এবং যার নিকট ব্যয় করার কোন অর্থই ছিল না, এটা দিয়ে সে তার দৈনন্দিন খরচের ব্যবস্থা করেছে।

ইবনে সাদের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ফাতেমার এ চিঠি নিয়ে বাহক যখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের দরবারে আসল তখন তিনি কাসেদকে দশ দীনার পুরস্কার দিলেন এবং ফাতেমার প্রয়োজনীয় খরচের জন্য আর পাঁচশত দীনার কাসেদের নিকট দিয়ে দিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এটাই যে, তিনি বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াদের পারপরিক গোত্রীয় গোঁড়ামীর বিষময় প্রতিক্রিয়া দূর করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বনু হাশিমগণকে সে জাতির শ্রেষ্ঠতর সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ অর্থ ছাড়াও প্রত্যেক হাশিম বংশীয়গণ পঞ্চাশ দীনার ভাতা পেতেন। হযরত যুল কুরবার (রাসূলের নিকট আত্মীয়) নির্ধারিত পঞ্চমাংশ হতে এর ব্যবস্থা করে তাদের দীর্ঘদিনের অভাব দূর করে তাদেরকে বিত্তশালী করে দিয়েছিলেন।

ইবনে সাদ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন তাদের প্রতি এরূপ অনুগ্রহের হস্ত প্রসারিত করলেন, তখন বনু হাশিমগণ এক সাধারণ সমাবেশের ব্যবস্থা করে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ সব কাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে খলিফার নিকট একজন দূত প্রেরণ করলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদেরকে উত্তরে লিখলেন, আমি যদি জীবিত থাকি তবে তোমাদের সকল অধিকার ফিরিয়ে দেব।

এটা বাস্তব সত্য যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাদের সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের উপর কোন প্রকার জোর-জুলুম করেননি, এমনকি তিনি তাদের অল্প বয়স্ক বালকদের অধিকারের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

মুক্ত দাস

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুক্ত-দাসদের অবস্থা উন্নয়নের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে অন্যান্য বনু উমাইয়ার খলিফাদের যুগে এদের লক্ষ লক্ষ দাসদাসী অকথ্যরূপে নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে আসছিল।

বনু উমাইয়ার বংশীয়গণ মুক্ত দাসদের সম্পর্কে অত্যন্ত একগুয়ে ছিলেন। ইসলাম যুগের সে অজ্ঞাতপ্রসূত আভিজাত্য অহংকার যে আভিজাত্য অহংকারে আবু জাহেল, আবু লাহাব ও অন্যান্য কুরাইশ নেতারা মত্ত ছিল, তা আবার তাদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের মতে আরবী ব্যতীত অন্য সব লোক ছিল অভদ্র-ইতর প্রাণীর সমতুল্য। বিশেষতঃ যুগের নির্মম অত্যাচারে যারা দাসে পরিণত হয়েছিল, তাদের নিকট তারা মানুষ হিসেবে গণ্য হত না।

ইসলামের মাতৃভূমি পবিত্র মক্কায় যদিও এরূপ নিপীড়িত লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, তথাপি যারা ছিল, তারা মানুষ হিসেবে গণ্য ছিল না। তাদের কুরাইশ প্রভুগণ তাদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন করত, তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠতো।

ইসলাম আরববাসীদের অন্যান্য অসৎ আচরণের মত এ নিপীড়িত জনতার মুক্তির পথও খোলাসা করে দিয়েছিল। সেই বিলাল হাবশি, সুহাইব রোমী এবং সালমান ফারসী (রা) প্রমুখকে এ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসংঘের অন্যান্য সদস্যগণ যারা ইসলামের পূর্বে নির্মমভাবে নির্যাতিত ও অতি নীচ বলে গণ্য ছিল, হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বও তাঁদেরকে প্রভু বলে সম্বোধন করতেন এবং তার দরবারে কুরাইশ নেতাদের চেয়েও উচ্চাসনে তাঁদের আসন দিতেন।

সালমান ফারসী (রা) এবং তাঁর মত অন্যান্য মুক্ত দাসগণও হযরত আবু বকর (রা), ওমর ফারুক (রা), আলী (রা) ও ওসমান (রাঃ)দের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীদের মত তাদের অভিমতও সাদরে গ্রহণ করা হতো।

একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, যখন ইরাক চুড়ান্তরূপে বিজিত হল এবং মুসলিম সামরিক বাহিনীর পক্ষ হতে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর নিকট দাবী পেশ করা হল যে, বিজিত এলাকার ভূমি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। তখন সেই সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে হযরত বিলাল দীর্ঘ তিন দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর সাথে বির্তক করেছিলেন।

হযরত খাব্বাব (রা)ও ছিলেন একজন মুক্তদাস। কিন্তু ইসলামের বদৌলতে তাঁর মর্যাদা এরূপ উন্নীত হয়েছিল যে, একবার তিনি এবং হযরত আবু সুফিয়ান একই সময়ে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলে হযরত ফারুকে আজম হযরত খাব্বাবকেই প্রথম স্মরণ করেছিলেন এবং হযরত আবু সুফিয়ানকে তারপর আহ্বান করেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) কোন কোন মুক্ত দাস ও তাদের সন্তানদেরকে নিজের সন্তানের থেকেও বেশী ভাতা প্রদান করতেন। মুক্ত দাস হযরত জায়েদের পুত্র উসামাকে একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। তাকে হযরত আলী (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীদের মত মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং নিজের পুত্র আব্দুল্লাহকে চতুর্থ শ্রেনীতে স্থান দিয়েছিলেন।

তিনি একটি সাধারণ নির্দেশের মাধ্যমে এসব নির্যাতিত মুক্ত দাসকে মানবতার কাতারে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশটি ছিল এই–

"তোমরা যে সব দাসকে মুক্তি দাও, যদি তারা ঈমান আনে তবে তাদেরকে তাদের মনিবদের সমতুল্য ভাতা প্রদান করবে।"

ঐতিহাসিক আবু উবাইদ বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জানতে পারলেন যে, তাঁর কোন শাসনকর্তা আরবী লোকদেরকে ভাতা

দিয়ে মুক্ত দাসদের বঞ্চিত করেছেন। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, "নিজের মুসলিম ভাইদেরকে নীচু করার গ্লানি হতে বেঁচে থাক এবং মুক্ত দাসদের আরবদের মতই ভাতা দান কর।"

হযরত ওমর (রা) সাধারণতঃ বলতেন– আল্লাহর কসম! যদি আরবী লোকদের তুলনায় অনারবী লোকেরা উত্তম আমলসহ হাজির হয়, তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অধিক মর্যাদা লাভ করবে। যার আমল কম হবে বংশ মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবে না।

হযরত ওমর ফারুক (রা) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের আলোকেই এই কথা বলেছিলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু সে আল্লাহর নিকট বেশি সম্মানী।

মহানবী (সা)ও বিদায় হজ্জের ভাষণে এই ভাষায় উপরোক্ত কথাই ব্যক্ত করেছিলেন–

لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوٰى

অর্থাৎ তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীরুতা ছাড়া অনারবের উপর আরবীর কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। ইসলামের এ সাম্যের নীতি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর যুগ পর্যন্তই সামগ্রিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন প্রকারেই মুক্তদাস বা যে সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করে দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত হল, তাদেরকে আরবীদের চেয়ে কম মূল্য দেইনি। তাদেরকেও সে মর্যাদাই প্রদান করা হয়েছে যা আরবদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, উমাইয়া শাসন যুগে যেভাবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল এ রূপে এ ভাবধারাটিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম মুক্ত দাসগণকে যে মর্যাদা দিয়ে মানবতার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছিল তারা তাদেরকে তা হতে বঞ্চিত করেছিল। বনু উমাইয়াগণ নিজেদেরকে শাহী বংশ হিসেবেই মনে করত। তারা নিজেদেরকে মুক্ত দাস হতে উন্নত স্তরের লোক বলেই

বিশ্বাস করত। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আরবগণও মুক্ত দাসগণকে নীচু অভদ্র মনে করত। তারা শুধু তাদেরকে তাদের দরবারেই স্থান দিত না, বরং যুদ্ধের সময় নিজেরা অশ্বে আরোহন করে মুক্ত দাসগণকে পদব্রজে হাটিয়ে নিত এবং তাদেরকে তাদের সামনে রাখত যেন তারাই প্রথম মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সাহেবুল কামাল বলেন– ইবনে যিয়াদের সাথে যুদ্ধ করার সময় মুখতার ছাকাফী ইব্রাহীম ইবনে আশতারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, তোমাদের সৈন্য বাহিনীর অধিকাংশই মুক্তদাস। যুদ্ধের তীব্রতার সময় তারা পালিয়ে যাবে। সুতরাং আরবদেরকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়ে এ মুক্ত দাসদের তাদের সামনে এগিয়ে দাও।

শুধু এতটুকুই নয়, উমাইয়া যুগে আরবরা মুক্তদাসের সাথে চলাফেরা করতেও পছন্দ করত না। তাদের বাহনের পশু আগে যেতে দিতনা, এমনকি কোন মজলিসে তাদেরকে আরবীদের পাশে বসতে দিত না। যদি কোন দাওয়াতে কোন আরব দলপতি উপস্থিত থাকত তবে কোন মুক্তদাসকে তারা বসাত না। তাদের নাম বা উপনামে তাদেরকে ডাকতেও তারা ঘৃণাবোধ করত।

যদি মুক্ত দাসগণ আরবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কন্যা বা ভগ্নির বিবাহ দিত তবে তারা সে বিবাহ বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত।

এক সরদার খালেদ ইবনে ছফুওয়ান সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন মুক্ত দাস তার পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিলে পরে সে বলত এ দুই কুকুরের বিবাহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে খলিফা আব্দুল মালেক সব চেয়ে বেশি কঠোর ছিলেন। তার যুগে যদি কোন আরব কন্যার কোন মুক্তদাসের সাথে বিবাহ হতো তখন তিনি তা বাতিল করে দিতেন এবং তাকে এ অপরাধে একশত বেত্রাঘাতের কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।

যদি বনু উমাইয়া খলীফাগণ এ নীতিকে উৎসাহিত না করত তাহলে হয়ত অবস্থা এত শোচনীয়রূপ ধারণ করত না, কিন্তু তারাই এ নীতির

প্রতিষ্ঠাতা যারা মুক্তদাসদের নীচু মনে করেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ও তাদেরকে পিছে রেখেছিল। তাদের প্রতি সবচেয়ে বড় জুলুম ছিল যখন কোন মুক্ত দাস বা অনারব ইসলাম গ্রহণ করত তখনও তার জিযিয়া ও খেরাজ বা রাজস্ব আদায় করতে হতো। অথচ শরিয়ত শুধু অমুসলিমদের উপরই জিযিয়া এবং খেরাজ ধার্যের নির্দেশ দিয়েছিল।

আল মাওয়ারদি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, জিযিয়া শুধু অমুসলিমদের উপরই নির্ধারিত কর। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখনই তা রহিত হয়ে যায়।

জিযিয়ার মত খেরাজও অমুসলিমদের জমিতে ধার্য করা হত। যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করত তখন তার জমির খেরাজ রহিত হয়ে যেত এবং তার নিকট হতে উশর বা দশমাংস আদায় করা হতো কিন্তু বনু উমাইয়াগণ তাদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করার জন্যে অর্থপিচাশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তারা প্রতি বৎসর খেরাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করত। তাদের ধারণায় মুক্তদাসদের ক্ষেত খামার কুরাইশদেরই অধিকারভুক্ত ছিল। তা হতে তারা যা ইচ্ছা গ্রহণ করত, যা ইচ্ছা পরিত্যাগ করত। তাদের ধারণায় একমাত্র আরবগণই ন্যায় ও ইনসাফ পাওয়ার অধিকারী ছিল, মুক্ত দাসগণ সে অধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়।

বিশেষতঃ হাজ্জাজের সময় মুক্তদাসদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হত। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের জিযিয়া-কর রহিত হতো না। তাদের জমির খেরাজ রহিত করে উশর গ্রহণ করা হতো না। যদি তাদের কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করতে আসত বা সামরিক বিভাগে ভর্তি হতে যেত তখন হাজ্জাজ তার প্রতি অত্যন্ত নিমর্ম ব্যবহার করত। এমন কি সে তাদের হাতে তাদের নাম ঠিকানা খোদাই করে সীল মোহর লাগিয়ে দিত।

ঐতিহাসিক তাবারী বলেন–

একবার হাজ্জাজের কর্মচারীরা তার নিকট অভিযোগ করল যে, যিম্মিরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে শহরে চলে আসছে। ফলে রাজস্ব খাতে দারুণ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। হাজ্জাজ বসরা ও অন্যান্য অঞ্চলের কর্মকর্তাদেরকে যে

সমস্ত যিম্মি গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিল। এর ফলে সমস্ত লোক সমবেত হয়ে ইয়া মুহাম্মদ (সা) বলে চিৎকার করে রোদন করতে লাগল। দুনিয়া তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা কোথায় আশ্রয় নিবে তাও জানে না। বসরার নারীগণ তাদের অবস্থা দেখার জন্য অস্থির হয়ে তাদের কাছে আগমন করল এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তারাও কাঁদতে লাগল।

কথিত আছে, হাজ্জাজ এ জন্যই এ নির্মম নির্দেশ দিয়েছিল যে, যদি গ্রামের লোক ক্ষেত খামার ছেড়ে চলে যায় তাহলে দেশের শষ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা প্রতিরোধ করতেই হাজ্জাজ এ নির্দেশ প্রদান করেছিল। কিন্তু জ্ঞানী সমাজের অবশ্যই জানা আছে যে, তৎকালে দেশের খাদ্য উৎপাদন অনেক ভাল ছিল। গ্রামবাসীদের গ্রাম ত্যাগ করা সত্ত্বেও সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো। কাজেই হাজ্জাজের এ কঠোর নির্দেশের কোন যৌক্তিকতা ছিল না।

শস্য উৎপাদন হ্রাস, প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই তার এ নির্দেশ ছিল না, বরং জিযিয়া ও রাজস্ব ঘাটতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই সে এ নির্দেশ প্রদান করেছিল। কারণ হাজ্জাজ ও তার কর্মকর্তাগণ এবং তাদের মনিবগণ যে কোন মূল্যের বিনিময়ে রাষ্ট্রের আমদানী ঘাটতি সহ্য করতে পারত না। যেহেতু এতে উমাইয়া খলিফা এবং তাদের কর্মকর্তাদের অসাধারণ ভোগ-বিলাস অর্থের অভাবে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং তারা তাদের ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করতে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল।

ইতোপূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, উমাইয়া শাসকরা তরবারীর জোরে শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল বলেই রাজ্যের সমুদয় আমদানীকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করত। এ বিষয়ে তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ পরিত্যাগ করে ইরান, মিশর ও সিরিয়ার সম্রাটদের আদর্শই গ্রহণ করেছিল। এ কারণেই তারা অতীতে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজা বাদশাহদের দেয়া উপহারাদী গ্রহণ করা শুরু করেছিল। এতে তারা প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি দীনার লাভ করত।

এ ছিল মুক্তদাসদের অবস্থা। তারা তখন পশুর পর্যায়ভুক্ত ছিল। তারা তাদের বেতন নির্ধারণ করেছিল ৯৫ দেরহাম মাত্র।

এই ঘটনা কতই মর্মান্তিক! তারা বিশিষ্ট লোকদেরকে বার্ষিক দশ দীনার পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে ভাতা প্রদান করত। সেক্ষেত্রে যে সব মুক্তদাস তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করত, তাদের জন্য মাসিক ভাতা ছিল মাত্র ১৫ দেরহাম অথচ ওমর ফারুক (রা) এ পর্যায়ের লোকদের মাসিক ভাতা দিতেন ১২৫ দেরহাম।

খলিফা আব্দুল মালেক, ওয়ালীদ ও সুলায়মানের যুগে মুক্তদাসদেরকে যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হত। সর্বত্রই আক্রমণের সময় তারা অগ্রভাগে অবস্থান করত, কিন্তু তাদের জন্য কোন বেতন বা ভাতা বরাদ্দ ছিল না।

উমাইয়া শাসন পদ্ধতিতে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি অনুপ্রবেশ করেছিল, তা কোন ন্যায় ও ভদ্রোচিত ছিল না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ক্ষমতা লাভ করার পরেই এর সংস্কার শুরু করেছিলেন।

তিনি তাঁর সকল শাসনকর্তার কাছেই সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে হাইয়ান ইবনে শুরাইহ, আব্দুল হামিদ, আব্দুর রহমান এবং জারাহ আল হাকিমকে এ ব্যাপারে পত্র লিখে এ জাতীয় নির্যাতন বন্ধ করতে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

তিনি মিশরের শাসনকর্তা হাইয়ানকে যে পত্র দিয়েছিলেন নিম্নে তার সারমর্ম উল্লেখ করা হলো।

যিম্মিদের (সংখ্যালঘু) মধ্যে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার জিযিয়া-কর রহিত করে দিবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, “যারা তওবা করে নামায পড়তে ও যাকাত দিতে শুরু করে, তাদের পথ ছেড়ে দাও।” শুরাইহ এর উত্তরে লিখলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করে, যদি তাদের জিযিয়া-কর গ্রহণ না করা হয় তাহলে রাজস্বের ঘাটতি পড়বে এবং অর্থ দফতরের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার উত্তরে কঠোর ভাষায় লিখলেন।

"আমি তোমার চিঠি পেয়েছি, তোমার দুর্বলতার কথা জানার পরও আমি তোমাকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি। আমি আমার পত্রবাহককে এ নির্দেশ দিলাম, সে তোমার মাথায় বিশটি বেত্রাঘাত করবে। তোমার মতামতের অমঙ্গল হোক। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তার জিযিয়া-কর গ্রহণ করবে না। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সা)কে হাদী (সৎপথ প্রর্দশক) করে পাঠিয়েছেন, জিযিয়া আদায়কারী হিসেবে নয়। আমার জীবনের কসম! যদি আমার হাতে সমস্ত লোক মুসলমান হয়ে যায় তবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে?"

চিন্তা করার বিষয় হলো, একজন শাসনকর্তা জিযিয়া আদায় করার প্রস্তাব ও এর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছিল এবং এর জন্যই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ইরাকের শাসনকর্তা আব্দুল হামিদের কাছেও তিনি অপর একটি চিঠিতে মুক্তদাসদের ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে লিখেছিলেন–

"তুমি আমার কাছে হীরাবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ, যে সমস্ত ইহুদী, নাছারা ও অগ্নিপূজক যাদের উপর জিযিয়া-কর ধার্য আছে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের নিকট হতে জিযিয়া-কর আদায় করবে কি না? আল্লাহ পাক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)কে ইসলামের পথে আহবানকারী করে পাঠিয়েছেন, জিযিয়া-কর আদায় করার জন্য পাঠাননি। তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে, জিযিয়া ওয়াজিব হবে না। তার নিকট আত্মীয়রা তার উত্তরাধিকারী হবে, যেভাবে মুসলমানদের উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়।"

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুক্ত দাসদের সে সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা মুসলমানরা পূর্বে ভোগ করছিল এবং অর্থ ভান্ডারে এর কোন প্রতিক্রিয়া পড়বে কিনা এর কোন চিন্তাও করেননি। এমন কি তিনি বসরার শাসনকর্তা আদীকে লিখলেন– আল্লাহর কসম! আমার বড় সাধ হয় যে, সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক আর আমি ও তুমি কৃষি কাজ করে নিজের হাতের উপার্জন ভোগ করি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ অপবিত্র আমদানী দিয়ে ধন ভান্ডার পূর্ণ করার পরিবর্তে শুন্যতা পছন্দ করতেন। কর্মচারীরা বেতন না পাক এবং তারা পেটের দায়ে ক্ষেত খামারে কাজ করতে বাধ্য হোক, এটাই তিনি ইচ্ছা করতেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ জিযিয়া-কর আদায়ের ব্যাপারে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, মুক্তদাসদের ভাতা প্রদানেও সে নীতিই অনুসরণ করেন। তিনি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করে মানবতার কাতারে উন্নীত করেছিলেন, তিনি ভাতা প্রদানে মুক্তদাস, আরব বা কুরাইশদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য সৃষ্টি করেননি। কোন রাজনৈতিক স্বার্থই তাঁর নিকট অগ্রগণ্য ছিল না।

তিনি প্রত্যেককে অর যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুপাতে ভাতা প্রদান করতেন, সে কুরাইশী হোক বা মুক্তদাসই হোক অথবা উমাইয়া বংশীয় হোক।

তিনি মুক্তদাস ও অন্যান্য আরবদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। বরং তিনি সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ মুক্ত দাসগণকে আরবদের উপর প্রাধান্য দিতেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি আরবের সমস্ত আলেমদেরকে বাদ দিয়ে মিশরের প্রধান বিচারপতি হিসেবে মুক্তদাস ইবনে খুজামেরকে নিয়োগ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক কান্দি বলেন, সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের শাসন আমলে ইবনে খুজামের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে দামেশকে এসেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রতিনিধি দল পাশ্চাত্যের নীতি অনুযায়ী সুলায়মানের সাথে আলোচনা শুরু করল কিন্তু ইবনে খুজামের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি।

সুলায়মান তাকে কিছু আলোচনা করতে বললে তিনি আলোচনা করতে অস্বীকার করলেন।

মজলিস সমাপ্ত হলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আলোচনা করলে না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, "আমার ভয় হচ্ছিল যে হয়তো মিথ্যা বলে ফেলব"। এ ব্যক্তির সাথে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এতটুকু পরিচয় ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এ ব্যক্তির কথাটি খুবই পছন্দনীয় হয়েছিল।

ইবনে খুজামের মত হাসান বসরীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনিও মুক্তদাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে বসরার সমস্ত আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে উক্ত অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন।

মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগে মুক্তদাসরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাদেরকে আবার সে অধিকার ফিরিয়ে দিলেন।

অমুসলিম সংখ্যালঘু

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন–

রাবিকাশ শাওমি বলেন যে, একবার আমি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ডাকের ঘোড়ায় আরোহণ করে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে সিরিয়ার কোন এক স্থানে আসার পর উক্ত ঘোড়াটি মারা গেল। আমি কোন এক নাবতির নিকট হতে বিনা ভাড়ায় একটি ঘোড়া নিয়ে খানাজেরায় এসে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট হাজির হলাম।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, মুসলমানদের পালকের খবর কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, পালক দিয়ে আপনি কি বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, ডাক। আমি বললাম, অমুক স্থানে এসে ডাকের ঘোড়াটি মারা গিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কিভাবে এসেছো? আমি বললাম, এক নাবতীর কাছ হতে বিনা ভাড়ায় একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছি। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, আমার রাজত্বে তোমরা বেকার খাটাও? এরপর তিনি আমাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হলো।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সমস্ত নাবতীর কথা উক্ত ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে- তারা যিম্মি বা কোন অমুসলিম ছিল না।

তার নিকট হতে বিনা ভাড়ায় ঘোড়া নেয়ার অপরাধে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যা পেশ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের শাসনামলে এ জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্রই শুধু বেকার প্রথাই বাতিল করেননি বরং শুধু জিযিয়া ও খেরাজ অবশিষ্ট রেখে তিনি কর রহিত করে দিয়েছিলেন এবং জিযিয়া আদায়েও চূড়ান্ত ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। শুধু এ জাতীয় লোকদের নিকট হতেই এ উভয় প্রকার কর আদায় করা হত-যারা এটা আদায় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল। অর্থাৎ যারা স্বাস্থ্যবান, উপার্জনক্ষম তারাই জিযিয়া দিত। আর একমাত্র শষ্য উৎপাদন উপযোগী জমিরই ভূমিকর গ্রহণ করা হত।

শষ্য উৎপাদন অনুপযোগী অথবা অনাবাদী জমি আবাদ উপযোগী হওয়ার পূর্বে ভূমিকর আদায় করা হতো। এ ব্যাপারে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ একটি বাস্তবধর্মী নির্দেশ দিয়ে সে অনুযায়ী কর্মতৎপরতা গ্রহণ করার জন্য শাসকদেরকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে নির্দেশে এটা স্পস্ট ব্যক্ত করেছিলেন যে, এমন কোন জমি হতে কর আদায় করা যাবে না, যা শষ্য উৎপাদনে উপযোগী নয়।

শষ্য উৎপাদনে অনুপযোগী জমি সরকারী ব্যয়ে সংস্কার করে শষ্য উৎপাদন উপযোগী হলে পর তা হতে কর আদায় করা হত এবং কর আদায়েও কোন প্রকার জুলুম নির্যাতনের নাম গন্ধ থাকত না। ইবনে সাদ বলেন, তিনি ইরানের শাসনকর্তা আদী ইবনে আরতাতকে লিখেছিলেন, যিম্মি অথবা অমুসলিম প্রজাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

তাদের যদি কেউ বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার কোন মাল না থাকে তাহলে সরকারী কোষাগার হতে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে।

যে সকল যিম্মি রুগ্ন, আতুর, পঙ্গু বা অন্য কোন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতো তাদের সম্পর্কে এরূপ নির্দেশ ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কখনও ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। আল মাওয়ারিদের ভাষ্য অনুযায়ী জিযিয়া সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত ছিল যে, যে সমস্ত লোক সুস্থ, সামর্থবান, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীন তাদের নিকট হতেই শুধু জিযিয়া আদায় করা হবে।

দরিদ্র বা যে কোন কাজ করতে অসমর্থ বা যারা কাজ পায় না বেকার তারা জিযিয়া হতে মুক্ত ছিল। অন্ধ, খঞ্জ এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত

ব্যক্তিদেরকে জিযিয়া হতে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। গীর্জার পাদ্রীদের নিকট হতে কোন জিযিয়া আদায় করা হত না।

কাজী আবু ইউসুফ এবং ইয়াহইয়া ইবনে আদাম বলেন যে, জিযিয়া ধার্য্য এবং তা আদায়ের জন্য নাগরিকদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল।

সাধারণ নাগরিক-বার্ষিক ১২ দেরহাম (বর্তমান হিসেবে মাসিক চার বা আট আনা)। মধ্যম-২৪ দেরহাম বার্ষিক (মাসিক আট আনা বা এক টাকা)।

ধনী ব্যক্তি-বার্ষিক ৪৮ দেরহাম (মাসিক একটাকা বা দুই টাকা)।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নির্দেশক্রমে ইসলামের বুনিয়াদি মূলনীতি রাষ্ট্রে সর্বত্রই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল। ইবনে সাদের ভাষ্য অনুযায়ী শুধু একটি স্থানের লোক হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট অভিযোগ করেছিল যে, তার একজন কর্মকর্তা তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার ও অত্যাচার শুরু করেছে।

খলীফা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্রই লোকের উপর সকল প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে দিবে– আমি এটা পছন্দ করি না।

কোন যিম্মি অমুসলিম নাগরিকের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অবিচারও তিনি পছন্দ করতেন না। যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মির উপর কোন প্রকার জুলুম করত অথবা কোন নৈতিক অপরাধ করত তখন তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী তার শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একবার তিনি জানতে পারলেন যে, হিরার কোন মুসলমান একজন যিম্মিকে অনর্থক হত্যা করেছে। তিনি সেখানকার শাসককে নির্দেশ দিলেন যে, হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট সোপর্দ করে দাও এবং তাদেরকে এ অধিকার দাও "তার সাথে তারা যা ইচ্ছা করতে পারবে। ইসলামের দন্ডবিধি যে, প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট হাজির করা হবে-যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারে বা নগদ রক্তপণ গ্রহণ করে ক্ষমাও করে দিতে পারে। অতএব উক্ত ঘটনায় যিম্মিগণ হত্যাকারী ব্যক্তিকেও হত্যা করেছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট মুসলমান অমুসলমান আইনের দৃষ্টিতে সকলই সমান ছিল। এমনকি তাঁর ছেলে অথবা নিকট

আত্মীয় যদি অপরাধী এবং কোন অমুসলিম প্রজা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত তখন তিনি আত্মীয় হিসেবে তার প্রতি কোন গুরুত্ব দিতেন না উভয়কে একই কাতারে দাঁড় করাতেন।

একবার তাঁর স্ত্রীর ভাই এবং সিংহ পুরুষ খলিফা আব্দুল মালেকের পুত্র মুসলিমার সাথে এক ঈসায়ীর ঝগড়া হয়েছিল। তারা উভয়ে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট অভিযোগ করতে আসল। মুসলিমা তার পদ· মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করেই আসনে উপবেসন করল।

ইবনে জাওযি বলেন, তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, তোমার প্রতিপক্ষ আমার সামনে দন্ডায়মান, আর তুমি আসনে উপবিষ্ট! তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পক্ষে উকীল নিযুক্ত করতে পার, কিন্তু বসার অধিকার পাবে না। এ কথা বলে তিনি মুসলিমাকে উঠিয়ে দিলেন। মনে হয় মুসলিমা তার দরবারে আসলে প্রথা অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে তিনি তাকে বসতে দিয়েছিলেন।

কিন্তু যখন যে মুকদ্দমা দায়ের করল, তখন তিনি তাকে উঠিয়ে দিলেন। কারণ ইসলামের বিধানানুসারে বাদী-বিবাদী উভয়ে সমান। কারোও কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই।

ইবনে জওযি বলেন, মুসলিমা উঠে গিয়ে অভিযোগের প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে একজন উকীল নিযুক্ত করল। উকীল বিবাদীর মত তার সামনে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করল। খলিফা উভয়ের বক্তব্য শুনলেন এবং যেহেতু মুসলিমার প্রতিপক্ষের দাবীতে যুক্তি ছিল কাজেই তিনি তার শ্যালকের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা করলেন।

ইবনে জওযি আরও বলেন, হেমছের এক বৃদ্ধ যিম্মি খলিফার নিকট উপস্থিত হয়ে খলিফার ভ্রাতুস্পুত্র আব্বাছের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তার জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আব্বাছের নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল যে, আমি এ দলিলের মাধ্যমে তার মালিক হয়েছি।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ব্যতীত অন্য কোন শাসনকর্তা হলে হয়ত এ দলিলের সম্মান করে সেটা আইন সিদ্ধ মনে করত এবং যিম্মিকে

ফিরিয়ে দিত। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ খলিফা প্রকৃত তথ্য জেনে যিম্মিকে নিরাশ করলেন না বরং উক্ত জমি আব্বাছের নিকট হতে ফেরত নিয়ে যিম্মিকে প্রদান করলেন। ইবনে জওযি এ ঘটনা ব্যক্ত করার পর বলেন যে, তাঁর বা তাঁর পরিবারবর্গের নিকট জুলুমের যে সমস্ত মালামাল ছিল, তিনি তা সব কিছুই প্রকৃত মালিকদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইবনে জওযি আরও বলেন, একবার জনৈক যিম্মি কৃষক এসে তাঁর নিকট অভিযোগ করল যে, তার এক সৈন্য বাহিনী তার শষ্যক্ষেতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার ফলে তার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে দশ হাজার দেরহাম ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে আদেশ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যাতে এই প্রকার জুলুম আর কখনও না হয়।

ঐতিহাসিক বালুজুরী এ প্রসঙ্গে আরও দু' একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল যখন দামেস্কের খৃষ্টানরা অভিযোগ করল যে, বনু নছর বংশের দখলকৃত সমস্ত গীর্জাই তাদের সম্পত্তি। এগুলো তারা ফেরত পেতে চায়। আর তার প্রমাণ হিসেবে হযরত খালেদ (রা)-এর ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র দাখিল করল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ চুক্তিপত্র দেখে বুঝলেন যে তাদের অভিযোগ যথার্থ। সুতরাং তিনি এ গীর্জাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট জমিও তাদেরকে দিয়ে দিলেন। অনুরূপ অপর একটি জায়গীর গীর্জার বলে দাবী করা হল, এবং এটা গীর্জার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ ক্ষেত্রে ঈসায়ীদের দাবী মেনে নিয়ে মুসলমান জায়গীরদারের নিকট হতে জায়গীরটি খৃষ্টানদেরকে ফেরত দেওয়ার আদেশ দিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ঈসায়ীও অন্যান্য যিম্মিদেরকে যে সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিলেন এতে তারা বিশেষভাবে আবভূত হয়ে পড়েছিল। তারা তাঁর নিকট এমন কতগুলি সমস্যা তুলে ধরল, যেগুলো তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাগণ চুড়ান্ত মীমাংসা করেছিল। যেমন দামেস্কের ইউহান্না গীর্জার ব্যাপারেও খৃষ্টানরা নতুন করে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট দাবী উত্থাপন করল। ব্যাপারটি খুবই জটিল ছিল। বিচার-বিশ্লেষণে খৃষ্টানদের দাবী যথাযথ প্রমাণিত হল। ওয়ালিদ গীর্জার যে অংশে মসজিদ নির্মাণ করেছিল তা হযরত খালেদ কর্তৃক বিজয়ের সময় যে চুক্তি সম্পাদিত

হয়েছিল সেই অনুযায়ী তা খৃষ্টানদের অধিকারে ছিল। মুসলমান জনসাধারণ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের ইনছাফের কথা বিবেচনা করে তাদের উকীল দাঁড় করাল। উকীলরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, দামেস্কের বাইরে সমস্ত গীর্জাই চুক্তির অর্ন্তভুক্ত নয়। যেমন দায়ের মারানের গীর্জা, তুমা রাহেব ইত্যাদি গীর্জা সমূহ হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে খৃষ্টানদের সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখিত হয়নি। মুসলমান উকীলগণ আরও বললেন, যদি চুক্তি কার্যকরী করতেই হয় তাহলে আমরা সমস্ত গীর্জাই ফেরত দিব, তোমরা এই ইউহান্না গীর্জার যে অর্ধেকের উপর মসজিদ নির্মিত হয়েছে তার দাবী ত্যাগ কর। কথাটি খুব যুক্তি সঙ্গত ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খৃষ্টানদের নিকট এ প্রস্তাব করলেন। তারা তিন দিনের সময় চেয়ে নিল এবং চতুর্থ দিনে এসে এ শর্তে তাদের দাবী পরিত্যাগ করল যে, বাইরের সমস্ত গীর্জায় তাদের অধিকার স্বীকৃত হবে এবং এ ব্যাপারে একটি লিখিত চুক্তিও সম্পাদন করতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিলেন, সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। যদি এভাবে এই সমস্যার সমাধান না হত তাহলে তিনি অনর্থক মসজিদ ধ্বসিয়ে দিতেও কোন প্রকার ইতস্ততঃ করতেন না।

যিম্মিদের সম্পর্কে তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা উকবার নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তা দিয়ে যিম্মিদের সম্পর্কে তাঁর অনুসৃত নীতি স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত পত্রের মর্মার্থ উল্লেখ করলাম। ভূমিকর আদায়ে ভদ্রতা ও ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কখনও বাড়াবাড়ি করবে না। যদি এরূপে কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করার মত অর্থ আদায় হয়ে যায় তবেই যথেষ্ট। আর তা না হলে আমার কাছে পত্র পাঠাবে আমি কেন্দ্র হতে অর্থের ব্যবস্থা করব।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, তার পূর্বেকার উমাইয়া শাসনকর্তাগণ যেখানে কর বৃদ্ধি করতে প্রশাসকদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং এটা সুলায়মান পর্যন্তই পালিত হয়ে আসছিল এবং অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কর বৃদ্ধি করা হত। যিম্মিদের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতিই ছিল না। সে ক্ষেত্রে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সে আমদানী এ পরিমাণ হ্রাস করতেও রাজি ছিলেন যাতে

কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও চলত না। তাঁর মতে দেশে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থ উপার্জন বা আমদানী বৃদ্ধি নয়। যেসব শাসক এ আদর্শ অনুসরণ করেন তারা আমদানীর হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করেন না।

বন্দীদের অবস্থার সংস্কার

বর্তমানে ইউরোপের বিশেষ করে উন্নতিশীল কোন কোন দেশের সরকার বন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের অবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা খুলে রেখেছে। আধুনিক যুগের লোকদের ধারণা যে, মানবীয় সহানুভূতি এবং পাপী আত্মার প্রতি এ ধরনের অন্তরঙ্গতা এ যুগেরই একটি আবিষ্কার। এ সমস্ত লোক জানে না যে, ৯৯ হিজরীর উমাইয়া সাম্রাজ্যের খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন এ জাতীয় নিপীড়িত মানবতার প্রতি সর্বপ্রথম ভ্রাতৃত্বের হস্ত সম্প্রাসারিতকারী। যারা স্বাভাবিক দুবর্লতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার শিকারে পরিণত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কাজে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে এবং অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের স্টীম রোলারে নিষ্পেষিত হতে থাকে। কথিত আছে যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাধারণ অপরাধে অপরাধী এক লক্ষ লোকের বুকের তাজা রক্তে তার হাত রঞ্জিত করেছিল। সে সাধারণ ক্রটি-বিচ্যুতির দরুন দলে দলে মানুষকে জেলখানার বন্দী করে রাখত। ঐতিহাসিক ইয়াকুবি অভিযোগ করেছেন যে, ওয়ালিদের মত ব্যক্তি ও সাধারণ সন্দেহের কারণে লোককে বন্দী করে শাস্তি প্রদান করত।

এমনকি বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করত না। সুলায়মান এবং তার শাসনকর্তাদেরও একই নীতি ছিল। উসামা ইবনে যায়েদ তামহী ইয়াযিদ ইবনে মাহলাব, মুখাল্লাদ, আব্দুর রহমান, আশআছ এবং এ জাতীয় অন্যান্য উমুরী শাসকগণ সাধারণ অপরাধে জনসাধারণকে কঠোর ও নির্মম শাস্তি প্রদান করত। তাদের চোখ বন্ধ করে অন্ধকার প্রকাষ্ঠে আবদ্ধ রাখত, তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হতো এবং তাদের দ্বারা ঘানি টেনে অনাহারে রাখা হতো। নিম্নমানের জেলে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হত। যদি কোন আসামী মারা যেত তবে দাফন কাফনহীন অবস্থায় তার লাশ কয়েক দিন পড়ে থাকত। অসহায় কয়েদীগণ ভিক্ষা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গীর লাশের সৎকার করত। যে সমস্ত শাসক মনুষত্বের মূল্য বুঝত না যারা

বিনা কারণে হাজার হাজার লোককে কোন মজবুত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তরবারীর আঘাতে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিত, তারা এ সমস্ত হতভাগ্য মানুষের অবস্থা-উন্নয়নের জন্য কিরূপে লক্ষ্য করবে? মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তদুপরি অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা শুধু সৎ ও খোদাভীরু লোকদেরই কাজ। উমুরী শাসক ও তাদের কর্মচারীদের এমন সৎ সাহস ছিল না যে, তারা প্রতিপক্ষের কঠোর সমালোচনা সহ্য করে তাদের তরবারী কোষবদ্ধ করে রাখবে।

ঐতিহাসিক ইবনে কুতাইবা কবি ফারজদাকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, একবার খলীফা সুলায়মানের নিকট কিছু বন্দী আনা হল। সুলায়মান পরীক্ষামূলক ফারজদাকের হাতে তরবারী তুলে দিয়ে বললেন, এদের কাউকে হত্যা কর। কবি হাত উঠালেন বটে কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল। তরবারীও কাঁপতে লাগল। এটা দেখে সুলায়মান ও তার পরিষদবর্গ হাসতে লাগল ।

এরা বন্দী ছিল বটে তবে শরিয়তের বিচারে মৃতুদন্ড দেয়ার উপযোগী অপরাধী ছিল না। সুলায়মান এটা দ্বারা শুধু তার সাহস পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, সুলায়মানের নিকট বন্দীদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। তারা অতি সহজেই তাদেরকে হত্যা করে ফেলত। তারা তাদের উন্নতির ও প্রগতির জন্য কিরূপে দৃষ্টিপাত করবে?

যদি বাস্তবতার অনুসন্ধান করা যায় তবে জানা যাবে যে, সে যুগে এ মানব সন্তানরা সব চেয়ে বেশী নিপীড়িত নির্যাতিত ছিল। যদি মানবীয় দূর্বলতা বা অন্য কোন অপরাধে তারা সামান্যতম অপরাধীও সাব্যস্ত হত তবে যালেম উমুবী শাসকরা তাদেরকে পুতিগন্ধময় মৃত্যু গহ্বরের মত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখত।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজই সর্বপ্রথম এ নির্যাতিত মানব সন্তানদের প্রতি করুনার হাত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম অপরাধের সীমা নির্ধারণ করে শরিয়ত অনুমোদিত সর্বপ্রকার শাস্তির প্রথা রহিত করেন এবং শাসকদের লিখেছিলেন যে, আল্লাহর সীমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, কাকেও শরিয়ত অননুমোদিত শাস্তি প্রদান করবে না।

ইতোপূর্বে শাসনকর্তাদের হিসাব নিকাশ অধ্যায়ে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ লিখিত কয়েকটি চিঠির মর্মার্থ উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে তিনি বারবার তার কর্মকর্তাগণকে এ কথাই হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছেন যে, শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তিই প্রদান করবে। নিজের পক্ষ হতে নতুন কোন শাস্তি প্রদান করবে না, এমন কি তিনি শুধু সন্দেহের কারণে ভালভাবে অনুসন্ধান ব্যতীত অপরাধী কর্মকর্তাগণকে শাস্তি দিতে পছন্দ করতেন না।

মদীনার গভর্ণর ইবনে হাজম একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে লিখলেন যে, কোন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আছে। যদি আপনার অনুমতি হয় তাহলে আমি তাদেরকে অপরাধ স্বীকার করতে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে যে ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন, তার দ্বারাই তাঁর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাকে লিখলেন–

আশ্চর্যের কথা হলো তুমি মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চেয়েছ? হয়ত তোমার বিশ্বাস, আমার এ অনুমতি তোমাকে আল্লাহর রোষ ও গজব হতে রক্ষা করবে।

মনে রেখ, যদি তোমার নিকট এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে, অমুকের নিকট কোন কিছু প্রাপ্য, তবে তা আদায় করে নিও বা যদি কেউ স্বেচ্ছায় কিছু স্বীকার করে তাহলে তাও গ্রহণ কর। কিন্তু যদি কেউ অস্বীকার করে এবং কসম করে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এ কর্মপদ্ধতি সেসব কর্মকর্তাদের বেলায়ও ছিল যাদের বিরুদ্ধে বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে মুসলমানদের বায়তুলমালের হেফাজত করা অতীব পবিত্র দায়িত্ব হিসেবেই বিবেচিত ছিল। এ অর্থ আত্মসাতের কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এহেন বিরাট অভিযোগের পর তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করতে নিষেধ করতেন। কারণ তার মতে অপরাধ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। কিন্তু তাঁর নিকট এটা মোটেই পছন্দনীয় ছিল না যে, তাঁর পক্ষ হতে বা তাঁর কর্মকর্তাদের পক্ষে হতে এমন কোন কঠোরতা প্রকাশ করা হোক যা শরিয়ত বিরোধী।

তিনি হাজ্জাজের পরম দুশমন ছিলেন, কারণ সে আল্লাহর প্রদত্ত সীমালংঘন করে আল্লাহর বান্দাগণকে শাস্তি দিত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যার হাতে ইরাকের শাসনভার ন্যস্ত করেন তাকে বার বার লিখে হাজ্জাজের অনুকরণ হতে বিরত করেছিলেন। ইরাকের দু'জন শাসনকর্তা ছিলেন। একজনকে দেয়া হয়েছিল অর্থ বিভাগের দায়িত্ব আর অপর জনকে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব। তারা উভয়ই তাঁকে পরামর্শ দিতেন যে, অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অপরাধীকে হত্যা করা প্রয়োজন, তা না হলে অপরাধ কমবে না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাদের এ পরামর্শের দরুন তাদের প্রতি এমন কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন যে হয়ত আর কখনও কোন গভর্ণরের প্রতি এই ধরণের ভাষা ব্যবহৃত হয়নি।

তিনি লিখলেন–

দু'টি নীচ ব্যক্তি তাদের নীচতা ও অভদ্রতার দরুন আমাকে মুসলমানদের পবিত্র রক্তে হাত কলংকিত করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

এটা কত কঠোর পত্র। মনে হয় তাদের চিঠি তাঁর ধমনীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করে দিয়েছিল। অপরাধীকে তার অপরাধের তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়ার কথা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মিশরের শাসনকর্তাকেও এ কথাই লিখেছিলেন।

মানুষকে তাদের অপরাধ অনুযায়ীই শাস্তি দিবে, যদি তা একটি বেত্রাঘাতও হয়। কাউকে শাস্তি দিতে আল্লাহর সীমা লংঘন করবে না।

অপরাধের তুলনায় বেশি শাস্তি দেয়া নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বন্দীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সে যুগের জেলাখানাগুলোকেও তিনি বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার জেলখানা থেকে উন্নত করলেন। অপ্রশস্ত কক্ষের পরিবর্তে প্রশস্ত ও খোলা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নির্মাণ করলেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণরকে লিখলেন যে, প্রত্যেক সপ্তাহে স্থানীয় জেলখানায় উপস্থিত হয়ে স্বয়ং কয়েদীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাদের অভিযোগ শুনবে।

ইবনে সা'দ ইবনে উবায়দের ভাষ্য বর্ণনা করে বলেছেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সকল প্রাদেশিক গভর্ণরকে বন্দীদের সম্পর্কে যে ফরমান লিখেছিলেন, তাতে এ নির্দেশও ছিল, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবে

না। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদের সেবা শুশ্রুসার ব্যবস্থা করবে, যার কেউ নেই বা যার কোন অর্থ সম্পদ নেই তাদের দেখা শুনা করবে।

যারা অভাবের দরুন ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় বন্দী হয়েছে, তাদেরকে অন্যান্য নৈতিক অপরাধে অপরাধীদের সঙ্গে একই জেলখানা বা বন্দী শিবিরে রাখবেন। মহিলাদের জন্য পৃথক জেলখানার ব্যবস্থা করবে। আর যাদেরকে হিসাব নিকাশের দায়িত্ব দিবে তাদের অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে তারা যেন ঘুষ গ্রহণ না করে। যারা ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে এবং দায়িত্ব হতে সরিয়ে দিবে।

ইবনে সা'দ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ নির্দেশ সকল সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকটই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরমান হিসেবে বিবেচিত ছিল। অন্য কথায় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এই নির্দেশে বিভিন্ন অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার জেলখানা নির্মিত হল। নৈতিক অপরাধীদের জন্য পৃথক জেলখানা, ঋণ খেলাপীদের জন্য পৃথক এবং মহিলাদের জন্য পৃথক জেলখানা নির্মিত হল।

বিশ্বের ইতিহাসে বন্দীদের অবস্থার সংস্কারের জন্য এটাই ছিল সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পূর্বে বন্দীদের অবস্থার উন্নতির জন্য এরূপ নির্দেশ আর কোন শাসনকর্তাই জারী করেননি।

এটা ছিল একটি মৌলিক সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রত্যেক বন্দীর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে তাদের দূরাবস্থার সংস্কার সাধণ করেছিলেন। তাদের এ ভাতা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত নিয়মিত প্রদান করা হত।

মদীনার শাসনকর্তা ইবনে হাজম বলেন, আমরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের নির্দেশে বন্দীদের রেজিষ্টার নিয়ে জেলখানায় উপস্থিত হতাম এবং তাদেরকে ভাতা দেয়ার জন্য জেলখানার বাইরে নিয়ে আসতাম।

কাজী আবু ইউসুফ এ ব্যাপারে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ আদেশ নকল করেছেন। যার ভিত্তিতে তিনি নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এ সম্পর্কে যে নির্দেশনামা প্রস্তুত করেছিলেন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। বন্দীদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা করা যাবে না।

২। তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। যে বেড়ী পরালে নামায পড়তে অসুবিধা হয়, মুসলমান বন্দীদের এ ধরণের কোন বেড়ী পরান যাবে না।

৪। রাতে প্রত্যেক বন্দীর বেড়ী ও হাতকড়া খুলে দিতে হবে-যাতে তারা আরাম করে শয়ন করতে পারে।

৫। প্রত্যেক বন্দীর জন্য এ পরিমাণ ভাতা দিতে হবে যাতে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

৬। প্রত্যেক বন্দীর নিজ নিজ ভাতা গ্রহণ করার ও খাদ্য তৈরি করে খাওয়ার অনুমতি থাকবে।

৭। জেলখানায় কোন খাদ্য তৈরি করা চলবে না, কারণ জেলের কর্মচারীরা ভাল খাদ্য তৈরি করতে পারে না।

৮। জেলের কর্মচারীদেরকে বিশ্বস্ত, সহানুভূতিশীল ও সৎ হতে হবে। তাদের নিকট সকল বন্দীর নাম ঠিকানা থাকতে হবে।

৯। প্রত্যেক মাসেই তারা বন্দীদের নামের তালিকা অনুযায়ী তাদের মাসিক ভাতা নিয়মিত আদায় করবে। প্রত্যেক বন্দীকে নিজের নিকট ডেকে এনে তার হাতেই তার ভাতা প্রদান করবে।

১০। শীতের দিনে প্রত্যেক বন্দীকে একটি কম্বল, একটি জামা এবং গরমের দিনে একটি জামা ও একটি লুঙ্গি দিতে হবে।

১১। মহিলা বন্দিদেরকে প্রয়োজনীয় পোষাক ব্যতীত ও একটি অতিরিক্ত চাদর দিতে হবে।

১২। সরকারী ব্যয়ে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। সরকারী ব্যয়ে মৃতদের কাফন ও দাফন করতে হবে।

এ নির্দেশনামার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল যে, শুধু যে সমস্ত অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তাদেরকেই বন্দী করা হবে। আর যার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি, শুধু সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ নির্দেশনামার পরিপ্রেক্ষিতে সে যুগের জেলখানাসমূহ শিক্ষাগারে পরিবর্তিত হয়েছিল, ফলে প্রত্যেক কয়েদী জেলখানা হতে একজন উন্নত নাগরিক হিসেবে বের হত। জেলের তত্ত্বধায়ক তাদের শিক্ষা দীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। তাদের চিকিৎসার

ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করে দিতেন। একমাত্র হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দী ছাড়া অন্য কারো প্রতি কঠোর ব্যবহার করতে দিতেন না। হত্যাকারীকে তাঁর অনুমতিক্রমে বেড়ী পরান হত। কারণ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের মতে হত্যা একটি জঘন্যতম ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল। তিনি মুসলমান বা যিম্মি কাউকেও হত্যা করতে ঘৃণা বোধ করতেন। যে ব্যক্তি এ অপরাধ করত, তিনি তাকে ক্ষমা করতেন না। সে যেই হোক না কেন, কিন্তু তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবার পরই শুধু তাদেরকে বেড়ী পরান হত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নির্দেশ ছিল যে,

জেলখানার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। আর জেলে শুধু ঐ সব লোককেই রাখবে যাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত না হলে কাউকে জেলে আটক রাখা যাবে না। সমগ্র সাম্রাজ্যে তার এ নির্দেশ পালিত হয়েছিল এবং এই নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী সর্বত্রই তাঁকে প্রাণ ভরে দোয়া করছিল। আর তাঁর অযাচিত করুণার জন্য নিজ অপরাধ হতে তাওবা করে নিজেকে সংশোধিত করে নিত।

জনগণের শিক্ষা ও অগ্রগতি

নির্যাতিত, নিপিড়ীত ও অধিকার বঞ্চিত মানবতার সংস্কার ও অগ্রগতি যদিও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করে গিয়েছেন। ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক বলেন, তাঁর অধিকাংশ দিনই এভাবে অতিক্রান্ত হত, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সরকারী কাজ শেষ হয়নি। প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি বসে যেতেন এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না।

এ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি জনগণের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি। অর্থাৎ ভগ্ন রাজ প্রাসাদের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সজ্জিতও করেছিলেন।

তিনি শুধু অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, নির্যাতিত মানবতাকে মুক্তি দিয়েছেন শুধু তাই নয়। বরং গণচরিত্র সংশোধন করতে এবং ইসলামের ছাঁচে তাদের মন মানসিকতা গঠন করতেও অবিরাম প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন এবং তিনি যেরূপভাবে এসব দায়িত্ব পালন করেছেন হয়ত আল্লাহর নিকটতম বান্দা ছাড়া এমন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হত না।

এটা কোন ছোট সাম্রাজ্য ছিল না, এ জনবসতি কোন ছোট জনবসতি ছিল না। তদুপরি এখানে শুধু একটি মাত্র জাতির বাস ছিল না বিভিন্ন জাতি বাস করত। একটি রাজ্য ছিল না বরং কয়েকটি রাজ্য নিয়ে এই সাম্যজ্য গঠিত ছিল। এর অর্ন্তভুক্ত ছিল হেজাজের মরুভুমি, সিরিয়ার শষ্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র, ইরাকের ঘনবসতি অঞ্চল তৎকালীন দুনিয়ায় সব চেয়ে বেশী লোকের বাস ছিল এই সাম্রাজ্যে। এখানকার শষ্যক্ষেত্র ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে উর্বর শষ্যক্ষেত্র। তারপর ইরান, তুরস্ক, কাশগর, কেরমান, সিন্ধু, বলখ, বুখারা, কাবুল, ফরগানা মোসুল, মিশর, আফ্রিকা, স্পেন বিভিন্ন রাজ্যসহ এই রাষ্ট্র এতই বিশাল ছিল– যা বৃটিশ সাম্রাজ্য হতে ও বহুগুণ বিস্তৃত ছিল। তাবারী বলেন, যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তার সাহচর্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির কল্যাণে গণচরিত্র এমনভাবে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে, যখন তাদের একজন অপর জনের সঙ্গে সাক্ষাত করত, তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, রাত্রে তুমি কত বার দরুদ পাঠ করেছ, কত দোয়া পড়েছ, কতটুকু কোরআন পাঠ করেছ, কখন খতম করবে, এ মাসে রোজা রাখবে ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে এমন একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে, বর্ণনাকারী হয়ত তা মর্ম বুঝতে ভুল করেছে। খুরাসানের সুদৃঢ় পল্লীতে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলে কথিত আছে। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হলো, ক্রমাগত তিন বছর পর্যন্ত বাঘ ও বকরিতে একই ঘাটে পানি পান করছিল কিন্তু একদিন হঠাৎ একটি বাঘ একটি বকরীকে হত্যা করে ফেলল। সে দিনই খবর আসল যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করেছেন।

এটা একটি রূপকথা নয়। এটা দিয়ে শুধু এ বাস্তবতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজের যুগে সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেরা এমন এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল যে, একে অন্যের উপর তারা আর জুলুম নির্যাতন করত না। এটা বাস্তব সত্য যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ সংক্ষিপ্ত শাসনামলের মধ্যে ছোট বড় নির্বিশেষে মানবচরিত্র যেরূপ সংশোধন করেছিলেন এবং তাদের মন মানসিকতা যেভাবে গঠন করেছিলেন উহার ফলেই তারা ছোট বড় সকল প্রকার অন্যায়-অপকর্ম হতে বিরত থাকতে চেয়েছিল।

তিনি শাসনকর্তাদের নিকট যে সব চিঠিপত্র লিখতেন, তাতে গণচরিত্র সংস্কারের নির্দেশ অবশ্যই থাকত। যেমন শাসনকর্তাদের হিসাব নিকাশ অধ্যায়ে তাঁর লিখিত একটি চিঠির বরাত উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মিশরের শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, খাদেমগণ যখন মসলিসে হাত ধৌত করে তখন তাঁর এক ব্যক্তি হাত ধৌত করার পরই তস্তরী উঠিয়ে নেয়। এটা অনারবদের তরীকা। এটা ত্যাগ কর এবং যতক্ষণ তস্তরী পূর্ণ না হয় ততক্ষণ সেটা উঠাতে নিষেধ কর।

এ ব্যাপারে ইবনে সা'দ বসরা শাসনকর্তা আরতাতকে লিখিত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সেই চিঠিটিও উদ্ধৃত করেছেন– যাতে তিনি মদ্য তৈরির নাবিয (এক প্রকার পানীয় বস্তু) ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছিলেন।

সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের দৃষ্টি এড়াত না। স্বামী বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুর পর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ খোলা মাথায় ক্রন্দন করতে করতে জানাযার পিছনে গমন করত। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অপকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সমস্ত প্রাদেশিক শাসকদেরকে এ জাতীয় অপকর্ম বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ এটা অমুসলমানের রীতি ছিল। এরূপ, নাচ-গান ও বাদ্য যন্ত্রসহ সমাজ জীবনে উশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টিকারী এবং গণচরিত্র বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় ছিল। তিনি জনসাধারণকে এ সমস্ত অপকর্ম হতে বিরত করার জন্য পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এ জন্যই ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, তাঁর যুগে নাচ-গানের আসর বন্ধ হয়ে গেল, কাব্যমুখর মজলিস নীরব হয়ে গেল, নাচ-গান তাঁর রাজত্ব ছেড়ে চলে গেল। কারণ তিনি তার আদেশ অমান্যকারীকে কঠোর শাস্তি দিতেন এবং তার বংশ মর্যাদার প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয়া হত না।

ইবনে সাদ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ গণচরিত্র সংস্কারের এতই গুরুত্ব দিতেন যে, নৈতিক অপরাধীগণকে তার সামনে শাস্তি দেয়া হত। ইব্নে সা'দ এর একটি সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন, তার ভাষ্য এই, আমি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে মদ্যপান করার অভিযোগে এক

ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে দেখেছি। তিনি তার গায়ের কাপড় খুলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করে বললেন, যদি আবার এরূপ কর তাহলে আমি পুনরায় তোমাকে এরূপ প্রহার করব এবং তোমাকে বন্দী করে রাখব যতক্ষণ না তুমি সংশোধন হও। সে ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি তাওবা করছি। আর কখনও এরূপ করব না। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে ছেড়ে দিলেন।

ইবনে সা'দ অপর একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করছেন যাতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ শাস্তির সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন এক ব্যক্তিকে কোন চতুস্পদ জন্তুর সাথে দুস্কর্ম করার অভিযোগে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নিকট আসা হলে তিনি তাকে শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি হতেও কঠোর শাস্তি প্রদান করলেন।

মানব চরিত্র সংস্কারের জন্য শাস্তি বিধান একটি উপায় মাত্র। এটা ছাড়াও অন্যান্য পন্থায় তিনি জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ মনিষীগণকে তিনি বেতন ভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণচরিত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে শরিয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিতেন ও অন্যান্য অপকর্ম হতে বিরত থাকতে বলতেন।

এ সমস্ত বিশিষ্ট মনিষীদের মধ্যে ছিলেন হযরত নাফে, হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু মালেক, হযরত মেহরান, জাআসাল হাল্লাজ্জ, হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব, হযরত হারেছুল আশারী এবং আছেম প্রমুখ মনিষীবৃন্দ।

এ সমস্ত মনিষীগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে জনগণকে ইসলামী শিক্ষা দিতেন এবং তাদের ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রের স্থানে স্থানে হাজার হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তারা প্রাদেশিক গভর্ণরদের সমতুল্য বেতন পেতেন।

আবু বকর ইবনে হাজম (রা) একজন বিশিষ্ট আলেমও ফকীহ ছিলেন। তাকে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করলেন এবং এক নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, আলেমগণকে বল, তারা যেন মসজিদকে কেন্দ্র করে এলেমের প্রসার করেন, কারণ সুন্নাতের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী (সা) যে চরিত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন তা দীর্ঘ দিনের কুসংস্কারে বিস্মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যথার্থই বলেছিলেন

যে, সুন্নাতের মৃত্যু ঘটেছে। সর্বত্র অন্যায় অবিচার আর কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ইবনে কাছীরও এ বক্তব্যের সমর্থন করে বলেছেন যে, জনগণের শিক্ষা দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ দেশের আলেম সমাজকে নিযুক্ত করেছিলেন। নিয়মিত বেতন ছাড়াও বিশেষ উপহার উপঢৌকনের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। তিনি হযরত মেহরানকে জাযিরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সরকারী অর্থ দিয়ে আলেম সমাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ গণচরিত্র গঠনের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথম অথবা দ্বিতীয় ভাষণে বলেছিলেন যে, যদি আমি জীবিত থাকি তবে তোমাদেরকে ভালভাবে অবহিত করব যাতে তোমরা আমল করতে পার। কিন্তু যদি মরে যাই তাহলে মনে রেখ আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য লালায়িত নই।

তিনি তাঁর এই পবিত্র ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর সুন্নাত ও তার হাদীস সমূহ সংকলন করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ নির্দেশ পালন করে সমস্ত বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দেসগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করে হাদীসে নবুবীর বিরাট দফতর রচনা করতে লাগল। অতঃপর তিনি এ সমস্ত হাদীস নকল করিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করতে লাগলেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রদেশের শাসনকর্তাকে এ সমস্ত হাদীস জনগণের মধ্যে প্রচার করতে নির্দেশ দিলেন। মদীনা যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সা)-এর আশ্রয়স্থল ছিল, তিনি এখানেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ জন্য তথাকার আলেমগণকেই বিশেষতঃ এ কাজে নিয়োগ করলেন। এ ব্যাপারে মদীনার গভর্ণর ইবনে হাজমকে লিখিত তাঁর পত্রটির মর্ম ছিল এই মহানবী (সা)-এর হাদীস সমূহ অনুসন্ধান করে তা লিপিবদ্ধ কর। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে।

উলামাদের ধারণা এই যদি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এ উদ্যোগ গ্রহণ না করতেন তাহলে হয়ত হাদীসে নবুবীর এ বিরাট ভান্ডার সংকলিত হত না।

কবিদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

যদিও কাব্য সাহিত্য শিক্ষার একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কিন্তু কবিগণ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হলেই তা জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য উপযোগী হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎকালীন কবিরা ইসলামী চরিত্র হতে বহুদূরে সরে গিয়েছিল। তারা বংশগত বিদ্বেষ এবং গোষ্ঠী গৌরবের পতাকা বহন করে সমাজদেহে বিভিন্ন প্রকার দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পূর্ববর্তী খলীফাগণ এ জাতীয় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের দ্বারা বংশ বিদ্বেষ প্রসারে সাহায্য গ্রহণ করতেন। এমনকি এ ব্যাপারে বড় বড় পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। বিশেষতঃ সে যুগে তিনজন কবি ফারাযদাক, আখতাল ও জারীর এ ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ যেখানে আলেম সমাজের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন, যেক্ষেত্রে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান বিজাতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন সে ক্ষেত্রে তিনি মাত্র এক শত দেরহাম ব্যতীত বিশিষ্ট কবিদের জন্য কিছুই দেননি। ফলে কবিরা ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরিসমাপ্তি

নেতৃত্ব, শাসনব্যবস্থা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যদিও বিপ্লব জনগণের জন্য অত্যন্ত উপকারী ছিল যদিও এভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মান উন্নত হয়েছিল বিশ্বের সকল মানুষই মনে করত যে মানুষের নিরাপত্তা মানবতার কল্যাণ এবং মুক্তির জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এ জীবন ব্যবস্থা কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর আরাম আয়েশ ও জীবনে মান উন্নয়নের জন্য ছিল না, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু উমাইয়া বংশের লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের এ শুভ ধারণার কামনা করত না। কারণ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের দ্বারা তারা খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ তিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ জনগণকে ফিরি.য় দেয়া হয়েছিল। যদি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আরো কিছু দিন জীবিত থাকতেন তবে

বনু উমাইয়ার লোকদের বিপদ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। বিশেষতঃ ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের এ আশংকা ছিল যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাকে পদচ্যুত করে তার পরিবর্তে অন্য কাকেও তার স্থলাভিষিক্ত করে না যান। যদিও সুলায়মানের ওছিয়ত ক্রমেই ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেক যুবরাজ নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী খলিফার কৃত আহাদনামা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যদিও খুব কঠিন কাজ ছিল কিন্তু তবুও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা খুব অসম্ভব বিষয় ছিল না যে, তিনি ইয়াযিদকে পদচ্যুত করে কোন সৎ ও নিষ্ঠাবান লোককে খলিফা নিযুক্ত করে যাবেন।

এ আশংকাই শেষ পর্যন্ত ইয়াযিদকে খলিফার বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে তাকে খাদ্য বা পানীয়ে বিষ মিশিয়েছিল।

ইবনে কাছীরের ভাষ্যটি এই

মানুষ মনে করে যে, ইয়াযিদ খলিফার ব্যক্তিগত খাদেমকে এক হাজার দীনার দিয়ে তার সহযোগী করেছিল। সে খাদেমই তার নখের নীচে বিষ লুকিয়ে রেখে ছিল। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ পান করার জন্য পানি চাইলেন তখন পানিতে সে নখটি ডুবিয়ে সে পানি ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে পান করতে দিল। এর ফলেই তিনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন অবশেষে এরোগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ পীড়িত হলে প্রথমতঃ সাধারণ লোক ও তার পরিবারের লোকদের ধারণা ছিল যে, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। ইবনে কাছীর বলেন, যখন তাঁকে বিষ প্রয়োগের কথা বলা হল তখন তিনি বললেন, আমি সে দিনই জানতে পেরেছি যে, আমি বিষাক্রান্ত হয়েছি।

তারপর তিনি তার সে খাদেমকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? সে বলল, আমাকে এক হাজার দীনার দিয়ে এরূপ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তার বংশের এ হীন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেননি। তারপর যখন চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার জন্য আগমন করলেন তখন তিনিই তা প্রকাশ করে দিলেন।

ইবনে জওযি এ প্রসঙ্গে জনৈক ইহুদির কথা উল্লেখ করেছেন যে, সর্বপ্রথম খলিফা বিষাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দিয়ে খলিফার খাদেমের নিকট তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিল।

হয়ত এ ইহুদি সে বিষ প্রয়োগকারী খাদেমের বন্ধু ছিল অথবা ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেক এ অপকর্মে শরীক করেছিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে বিষ পান করান হল, আর তিনি সে দিনই এ বিষয় অবহিত হয়েছিলেন কিন্তু লজ্জাবোধ করে তা প্রকাশ করেননি। তারপর যখন এটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি সে খাদেমকে ডেকে তার নিকট হতে এক হাজার দীনার নিয়ে নেন সে ঘুষ বাবদ গ্রহণ করেছিল সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দিলেন এবং তাকে বললেন, এখান হতে এখনই ভেগে যাও। যদি আমার পরিবারের লোকেরা জানতে পারে তাহলে তোমার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তখন হেমছের দিয়ারে সামআন বস্তিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি এখানেই দীর্ঘ বিশ দিন পর্যন্ত রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, রোম সম্রাট তার অসুখের সংবাদ শুনেই তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে তার চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করলেন। এ চিকিৎসক দিয়ারে সামআনে এসে খলিফাকে দেখে বললেন, সত্যিই তাকে বিষপান করান হয়েছে। এরপর চিকিৎসক তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দিলেন। কিন্তু খলিফা আর চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না।

ইবনে কাছীর বলেন, তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমার চিকিৎসার জন্য শুধু এটুকুও বলা হয় যে আমি আমার কান স্পর্শ করব, তবুও আমি এটা করব না।

বস্তুতঃ তিনি জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ পরিবেশকে তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, যখন তার প্রাণপ্রিয় পুত্র আব্দুল মালেক এবং ভাই সুহাইল ও বিশ্বস্ত খাদেম মুজাহিম ইন্তেকাল করলেন, তখন হতে তিনি খুব বিমর্ষ থাকতেন এবং এ দুনিয়ার প্রতি তার আর কোন আকর্ষণই অবশিষ্ট ছিল না।

বিশেষতঃ প্রাণপ্রিয় পুত্র আবদুল মালেকের মৃত্যুতে তার হৃদয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত করেছিল যে, তিনি শোকে জ্ঞানশুন্য হয়ে পড়েছিলেন। তারপর

ভাইও বিশ্বস্ত খাদেমের মৃত্যু তাঁর ব্যথা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এরপর তিনি দামেস্কের বিশিষ্ট ওলী, আরেফ বিল্লাহ ইবনে আবু মাকারিয়াকে ডেকে আনলেন। যখন তিনি তার নিকট আসলেন, তখন খলীফা তাঁকে বললেন, আমি আপনাকে কেন ডেকেছি আপনি কি সে সম্পর্কে কিছু অবগত আছেন? তিনি বললেন, না আমি অবগত নই।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন, আপনাকে আমি একটি কথা বলব, কিন্তু আপনি কসম না করলে আপনাকে তা বলব না। ইবনে যাকারিয়া কসম করলেন। তারপর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে মৃত্যু দান করেন। ইবনে যাকারিয়া বললেন, মুসলমানদের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এটা হবে উম্মতে মুহাম্মদির সাথে চরম শত্রুতা। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার কসমের কথা স্মরণ করে দিলেন অতপরঃ ইবনে যাকারিয়া তাঁর মৃত্যুর জন্যও দোয়া করলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার একটি ছোট ছেলেকে ডেকে আনলেন এবং ইবনে আবু যাকারিয়ার নিকট তার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করলেন। কারণ একেও তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন। ইবনে আবু যাকারিয়া তার মৃত্যুর জন্যও দোয়া করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইবনে আবু যাকারিয়া ও সে বালকটি মারা গেল। এ তিন জনের মৃত্যু ও এক জায়গায় হয়েছিল।

তবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আবু যাকারিয়াকে এ পীড়ার সময়ই ডেকেছিলেন না এর পূর্বে তা স্পষ্ট রূপে জানা যায়নি।

ইবনে হাকামের অপর একটি ভাষ্য দ্বারা জানা যায় যে, যখন তার পুত্র আব্দুল মালেক, ভাই সুহাইল এবং বিশ্বস্ত খাদেম মুজাহিম একের পর এক ইন্তেকাল করলেন তখন খলীফা শোখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এ পীড়িত অবস্থাই একদিন তিনি ওযু করে নামায পড়লেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট কাতর আবেদন করলেন।

আল্লাহ! তুমি সুহাইল, আব্দুল মালেক ও মুজাহিমের মৃত্যু দান করেছ। এরা ছিল আমার সহকর্মী ও সঙ্গী। এখন আমাকেও মৃত্যু দান কর। অতঃপর তাঁর এই দোয়া কবুল হল এবং তিনি ইন্তেকাল করলেন।

তার এ দীর্ঘ রোগশয্যায় শুশ্রুসা করতেন তার প্রাণপ্রিয় পত্নী ফাতেমা ও শ্যালক মুসলিমা। এ দুই জনকেই তিনি প্রাণাধিক মহব্বত করতেন। একদিন মুসলিমা তার নিকট আবেদন করল যে, আমিরুল মুমিনিন! আপনার সন্তান সন্ততির সংখ্যা কম নয়। আপনি এদেরকে বায়তুল মাল হতে বঞ্চিত করেছেন। আপনি আমাকে অথবা আমাদের পরিবারের জন্য কাউকে বলুন যে, আপনার জীবিত অবস্থায় আমরা তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে নেই। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এ কথা শুনে বললেন, তোমরা আমাকে বসাও। তারা তাকে বসালেন। তিনি মুসলিমাকে বললেন, হে মুসলিমা! তোমরা বলছ, আমি আমার সন্তানদের বায়তুল মাল হতে বঞ্চিত করেছি।

আল্লাহর কসম! আমি তাদের কোন অধিকার হরণ করিনি। কিন্তু আমি তাদেরকে অন্যের সম্পদ দিতে পারি না। তোমাদের ধারনা যে, আমি তাদের জন্য ওছিয়ত করে যাব। কিন্তু আল্লাহই তাদের হেফাযতকারী যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যে সৎ তিনি তার বন্ধু ও সাথী। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর এতে এতটুকু যোগ করেছেন।

আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে অন্যের হক দেবনা। তাদের অবস্থা দু ব্যক্তির মতই হতে পারে। হয়ত তারা সৎকার হবে এ অবস্থায় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের হেফাজতকারী বন্ধু অথবা তারা অসৎ পথে চলবে এ অবস্থায় আমি তাদের সাহায্যকারী হতে চাই না। আমার জানা নেই, তাদের মৃত্যু কোথায় হবে। আমি কি তাদের পাপকর্মে সাহায্য করার জন্য সম্পদ রেখে যাবো। আর মৃত্যুর পর তাদের অপকর্মে অংশগ্রহণ করব? না কখনও না।

এরপর তিনি তার সন্তানদেরকে ডেকে আনলেন, তাদের নিকট হতে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন। তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাদেরকে এ সব কথা বোঝালেন এবং অবশেষে বললেন, যাও আল্লাহ তোমাদের নেগাহবান, তোমরা সুখ শান্তিতেই জীবন কাটাবে।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, তাঁর অন্তিম সময়ে যখন তাঁর সন্তানদেরকে তার নিকট আনা হল, তখন তিনি তাদেরকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। সন্তানরাও কাঁদতে ছিল। আর বাস্তবিকই তখন ক্রন্দনের সময় ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে আসছিল তখন তার

স্ত্রী ফাতেমা ও শ্যালক মুসলিমা তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে সরে যাও। কারণ আমার বিপুল সংখ্যক সৃষ্টিজীব এসে ভিড় করছে, তারা মানুষ অথবা জ্বিন কিছুই নয়।

মহান আল্লাহই জানেন, এরা কি আল্লাহর ফেরেস্তা না অন্য কোন অদৃষ্ট সৃষ্টি যারা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের অন্তিম মুহূর্তে তার নিকট এসে ভীড় জমাচ্ছিলেন।

অতঃপর মুসলিমা এবং স্ত্রী ফাতেমা তাঁর কথা অনুযায়ী অন্য কক্ষে চলে গেলেন, সেখান হতে তারা শুনলেন, কে যেন পাঠ করতেছে–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার মান মর্যাদার কামনা করে না এবং বিপর্যয় ও ঘটাতে য় না, তাদের জন্যই আমরা সেই পরলৌকিক গৃহের ব্যবস্থা করব।

এরপর সে আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল। ফাতেমা, মুসলিমা ও অন্যান্য চর্যাকারীরা কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, মুসলিম বিশ্বের মহামানব য় খলিফা, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)-এর সত্যিকার সূরী এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নব প্রাণ সৃষ্টিকারী হযরত ওমর নে আব্দুল আজিজ (রহ) দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট চলে গিয়েছেন।

বাস্তবিক তাঁর মৃত্যু ছিল পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদের মৃত্যু। তিনি ছিলেন বিশ্বে দ্বিতীয় ওমর। তিনি ছিলেন যুগের আবু বকর ও আলী। তিনি আজ দিয়ারে সামআনের নির্জন বস্তিতে মৃত্যুর কোলে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

এ দিন ছিল ১০১ হিজরীর জুমার রাত্র। তখনও রজব মাসের পাঁচদিন অথবা দশ দিন বাকী। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বা ৪০ বৎসর এক মাস। তিনি সর্বমোট দু' বছর ৫ মাস খেলাফতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাস্তবিক পক্ষে তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম বিশ্ব একজন সর্বগুণ সম্পন্ন লেমকে হারালো। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে এলো। শুধু

সিরিয়া নয়, মিশর, ইরাক, ইরান, ও হেজাজসহ যেখানেই তাঁর মৃত্যুর খবর পৌছলে সর্বত্রই ক্রন্দনের রোল উঠল।

এমনকি রোমের ঈসায়ী সম্রাট ও তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন; সিংহাসন ছেড়ে চাটাইতে এসে বসলেন, কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসালেন। যেহেতু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একজন সৎশাসক দুনিয়া হতে চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেছেন।

কবি কাছীর এই বিশ্ব শোকের চিত্রটি এঁকে শোক গাথা রচনা করেছেন–

عَمَّتْ صَنَاعَةً فَعَمَّ هَلَاكَهُ - فَالنَّاسُ فِيْهِمْ كُلُّهُمْ مَا جُوْرَ-

তাঁর সৎকর্মের পরিধি যত প্রশস্ত ছিল, তার মৃত্যুর শোকও তত প্রশস্ত।

وَالنَّاسُ مَاتَهُمْ عَلَيْهِ وَاجِدٌ - فِىْ كُلِّ دَارٍ رِنَةٌ وَاَنِيْرٌ

সকল লোকেই তাঁর মৃত্যুশোকে শোকাভিভূত, প্রত্যেক ঘরেই ক্রন্দন ধ্বনী।

رُدَّتْ صَنَاعَةً عَلَيْهِ حَيَاتَهُ - فَكَاَنَّهُ مَنْ نَشَرَهَا مُنُوْرٌ

তাঁর কর্মাবলী তাঁর জীবনকে বারবার ফিরিয়ে দেয় এবং তিনি কর্মাবলীর সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন।

তার শোকগাঁথা রচনা করে যুগশ্রেষ্ট কবি জারীর লিখেছিলেন–

شَمْسُ كَاسِفَةٌ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ - تَبْكِىْ عَلَيْكَ نُجُوْمُ الَّيْلُ وَالْقَمَرُ

তোমার শোকে সূর্য ম্লান সে আর তার চেহারা দেখায় না। তোমার শোকে ক্রন্দন করে চাঁদ, আর নিশির সেতারা।

বাস্তবিক সেই দিন সূর্য ছিল না, কারণ তার মৃত্যু কোন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ছিল না। তার মৃত্যু ছিল এ উম্মতের মাহদী ও দিশারীর মৃত্যু।

সমাপ্ত